রামধনু

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা

অনুবাদ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
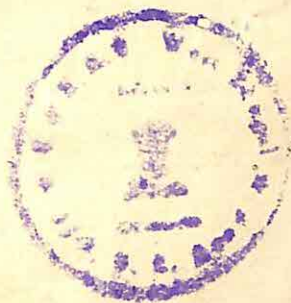
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনুবাদের কথা

[illegible]সের অন্ধকারতম দুর্দিনে, সর্বমানব ও সভ্যতার দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে যে জাতি জয়মাল্য অর্জন করেছে—"রামধনু" সেই জাতির কাহিনী, তাদের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার দুর্জয় প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত! য়ুক্রেনের ছোট একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাহিনী। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, শিল্পচাতুর্য ও জীবন্ত বাস্তবতায় "রামধনু" তাদের পুরো-ভাগে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নাৎসী-আক্রমণের হীন বর্বরতার মাঝখানে অপরাজেয় যে জাতি ঐকান্তিকভাবে সাম্য ও স্বাধীনতার কঠোর সঙ্কল্প [illegible] করে এগোচ্ছে, তাদের মনঃসমীক্ষণ, চরিত্র-চিত্রণ এবং কথা ও কাহিনীতে রচয়িত্রী শ্রীমতী ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সুগভীর পর্য-বেক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্য শুধু যুদ্ধসাহিত্য বা [illegible]ীক সাহিত্য হিসাবে নয়—প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। ১৯৪২ [illegible]টি পা[illegible]তম উপন্যাস বলে পোলাণ্ডের এই মহীয়সী লেখিকা বইখানির জন্যে [illegible]৪৩ সালের 'স্তালিন পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। অমর স্বদেশহিতৈষণা দুর্দিনের প্রচণ্ড এক বাস্তব অভিজ্ঞতার মাঝখানে তাঁর এই "রামধনু"কেও সাহিত্যিক অমরতা দান করেছে। তাঁর এই সাহিত্যিক জীবন ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে শ্রীমতী ভান্দা তাঁর স্বদেশ পোলাণ্ডের মুক্তি-সংসদের সভাপতি।

এই গ্রন্থ অনুবাদের সুযোগ যিনি দিয়েছেন, আমার সেই পরমহিতৈষী মুজফ্ফর আহ্মদকে আমার অন্তরের প্রীতি জানাই। অনুবাদের কাজে যাঁরা আমাকে নানাভাবে অকৃপণ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ব[illegible]পাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল জানা ও শ্রীগিরীন্দ্র চক্র[illegible]র্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

"রামধনু" তিন-চার মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হলেও ছাপা-খানার অসুবিধায় এতদিন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এবারে সমগ্র বইখানিই আমূল সংশোধন করা হয়েছে। তবু আশানুরূপ হয়েছে বলতে পারি নে। আশা করি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি পাঠক সাধারণ মার্জনা করবেন।

প.

শ্রীমান পৃথ্বীশকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-

কল্যাণীয়েষু—

১

পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণগামী দুটি রাস্তা। চৌ-মাথার টিলার উপর গ্রামখানি। দু পাশের ক্রমনিম্ন কুটীরশ্রেণী যেন আপনা থেকে একটি ক্রুশ চিহ্ন গড়ে তুলেছে; তারই মাঝখানে ছোট ময়দানটির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি গির্জার চূড়া। টিলার ঠিক নীচেই একটি নদী এঁকে বেঁকে খালের ভিতর দিয়ে নেমে গেছে। নদীটি বরফে ঢাকা। বিচ্ছিন্ন নীলাভ বরফের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে প্রবহমান কালো জল।

কুটীর থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। তার কাঁধে একখানি বাঁক। বাঁকের দুদিকে ঝোলানো দুটি বালতি—চলার ছন্দে দুলে দুলে উঠছে। স্ত্রীলোকটি পা টিপে টিপে ঢালু পথ বেয়ে সন্তর্পণে নেমে এল। নদীর ধারে এসে বালতি দুটি জলে ডুবিয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল। কোন দিকে কাউকে দেখা গেল না। বরফের পালকশয্যায় কুটীরগুলি নীরবে শুয়ে আছে। ক্ষণেক কি ভেবে নিয়ে আবার সে অশান্ত দৃষ্টিতে গ্রামের দিকে চাইল! তারপর বালতি দুটি বরফের উপর নামিয়ে রেখে নদীর ধার দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

বাঁকের মুখে নদীটা যেখানে অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়ে গেছে তারই পাশে আগাছার ঘন ঝোপগুলো বরফের আবরণের ভিতর থেকে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগাছার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট সরু পথ ধরে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে চলল। বরফে ঢাকা আগাছাগুলি পায়ে পায়ে জড়িয়ে তার গতিকে বাধা দিচ্ছে। চোখে মুখে যেসব ডাল-পালা শক্ত বরফের ঝাপটা দিচ্ছিল, দু হাতে সেগুলোকে সরাতে সরাতে সে এগিয়ে চলল।

পথটি হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সেইখানে গিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চায়; সে দৃষ্টি যেন কাচের মত প্রাণহীন।

এখানেই একটা গড়খাই, কয়েকটা ট্রেঞ্চ, তার পাশে পাশে মা[illegible] ইতস্তত কতকগুলি ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। ঢিবিগুলোর উপর বরফে স্তূপ জমে উঠেছে ; ঝোপের মাথায় লাল জামগুলি শরতের শেষ থেকে আজও গাছ আলো করে পেকে আছে। কিন্তু সে সবের কোন দিকেই তার দৃষ্টি ছিল না।

স্ত্রীলোকটি সামনের দিকে খুঁজে দেখছিল—কোথায় গর্তের মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর মরচে-ধরা লোহার টুকরাগুলির মাঝখানে বরফের ভিতর সেই অস্পষ্ট মূর্তিটি লুকানো আছে।

সে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল। এই ত শুয়ে আছে! অনাবৃত দেহে সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে; মুখখানা মনে হচ্ছে কত ছোট! যখন বেঁচে ছিল তখনকার চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয়, যেন আবলুস কাঠে খোদাই-করা। স্ত্রীলোকটির চোখ দুটি সেই মুখখানির উপর স্থির হয়ে রইল। সে-মুখের সম্পূর্ণ অবয়ব, এমন কি, ছোট্ট ভাঁজটি পর্যন্ত তার চেনা। তবু মনে হচ্ছে, এ যেন তার কত অপরিচিত মুখ। ঠোঁট দুখানা জমে গেছে, নাকটা বসা, চোখের পাতাগুলো জুড়ে আছে, একেবারে নিথর পাষাণ! কপালের একপাশে একটা গর্ত, চারিদিকে থানা থানা রক্ত জমে আছে—যেন লাল পল্টনের নিদর্শন।

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই যে মারা যায় নি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। গা থেকে যখন ওরা জামাকাপড় খুলে নেয় তখন নিশ্চয়ই জীবিত ছিল। জী[illegible] থাকলেও দেহের উত্তাপ ছিল তখনও। শত্রুরাই পা দুটো লম্বা করে দিয়ে হাত দুখানি দুপাশে সমান করে রেখেছে: মৃত্যুতে এ রকমটা হতে পারে না। বিশেষত যুদ্ধের দিন—যে দিন ও নিহত হয়, সে দিন কালো তুষার পড়েছিল। সেই তুষারে সঙ্গে সঙ্গেই মৃতদেহটা ঢেকে যায় এবং দেখতে দেখতেই পাথর ব'নে যায়। কাজেই তখন আর মৃতের গা থেকে কিছুই নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবু তার সব কিছুই খোয়া গেছে: ওভারকোট, বুট, পা-জামা, এমন কি, মোজা জোড়াটি পর্যন্ত খুলে নিয়েছে। একটি নীলরঙের ইজের পরনে ও গায়ে

...ট মোটা কাপড়ের ফতুয়া—এ অবস্থায় তাকে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ...য়াটি তার গলিত দেহে এমন ভাবে মিলিয়ে গেছে যে, মনে হয়, কালো কাঠের উপর নীল চক দিয়ে যেন এঁকে রেখেছে। কোন্‌টা কাপড় আর কোন্‌টা চামড়া, ঠিক করা সম্ভব নয়। কালো মুখের তুলনায় খালি পায়ের তলা দুটো ছিল অস্বাভাবিক রকমের শাদা।

তুষারে একখানি পা ফেটে গেছে; সেখানটার মাসগুলি ছেঁড়া জুতার তলার মত বেরিয়ে পড়েছে। হাড় দেখা যায়।

মেয়েটি অতি সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে মৃতের কাঁধ স্পর্শ করল। ফতুয়ার মোটা কাপড়ে হাত ঠেকল এবং এর নীচেই আছে অনড় দেহটা—যা পাথর হয়ে গেছে।

"বাবা আমার!"

সে কাঁদল না। শুষ্ক দৃষ্টি মেলে সে শুধু চেয়েই রইল, যেন সে-দৃষ্টি দিয়ে সে সবটা পান করে নিচ্ছে: মুখখানা লোহার মত কালো হয়ে গেছে। কপালে গুলি বিঁধে একটা গর্ত হয়েছে, একটা পা কাটা; দেখলেই বোঝা যায়, মরবার আগে ওর কি যন্ত্রণা হয়েছিল—আঙুলগুলি খিচুনিতে থাবার মত বেঁকে গেছে, যেন বরফ আঁকড়ে ধরতে চায়।

মৃতের মাথার কালো চুলের উপর বরফের কুচি ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আস্তে ...গুলি ঝেড়ে ফেললে। একগোছা চুল এসে কপালের উপর পড়েছে। এই ...লের ডগাগুলো কপালের ক্ষতস্থানে রক্তের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে, কাজেই আগ্রহ ...ত্ত্বেও ওখানটায় হাত দিতে সে ভরসা পাচ্ছিল না।

যতবার সে এখানে এসেছে ততবারই কপাল থেকে ওই চুলের গোছাটা সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ভয়ে সে একটিবারও ওখানে হাত দিতে পারে নি, পাছে মৃত সন্তানটি তার ব্যথা পায়—ক্ষত স্থান থেকে যদি আবার রক্ত বেরিয়ে পড়ে!

"বাছা আমার!"

শুষ্ক ওষ্ঠ থেকে নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই শব্দটি বেরিয়ে আসে, হয় ত ভাবে,

এ ডাক ওর কানে পৌঁছুবে—জমে যাওয়া কালো চোখের পাতা দুটি মেলে তার সেই সুন্দর সস্নেহ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাবে।

সে স্থির ভাবে হাঁটু গেড়ে বসল, চোখ দুটি কালো মুখখানির উপর নিবদ্ধ। ঠাণ্ডার অনুভূতিও তার ছিল না, হাঁটু দুটো যে অসাড় হয়ে গেছে তাও জানতে পারে নি। সে তাকিয়েই ছিল।

নদীর উপর হেলে-পড়া গাছটা থেকে একটা দাঁড়কাক জোরে ডানার ঝাপটা মেরে উড়ে গিয়ে একবার চক্রাকারে ঘুরে আর এক জায়গায় বসে পড়ল, সেখানে একটা ঝোপের আড়ালে ছেঁড়া ন্যাকড়ার স্তূপ পড়ে ছিল। রক্তমাখা কাপড়-গুলো একবার উঁকি মেরে দেখল। কাকটা ক্ষণেক নিশ্চল বসে রইল, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে। তারপর হঠাৎ ঠোঁট বার করল। কাঠঠোকরা কাঠের উপর ঠোকর মারলে যে-রকম শুকনো খট খট শব্দ হয়, সে-রকম একটা শব্দ শোনা গেল। তুষার তার কাজ করেছে। একমাস আগে এখানে যা-কিছু পড়েছিল সবই আজ পাথর হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোকটি চেতনাহীন অবস্থা থেকে হঠাৎ যেন জেগে উঠল।

"হুস্!"

কাকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উড়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটি মৃত দেহের পাশে এসে উড়ে বসল। মৃত দেহটার অর্ধেকটা বরফে ঢাকা পড়েছে।

"হুস্!"

একঢেলা জমাট বরফ কাকটার দিকে সে ছুঁড়ে মারল। মন্থর গতিতে উড়ে কাকটা গিয়ে আবার গাছের ডালে বসল। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়াল, আর একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সেই পথ ধরে আবার খালের ধারে ফিরে গেল।

বরফের ফাঁক থেকে বালতি দুটিতে জল ভরে নিয়ে সে ধীরে ধীরে আবার চড়াই বেয়ে উঠে গেল। গুরু ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পথ চলছিল। বেলা অনেকটা হয়েছে, সূর্যালোকে চারিদিক ছেয়ে গেছে, কিন্তু কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। ওর মনে হচ্ছিল, বরফগুলোর রং যেন নীল। সে অবাক হয়ে ভাবল যে, বরফের রং কি সত্যিই নীল হয়ে গেছে, না, তার মৃত পুত্রের পরনে

এ নীল ইজের মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তারই রং ওর চোখের সামনে ভাসছে ?

কুটীরের সামনে একটা সান্ত্রী শীতে কাঁপতে কাঁপতে পায়চারি করছে। লোকটা থপ্ থপ্ করে পা ফেলছে। ঘাড় বেঁকিয়ে হাত দুটো বগলে পুরে একটু গরম করে নেয়, তারপর হাতে হাত ঘষে অবশ-প্রায় আঙুলগুলি দিয়ে গাল দুটোকে উত্তপ্ত করবার চেষ্টা করে। ছেঁড়া বুট ও ধূসর রঙের কোট ভেদ করে ঢুকে পড়ছে তুষারের কণাগুলি। নিদারুণ শীতে চোখ দুটো টন্ টন্ করে, মনে হয়, আঙুলগুলো সব খুলে পড়বে। যেদিন থেকে তাদের দল গ্রামখানি অধিকার করেছে সেইদিন থেকেই সান্ত্রী স্ত্রীলোকটিকে খুব ভাল করেই চেনে, তবুও সে তাকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখল। সান্ত্রী যে উপস্থিত আছে এটাও তার মনে হল না, সে তাকে উপেক্ষা করেই চলে গেল। দরজাটা ক্যাচক্যাচ করে উঠল, এবং একরাশ কুয়াশা বারান্দাটাকে ছেয়ে ফেলল। রাগিত স্বরে কে একজন বলে উঠল : "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? সেই কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্যে !"

ফেডোসিয়া কোন জবাব দিল না। জবাবটা তার ঠোঁটের ডগায় এসে পড়েছিল বটে, কিন্তু অতি কষ্টে জিভ কামড়ে সামলে নিল নিজেকে। পাশ কাটিয়ে উনুনের কাছে গিয়ে হাঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে আগুনটা উসকে দিল।

"ভারী তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও।"

"বালতি ভরাই আছে, নিজে গড়িয়ে নিয়ে তেষ্টা দূর কর," ফেডোসিয়া কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল।

স্ত্রীলোকটি জবাব পেয়ে প্রথমটা রাগে জ্বলে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটু মিইয়ে গেল।

"আচ্ছা, সবুর কর, উনি আসুন। সব বলব তাঁকে।"

ফেডোসিয়া একবার অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নিলে। উনি !—তাই নাকি ! তারপর ? ···

চুল্লীতে আরও শুকনো কাঠ দিতে দিতে ফেডোসিয়ার মনে ঘুরে ঘুরে

কেবল এই প্রশ্নই হতে লাগল যে, তার অদৃষ্টেই কেন এ বিড়ম্বনা ঘটল। গ্রামে প্রায় তিন শ' ঘর লোক আছে, তার প্রতিটি ঘর থেকে অন্যূন একজন করে যুদ্ধে গেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র তার ছেলেই কেন খালের ধারে গর্তের মধ্যে পড়ে আছে, আর তুষার পড়ে পড়ে তার মুখখানি লোহার মত কালো হয়ে গেছে, পা ফেটে গেছে।—যেন কাঠের তৈরি পা, আঙুলগুলো হয়ে গেছে নীল। অবশ্য সেখানে আরও কয়েকটি মৃত দেহ পড়ে আছে, কিন্তু সে মৃতেরা গ্রামের কারুরই ছেলে, ভাই অথবা স্বামী নয়। একমাত্র তার ছেলের ভাগ্যেই ঘটেছে নিজের গ্রামখানির পাশে মরবার সুযোগ, এমন কি, ওর জন্মভিটা থেকে মাত্র দু শ' পায়ের পথ। আর সেই অনাবৃত মৃতদেহের চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে ক্ষুধাতুর দাঁড়কাকের দল; সে দৃশ্য দেখবার ভাগ্যও শুধু তার মত হতভাগিনী মায়েরই হয়েছে। আর সবার উপর, অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস এই যে, জার্মান সেনানায়ক তার শখের মেয়েমানুষকে নিয়ে বাস করবার জন্যে এই স্ত্রীলোকটির বাড়ীই নিয়েছে বেছে। তাও যদি মাগীটা জাতে জার্মান হত কিংবা কোন দূর দেশের অচেনা লোক হত—যার ভাষা বোঝা যেত না, ঠিক জার্মানদের মতই সবুজ উর্দি পরা মানুষ হত,—যাকে শত্রু বলে ঘৃণা করা যায়, তবু না হয় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত। কিন্তু তা না হয়ে ওই কুলটাটা কি-না তাদেরই ওখানকার একটা মেয়ে! সামান্য এক জোড়া সিল্কের মোজা, কিংবা, তুচ্ছ এক বোতল ফরাসী মদের বিনিময়ে করেছে ওর দেহ বিক্রয়। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর দেশ, ওর জাতি, ওর আত্মীয়স্বজন, এমন কি, ওর স্বামীর প্রতি, যে স্বামী লাল পল্টনের একজন নায়ক। শুধু তাই নয়, দেশের সব কিছুর প্রতি করেছে বিশ্বাসঘাতকতা— যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, যাদের মৃত দেহ আজ খালের ধারে পড়ে আছে তাদেরও ও রেহাই দেয় নি। মাগীটার কথা ভাবতে গিয়েই ফেডোসিয়ার অন্তর রাগে ঘৃণায় গুমরে উঠল। ওই কুলটা এসে আশ্রয় নিয়েছে ওরই গৃহে—ওরই পালকের বিছানায় ও গা গড়াচ্ছে, গৃহের কর্ত্রী সেজে ওরই উপরে হুকুম চালাচ্ছে। মাগীটার মনে কি কোন ঘেন্নাও হয় না? ও কি কখনও

প্রাটাতে চোখ চেয়ে চলে নি? মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হলে ওর কি কোন দিন একটু শরম হত না। তা হলে কেমন করে পারে অমন নির্লজ্জের মত হুকুম চালাতে।

"সবুর কর, একটু সবুর কর," কম্পিত অগ্নিশিখাকে লক্ষ্য করে ফেডোসিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলে। শয়নঘর থেকে যে অজস্র গালাগালি বর্ষিত হচ্ছে সে দিকে ও এতটুকু কর্ণপাতও করল না। পাবে ঠিক পাবে, এমন পাওয়া যাবে যে, তুমি যে জন্মেছ তার জন্যে তোমাকে হাজার বার ধিক্কার দিতে হবে।

ভারী পায়ের দ্রুত চলার শব্দ পেয়েও ও ফিরে তাকাল না। এ যে কার পদশব্দ তা ওর অজানা নয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখখানা অমন পাথর ব'নে গেল। হাউপ্টম্যান কুর্ট ভের্নের রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে শয়নঘরে গিয়ে ঢুকল, উনুনের পাশে যে স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

"সে কি, তুমি এখনও বিছানায় পড়ে?"

রাগে শয্যাশায়িনীর ঠোঁট ফুলে উঠল।

"আচ্ছা, বলতে পার—কেন উঠব? সব সময়ই তুমি থাক বাইরে ··· একা একা আমার ভারী বিশ্রী লাগে। তুমি থাক তোমার কাজ নিয়ে, আর আমাকে থাকতে হয় ওই ডাইনীকে নিয়ে। দেখো—ও আমায় একদিন বিষ খাইয়ে মারবে।"

সে বিছানার পাশে বসে বড়ল।

"কি বোকা! তুমি হচ্ছ এ বাড়ীর কর্ত্রী। তোমার খারাপ লাগবার ত কোন কারণ নেই। কেন, তুমি ত গ্রামোফোন বাজাতে পার, তোমার অনেক রেকর্ড আছে, আর তাও যদি ভাল না লাগে, বই পড়ে সময় কাটাতে পার। যখনই একটু ফুরসত পাই, তখনই ত তোমার কাছে থাকি। এখন যুদ্ধ চলছে, কখন কি হয়, বলা ত যায় না।"

স্ত্রীলোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"যুদ্ধ! সব সময়েই কেবল যুদ্ধ ··· আমায় এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছুটির দরখাস্তও ত করতে পার।"

সেনানায়ক ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকাল।

"দূর বোকা কোথাকার! এখন কি ছুটির সময়! এখানে থাকতে না চাও ত তোমাকে জার্মানী পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি করবে কি? তার চেয়ে বরং আমরা এখানেই যেমন আছি, তেমনি থাকি।"

কোন কথার জবাব না দিয়ে সে পাশের চেয়ারখানা থেকে তার সায়াটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় পরতে শুরু করে দিল। কুর্ট ভের্নের বিছানা থেকে উঠে লম্বা টুলটায় বসে পুসিয়ার দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইল। হাঁ, সত্যি ওকে কুর্টের খুব ভাল লাগে। নইলে সুদীর্ঘ তিন তিনটে মাস ওকে বয়ে বেড়াতে পারত না। সেনানায়ক যে ধরনের নারী নিয়ে অভ্যস্ত তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং এখানে যাদের দেখতে পায়, ও তাদের চেয়েও আলাদা।

"ভাল কথা, পুসিয়া, এখানে যে মাস্টারনী আছে সে নাকি শুনলাম তোমার বোন্?"

পুসিয়া মোজা পায়ে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথাটা শুনেই মাঝপথে তার হাতখানা যেন নিশ্চল হয়ে গেল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে এমন ভাবে দাঁড়াল যে, দেখে মনে হয়—একটা উদ্-বেরাল। ও জানত যে এই কারণেই ওর এতখানি আদর, তাই কথাটা সেনানায়কের মুখ থেকে শোনবা মাত্র পুসিয়ার চেহারাটা নিমেষে এমন অসহায় বন্য পশুর মত হয়ে গেল। শিশুর মত ছোট হাতখানি দিয়ে পুসিয়া কাঁধের ও কানের পাশের চুলগুলি সমান করতে লাগল। তার কান দুটোও ভারী মজার, অত্যন্ত ছোট, উপরের দিকটা আরও সরু, যেন তে-কোণা, যেন কোন ক্ষুদ্রকায় লোমশ জন্তু। পুসিয়াকে ঠোঁট কামড়াতে দেখে ভের্নের লক্ষ্য করল যে, ওর দাঁতগুলিও তে-কোণা। অদ্ভুত! এর আগে সে আর কখনও মানুষের অমন দাঁত দেখে নি।

"যদি তা-ই হয়, তাতে কি?"

পুসিয়া চুল আঁচড়ে পিছন দিকে পাট করে রাখল। ওর হাতের তে-কোণা চকচকে নখগুলি রক্তমাখা থাবার মত জল্ জল্ করতে লাগল।

"হাঁ, সে আমার বোনই, তাতে কি হয়েছে?"

"তোমার বোন, কিন্তু আমাদের তেমন পছন্দ করে না।"

পুসিয়ার গোল গোল কালো চোখ দুটি সন্দেহে চক্ চক্ করে উঠল।

"বুঝলাম, কিন্তু তুমি? তুমি হয় ত আমার বোনকে একটু বেশি পছন্দ করে ফেলেছ, কেমন?"

সেনানায়ক ভাঙা গলায় খলখল করে হেসে উঠল।

"না। দেখছি তোমার মনে বেশ ভাব ফোটে। আমি মোটা মেয়েমানুষ কখনও পছন্দ করিনে। তারপর পা দুটো এত মোটা যে ..." তার স্ত্রীর পায়ের মতই মোটা এটাই সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ঠিক সময়েই থেমে গেল।

পুসিয়া নিজের পা দুখানির দিকে একবার তাকাল এবং এই মনে করে তার তৃপ্তি বোধ হল যে, তার পা দুখানি বেশ খাটো এবং সরু।

"হাঁ, সে একটু মোটা বটে।"

"তোমার যে এখানে বোন আছে, কই, সে কথা ত আমায় কখনও বল নি।"

"কেমন করে বলব আমি? সে থাকে এখানে আর আমি আর এক জায়গায়। দেখাসাক্ষাৎ আমাদের বড় একটা হয় না। আর তা ছাড়া, সে আমার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। ..."

"সম্পূর্ণ আলাদা মানে?"

পুসিয়া চিন্তিত ভাবে কানের পাশের চুলগুলি ঠিক করতে লাগল। দুলের নকল পাথরগুলি ঝিকমিক করছিল।

"মানে, সে ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়, সব সময়ই কাজ করে। কিন্তু বিনিময়ে কি পায়। বলতে গেলে কিছুই না। তবু সন্তুষ্ট, সব কিছুতেই তার সন্তোষ আছে।"

"তা হলে বল—সে মেয়ে-বলশেভিক।"

"আমি যতদূর জানি, হয় ত বলশেভিক," জড়িতস্বরে পুসিয়া জবাব দিল এবং পরক্ষণেই যেন আবার সচেতন হয়ে উঠল। "তার সম্পর্কে তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন? তুমিই বলেছ, তাকে তোমার ভাল লাগে না, তা হলে কেন এই সব প্রশ্ন?"

"নিছক কৌতূহল। তবে এ-কথা তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, তার সম্পর্কে যদি আমার কোন আগ্রহ থাকেও, তার কারণ এ নয় যে, সে একজন নারী।"

'নারী' শব্দটি উচ্চারণে সে যে অদ্ভুত একটা জোর দিয়েছে, সেটা পুসিয়া মোটেই লক্ষ্য করে নি। সে নীচু হয়ে মোজা পরতে ব্যস্ত ছিল এবং ওড়নার রং মিলিয়ে নিয়ে মাথায় পরল।

জার্মান সেনানায়ক পকেট থেকে একটা ছোট্ট মোড়ক বার করল।

"ভাল কথা, পুসিয়া, এ চকোলেটটা তোমায় দেব বলে মিনিট খানেকের জন্যে এসেছিলাম। এখনই যেতে হবে, আজ বড় ব্যস্ত আছি। মন খারাপ করো না যেন। ফিরতে আমার দেরী হবে না।"

পুসিয়ার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল।

"আবার একা থাকতে হবে! সারা দিনই ত আমাকে একা ফেলে যাও! কবে এ যুদ্ধ শেষ হবে বলতে পার?"

"এক সময় শেষ হবেই।"

"বলতে তোমার কোনই কষ্ট হয় না।"

রঙীন কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে চকোলেটের ডেলাটা একবারে মুখে পুরে দিল, টুকরো করে ভেঙে নেওয়ার ফুরসতও হল না।

"এখন তুমি বরং গ্রামোফোন নিয়ে সময় কাটাও। আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দেব। তা হলে আমি আসি।"

ইচ্ছা না থাকলেও পুসিয়ার গাল দুটি ধরে একটু আদর জানিয়ে সেনানায়ক চলে গেল। সান্ত্রীটা তখনও কুটীরের বাইরে দাঁড়িয়ে শীত তাড়াবার ব্যর্থ

চেষ্টায় ঘন ঘন পা ফেলছিল। সেনানায়ককে দেখতে পেয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে অভিবাদন করল। সেনানায়ক তার দিকে না তাকিয়েই ময়দানের দিকে ফিরল। যে-বৃহৎ বাড়ীটায় আগে ছিল গ্রাম্য সোভিয়েটের দফ্তর, এখন সেটাই জার্মান কমাণ্ডাণ্টুর। সেখানে বহু সৈন্যের ভিড়, সেনানায়ককে প্রবেশ করতে দেখেই তারা সচেতন হয়ে তাকে সেলাম জানাল। সে কিন্তু তাদের দিকে ফিরে তাকাল না, তাদের অভিবাদনেরও প্রত্যভিবাদন করল না, সোজা গিয়ে নিজের আপিস-ঘরে প্রবেশ করল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দিল: "সে স্ত্রীলোকটাকে আনো।"

আসনে বসে পড়ে সে একবার হাই তুলল। ভাগ্যবতী পুসিয়া! সে সারা-ক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতে পারে, আর তাকে কি-না সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তবু কাজ শেষ হতেই চায় না।

সৈন্যেরা একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে এল। তার গায়ে একটি পুরু ভেড়ার চামড়ার কোট, পরনে কালো পোশাক।

সেনানায়ক একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

"এই না কি সে?"

"হাঁ, হুজুর!"

স্ত্রীলোকটির যেন দাঁড়াতে ভারী কষ্ট হচ্ছে। সে আর দাঁড়াতে পারছে না এমনিভাবে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। কপালের দুপাশে চুলগুলোয় পাক ধরেছে, একখানি শাল দিয়ে মাথা থেকে শরীরটা বেশ ভাল করে ঢাকা, মুখখানি সাদামাঠা, যেমন সাধারণ চাষীদের মুখ হয়।

"তোমার নাম?"

"ওলেনা কষ্টিয়ুক।"

জার্মান সেনানায়ক হাতের পেন্সিলটি আঙুলে মোচড়াতে মোচড়াতে স্ত্রীলোকটির দিকে চোরা-দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ওর মনে হল, সৈন্যেরা যদি ভুল না করে থাকে, তা হলে আজ ওকে অনেকখানি বেগ পেতে হবে এবং অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্নেরও অবতারণা করতে হবে। মেয়েটির থুতনির দৃঢ়তাব্যঞ্জক

গঠন ও চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে ও স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে, তার সম্বন্ধে বিচার করা খুব সহজ হবে না।

"তুমি গ্যেরিলা বাহিনীতে ছিলে ?"

প্রশ্নটা শুনে সে ভয়ও পেল না, ভ্যাবাচ্যাকাও খেল না, জবাব দিতে গিয়েও তার নিবদ্ধ দৃষ্টি সেনানায়কের মুখ থেকে সরল না :

"হাঁ, আমি গ্যেরিলা বাহিনীতে ছিলাম।"

"হুঁ :—বে-শ"—সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করায় সেনানায়ক বিস্মিত হল। টেবিলের উপর থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে সে হিজিবিজি কাটতে লাগল।

"গ্রামে কেন আবার ফিরে এসেছ ? তারা কিসের জন্যে তোমায় পাঠিয়েছে ?

"আমাকে কেউ পাঠায় নি। আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি।"

"তাই নাকি ? নিজের ইচ্ছায় ? কিন্তু কেন ?"

এবারে সে জবাব দিল না। তার কালো চোখ দুটি দিয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেনানায়কের শীর্ণ মুখখানা আর বর্ণহীন চোখ দুটোর পানে : চোখের পাতাগুলোর যেন ধোলাই-এ রং উঠে গেছে।

"তারপর ?"

সে নীরব।

"আচ্ছা, তুমি গ্যেরিলাদের দলে ছিলে এবং হঠাৎ এখন গ্রামের বাড়ীতে ফিরে এসেছ, তাই না ? কিন্তু তোমাদের দলের কি কোন আইন-কানুন নেই ? কেন তুমি চলে এলে সেই কথাটাই জানতে চাইছি।"

"নিজের ইচ্ছায় এসেছি। আমি আর থাকতে পারলাম না।"

"কেন পারলে না ? কাজকর্ম খুব ভাল চলছিল না, তাই কি ? তোমাদের দলপতি শুনছি যুদ্ধে মারা গেছে, দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, কেমন ?"

"দলের কথা জানি নে। আমি চলে এসেছি।"

"অমন হঠাৎ চলে এলে কেন ?"

স্ত্রীলোকটির ঠোঁট দুখানি নিঃশব্দে নড়ল।

"গ্যেরিলাদের কাজ জঘন্য, ডাকাতি, লুটপাট, খুন, জখম—তাই না? তুমি তাই সে দলে আর থাকতে রাজী হও নি, কেমন—এই ত?"

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়ল।

"না। আমি আর পারি নি।"

"কেন?"

স্ত্রীলোকটি প্রথমটায় একটু ইতস্তত করল, তারপর চেষ্টা করে সোজা বলল: "প্রসবের জন্যে বাড়ী ফিরে এসেছি।"

"কি?"

"সন্তান প্রসব করতে এসেছি।"

"তাই নাকি!"

সেনানায়ক হেসে উঠল। তার সে বাজখাই হাসি শুনে স্ত্রীলোকটি কেঁপে উঠল।

"এ ঘরে নিশ্চয় তোমার শীত লাগছে না। ঘরে বেশ আগুন রয়েছে, তবু তুমি এমন চাপাচুপি দিয়ে রয়েছ! শালটা খুলে ফেল!"

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি তার গা থেকে মোটা শালখানা চেয়ারের উপর রাখল।

"কোটটাও খুলে ফেল।"

মুহূর্তকাল সে একটু ইতস্তত করল, তারপর বোতাম খুলে ভেড়ার চামড়ার জামাটি খুলে ফেলল। সেনানায়ক নিবিষ্ট মনে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে লাগল। না, অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। প্রসবের সময় সত্যিই আসন্ন।

স্ত্রীলোকটি গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। লোকটা বেশ বুঝতে পারছিল যে, ওর পক্ষে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা সত্যি অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু তবু সে ইচ্ছে করেই তাদের কথাবার্তার সময় বাড়িয়ে দিল। পেন্সিলটা নিয়ে খেলতে লাগল এবং এক একটা প্রশ্নের পর অনেকটা সময় থেমে থেমে চলতে লাগল।

নিজের সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করল, সঙ্গে সঙ্গেই তার জবাব দিল। হাঁ, সে বিবাহিত। তার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছে। অনেক আগে—বিপ্লবেরও আগে,

সে চাষের কাজ করেছে, ধানকাটা গরু দোয়ানো—সব কাজই করেছে। বিপ্লবের পর কিছু দিন সমবায় চাষবাসেও কাজ করেছে। পরে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠতে সেই দলে যোগ দেয়। ওর অবস্থার কথা তাদের কাছেও গোপন রেখেছিল। সময় যখন আসন্ন এবং চলতে ফিরতেও কষ্ট হয় তখন গ্রামে ফিরে আসে, শান্তিতে সন্তান প্রসব করবে বলে।

"ও, তাই বল, শান্তিতে সন্তান প্রসব করতে চাও," সেনানায়ক কথাটা পুনরুক্তি করল। "গেল সপ্তাহে যে পুলটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কি তুমি দিয়েছ ?"

"হাঁ।"

"কে তোমাকে সাহায্য করেছে ?"

"কেউ না। আমি একাই করেছি।"

"মিথ্যা কথা। আমরা সব জানি, খোলাখুলি সত্যি বলাই তোমার পক্ষে ভাল ছিল।"

"আমি একাই করেছি।"

"বেশ। তোমাদের দলটা এখন কোথায় ?"

সে জবাব দিল না। তার কালো কালো চোখ দুটি দিয়ে শান্তভাবে জার্মানটার দিকে তাকাল। সেনানায়ক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। ঘুরে ঘুরে কেবল সেই একই কথা। অসহ নীরবতা, দীর্ঘসময়ব্যাপী কতকগুলি নিরর্থক প্রশ্ন এবং আরও সব অপ্রীতিকর ব্যবস্থা—যার কোনটাতেই কোন ফল হবে না। তার ধারণা ছিল, লোকে হয় গোড়াতেই কবুল করে, নয় ত শত চেষ্টাতেও কোন জবাব দেয় না; এক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি প্রথম প্রশ্নের জবাবেই যে রকম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জুগিয়েছে, তাতে করে ওকে সে একটু ভুলই বুঝেছিল ! এবং তার সম্পর্কে ওর নিজের প্রথম ধারণাটাই ছিল সত্যি—মেয়েটির চোয়ালের দৃঢ়তা ও ঠোঁট দুটির গঠন থেকে ও স্পষ্টই বুঝেছিল, সে যে দৃঢ়সঙ্কল্প, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, সে তার নিজের সম্পর্কে সব কিছু বলতে রাজী, কিন্তু অন্যের সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে রাজী নয়।

আচ্ছা, আর কিছু যদি বলতে না চাও, গ্রামে যখন ফিরে আস তখন কোথা থেকে এসেছিলে, সেটা ত বলতে পার ?”

নীরব। সেনানায়ক অস্থির ভাবে হাতের পেন্সিলটি দিয়ে টেবিলের উপর ঠক্ ঠক্ করতে লাগল, কিন্তু স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল না। হঠাৎ তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। এখান থেকে সে পালিয়ে যেতে যায়। পুসিয়ার কাছে ফিরে গেলেও ত হয়, এ অপকর্মটা যে-কোন অধীন কর্মচারীই ত করতে পারবে। কিন্তু কয়েদীর কাছ থেকে যেমন করে হোক গ্যেরিলাদের সম্বন্ধে কিছু খবর আদায় করতে হবে। জেলার সর্বত্রই তারা কাজের দ্বারা তাদের অস্তিত্ব বেশ ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছে। আর তা ছাড়া, অধীন কর্মচারীদের প্রতি ততটা আস্থাও তার ছিল না। তার উপর, উক্রেনের ভাষা তারা ভাল করে জানে না ; যে সব দোভাষীর সাহায্য নিয়ে তারা কাজ চালাবে, তাদের বিদ্যাও হয় ত ওদের চেয়ে খুব সামান্য বেশি এবং অধিকাংশই নিরেট। ও নিজে উক্রেনের ভাষা ও রুশীয় ভাষা সমান ভাবেই জানে। এ যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ও ভালভাবে ওদের ভাষা শিখেছিল। কিন্তু তখন কোন দিন ভাবতেও পারে নি যে ওর সে বিদ্যার প্রয়োগ এইরূপে এ সব ক্ষেত্রে করতে হবে। অবশ্য যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের ভাষা জানা থাকলে অনেক কাজে লাগে, তখন মনে হয় যে, ভাষা শিখতে যে সময় ব্যয় করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয় নি।

“বেশ্, তারপর ? তোমাদের দলপতির কি নাম না, দুলাল, তাই না ? কিন্তু এটা ত ডাকনাম, আসল নামটা কি ?”

নীরব। সে দেখল যে, মেয়েটি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর কপালে গালে নাকের পাশে কিছু কিছু ঘাম জমেছে। চোয়ালের পাশের ভাঁজ দুটো যেন আরও গভীর দেখাচ্ছে এবং হাত দুখানি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

“তুমি কথা বলবে, কি বলবে না—সেই কথাটা বল।” হঠাৎ সে নিজেই যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। এ সব বাদ দিয়ে বাড়ী চলে গেলেও পারে। তার মনে

হচ্ছিল, তার চলে আসার পর পুসিয়া হয় ত বিছানা ছেড়ে উঠেছে, না হয় আবার গিয়ে মুড়ি স্থড়ি দিয়ে শয্যার আশ্রয় নিয়েছে।

... ...

কিন্তু পুসিয়া বিছানায় ছিল না। জামাকাপড় পরতে সে অনেকটা সময় কাটাল, তারপর আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবার জন্যেও কিছুটা সময় কাটিয়ে দিল। তারপর গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অতি-প্রিয় রেকর্ড-গুলিও যেন পানসে লাগল। কারুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু কার কার সঙ্গে বলবে?

রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা জল নিয়ে পেট ভরে পান করল। ফেডোসিয়া ক্রাবচুক উনুনের সামনে একটা টুলের উপর চেপে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। পুসিয়া জানলার উপর বসল এবং ফেডোসিয়ার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়ানো আলুর খোসাগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে কেমন করে ঝুড়ির মধ্যে পড়ছে, তাই দেখতে লাগল।

"আলুগুলো ত ভয়ানক ছোট।"

ফেডোসিয়া কোন জবাব দিল না।

"এখানে আলু কি সব সময়ই এত ছোট হয়?"

নীরব।

"আমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না কেন, বলতে পার?"

ফেডোসিয়া মাথা তুলে নীরব ঔদাসীন্যে পুসিয়ার দিকে তাকাল। তারপর সে আবার তার কাজে মন দিল।

"আমার দিকে ওরকম করে চেয়ে থাক কেন? তুমি কি মনে কর যে, আমি একটা মানুষ নই? সারা দিন একটা কথা বলবার লোক পাই নে। এমন অবস্থায় মানুষ বাঁচতে পারে না!"

পুসিয়ার নিজের জন্যে ভারী দুঃখ হল। তা ছাড়া, গা-টাও তার কেমন গুলিয়ে উঠছিল, একবারে অতগুলো চকোলেট খাওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু কুর্ট তার জন্যে যে খাবারই আনুক না কেন, মুহূর্ত বিলম্ব না করেই সেগুলো

খাওয়ার লোভ সে সংবরণ করতে পারে না। একটা আলু টুপ করে জলের মধ্যে পড়ে গেল ; মেঝেয় খানিকটা জল এসে ছিটকে পড়ল।

"আমি ত কখনও তোমার ক্ষতি করি নি। করেছি বলতে পার ?"

ফেডোসিয়া একবার তার পানে মুহূর্তের জন্য তাকাল ; সে দৃষ্টি দিয়ে যেন তার ভিতরটা একবার খুঁজে দেখে নিল। কিন্তু প্রশ্নের কোন জবাবই দিল না।

"দিনের পর দিন আমি এখানে একলাটি বসে থাকি, কুর্ট একটুক্ষণের জন্যে একবার দেখা দিয়ে আবার চলে যায়। আমি কারুর সঙ্গে কথা বলতে পাই নে। আমার কাছে কেউ এসে বসেও না। বাইরে গিয়ে যে একটু বেড়িয়ে আসব, কুয়াশার জন্যে তারও জো নেই। এমনি ভাবে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। গ্রামোফোন ছাড়া আর কিছু নেই, তারও সব রেকর্ড আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তুমি গ্রামোফোন শুনবে ?"

ক্রুদ্ধ হয়ে পুসিয়া এমন শক্ত করে হাত মুঠো করল যে লাল নখগুলো তালুতে কেটে বসল।

"কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ? আমার কি প্লেগ হয়েছে না কি ?"

এবার ফেডোসিয়া মাথা তুললে : "প্লেগের চেয়েও খারাপ কিছু তোমার হয়েছে। প্লেগে যারা মরে, তোমার মৃত্যু তাদের চেয়েও সাংঘাতিক হবে, বলে দিচ্ছি।"

পুসিয়া আঁতকে উঠল। ফেডোসিয়ার দিকে হাঁ করে তাকাল। তার মুখ-চোখ দু-ই আয়ত হয়ে উঠল। এই ক্রাবচুক-ঘরণী যে কথা বলতে পারে এটাই ও ধারণা করে নি। এখন হঠাৎ সে তার অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করল—যা সে সুদীর্ঘ একমাস ধরে রক্ষা করে এসেছে—কিন্তু কেমন করে ! পুসিয়ার এখন কি করা উচিত ? তাকে ধমকাবে, মারধর করবে, চেঁচিয়ে উঠবে—না, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে গ্রামোফোনটায় আবার দম দিয়ে একখানা চড়া সুরের হাসির রেকর্ড চাপিয়ে দেবে ?

কিন্তু তার নিজেরই বিস্ময় লাগল যখন দেখল যে, সে এ সবের কিছুই করল না ; বরং আপনা আপনিই নানা যুক্তির অবতারণা করল।

"চারি দিকে এ সব কি হচ্ছে? আমারই বা কি করতে হবে? আমি কি উপোস দিয়ে মরব? ধৈর্য? কিসের জন্যে ধৈর্য ধরব? জার্মানরা হয়ত চিরকালই এখানে বসবাস করবে। একটা মেয়েকে ত তার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই দেখে নিতে হয়। সেরিয়োশা নিশ্চয়ই অনেক আগে যুদ্ধে মারা গিয়েছে। আর এই কুর্ট লোকটিও খারাপ নয়। আমি ঠিক জানি ও লোক মন্দ নয়। আর আমিও এখানে থাকতে চাই নেঃ অনেক কিছু সহ্য করেছি। ও আমাকে ড্রেসডেন নিয়ে যাবেঃ সে-ই ভাল। এত দিন যে আমি কি ভাবে জীবন যাপন করেছি, তা কে জানে? পরবার কিছু ছিল না—এমন কি, সামান্য একটা জামা পর্যন্তও না। মোজার জন্যেই কত কষ্ট না পেয়েছি! এক জোড়া শতছিন্ন মোজা অতি কষ্টে পায়ে দিতাম। ··· আর পাব কোথায়?"

"হাঁ, ঠিক তাই! আমিও সেই কথাই বলছিলাম। মোজাই! ··· তোমার বোন খাসা মেয়ে, শিক্ষয়িত্রী, মর্যাদার কাজ করে। আর তুমি—তুমি আছ তোমার মোজা নিয়ে! তোমার আসল নামে তোমাকে ডাকবার প্রবৃত্তিও আমার হয় না। আর এও জেনে রেখো, তোমার কুর্ট তোমাকে আদৌ কোথাও নিয়ে যাবে না, ছেঁড়া জুতার মতই তোমায় ছুঁড়ে ফেলবে, তোমার মত একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের যা গতি তা-ই তোমার অদৃষ্টে ঘটবে। সে নিজে পালাবার আগেই তোমাকে পরিত্যাগ করবে এবং এটাও জেনে রেখো যে, তাকেও শীঘ্রই যেতে হবে। যত দিন পার ততদিনই আমার পালকের শয্যায় তোমার জার্মানটাকে নিয়ে দিব্য আরামে বাস কর। পৃথিবীতে কোথাও তোমার মাথা গুঁজবার জায়গা মিলবে না, তোমার জার্মানটারও না। আমাদের ছেলেরা ফিরে আসবেই, শীত কালে ফড়িং-এরা কোন্ দিকে উড়ে যায় সেই পথই তারা তোমাদের দেখাবে।"

পুসিয়ার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। প্রত্যেকটি কথা চাবুকের মত তাকে আহত করল। সে চেঁচিয়ে উঠল, রাগে তার কণ্ঠস্বর তখন কাঁপছেঃ "বেশ, তার পর! তুমিও সবুর কর! জল আনতে গিয়ে সব সময়ই তুমি কেন অত দেরী কর তা কুর্ট এলেই তাকে আমি বলব। কোথায় তুমি যাও—সব বলব তাকে।"

ফেডোসিয়া লাফিয়ে উঠল। খোসা ছাড়ানো আলুগুলি মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল। ছুরিখানা সশব্দে মাটিতে ছিটকে পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সে পুসিয়ার দিকে এগিয়ে চলল। পুসিয়া ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে দুহাতে বুক ঢাকল—যেন সে এমনি করেই নিজেকে রক্ষা করবে।

"আমি কোথায় যাই, তুমি জানলে কেমন করে? কেমন করে জানলে তুমি?"

হঠাৎ পুসিয়ার মনে হল যে বাইরে একটা সান্ত্রী আছে, জানলা দিয়ে ডাকলেই সে ছুটে আসবে। সঙ্গে সঙ্গেই তার ভয় দূর হয়ে গেল।

"আমার যা জানবার—সবই আমি জানি।"

"ও, তুই ..."

ফেডোসিয়া এই অতি নগণ্য ইঁদুরের মত জীবটাকে গলা টিপে মারবার অদম্য আগ্রহকে কোন মতে জয় করল। সে চেয়েছিল গলা টিপে দম্ বন্ধ করে ওকে মারবে, পরে লাথি মেরে বাইরে ফেলে দেবে। কিন্তু এই দুর্বল শীর্ণ দেহকে স্পর্শ করবার কথা মনে হতেই একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ওর মনটা ভরে উঠল। একটা জরাগ্রস্ত বিকলাঙ্গকে দেখে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মনে যে ভাব হয়, পুসিয়ার সম্বন্ধে ওর মনের অবস্থাটাও ঠিক তেমনি হল। সে মাটিতে থুথু ফেলে উনুনের কাছে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। এবং আবার ক্ষিপ্রহস্তে আলুর খোসা ছাড়াতে আরম্ভ করল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চক্রাকারে খোসাগুলি আবার গামলার মধ্যে পড়তে লাগল। পুসিয়া মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে গ্রামোফোনে দম দেওয়ার জন্যে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রথমে সে একটা আনন্দের গান খুঁজতে লাগল—খুব হাসির কোন রেকর্ড, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগে তার চোখে জল বেরিয়ে পড়ল। দুঃখে কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত বেছে বের করল একখানি করুণ গান।

শয়নঘর থেকে ক্ষীণস্বরে একটা গানের কলি ভেসে আসছে:

"এখনও জ্বলিছে আগুন
এখন নিবেনি চিতা..."

তা হ'লে কি হ'ত! সব জানলে সেনানী চুপ ক'রে থাকত না। যুদ্ধে যারা মরেছে তাদের সৎকার করায় যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, আজও তা বলবৎ আছে। গ্রামপ্রান্তে নালার মধ্যে সেই মৃতদেহগুলি বাতাস, বরফ ও দাঁড় কাকদের দাক্ষিণ্যে যেমন পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকবে। লোকের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যে উলঙ্গ মৃত দেহগুলিকে ওভাবে ফেলে রাখা হয়েছে—জার্মানরা যে বিজয়ী হয়েছে, এ সব তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। চাষীরা প্রথমটা মৃতদেহগুলো কবর দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি; নালাগুলিকে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়েছে। একদিন তরুণ পাশচুক একখানা কোদাল নিয়ে পুল পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু সেই রাত্রি থেকেই সে বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে আর আর মৃতদেহের সঙ্গে সেখানে পড়ে আছে, তার মাথাটা বরফে চাপা পড়েছে। কাজেই, সব কিছুই যেমন ছিল তেমনি আছে। লোকেরা বুঝেছে যে এতে কিছুই তাদের করবার নেই।

কিন্তু সারা গাঁয়ের আর কারুরই ছেলে সেখানে পড়ে নেই। একমাত্র তার ছেলেই রয়েছে। বিশেষ কাজের জন্যে যে ছোট্ট সৈনিকের দলটি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যবশে সে দলে ভাসিয়াও ছিল। সে কি আনন্দ, সে কি পুলক! ··· অপ্রত্যাশিতভাবে সে তাদের কুঁড়ে ঘরে ছুটে এল, তার সে স্বাভাবিক হাসিখুশী তখনও অব্যাহত। শুধু ক্ষণেকের জন্যে—রাত্রি শেষ হতে না হতেই জার্মানরা কিছু বুঝতে না দিয়েই হঠাৎ এসে তাদের আক্রমণ করল, নালার পাশে তারা ভাসিয়াদের ঘিরে ফেলে সকলকেই হত্যা করল।

ফেডোসিয়া সেই দিনই ভাসিয়াকে খুঁজে পেয়েছিল। মায়ের মন ঠিক জায়গায় তাকে পৌঁছে দিয়েছিল। তখন সে মরে গেছে এবং তার দেহ থেকে তারা জামাকাপড় সব খুলে নিয়েছে।

সেই দিন থেকে এই একমাস ধরে সে তার ছেলেকে দেখবার জন্যে সেখানে যায়। কেমন করে তার ছেলের মৃতদেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেছে, কেমন করে বিবর্ণ হয়েছে, কেমন করে বরফে মুখখানা লোহার মত কালো হয়ে গেছে, কেমন করে তার অনাবৃত পায়ের তলা ফেটে চৌচির হয়েছে। প্রতিদিন দেখে দেখে

সে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই যখন সুযোগ পায়—জল আনতে গিয়ে একবার ডুবারিতে তার মৃত পুত্রকে দেখে আসে। কিন্তু এখন ?—এখন কি হবে ?

"কত না প্রেম কত না আশা—
কত সে সোহাগ, কত ভালবাসা
ছিল স্বপনে তোমার, জানি তা

—গ্রামেফোন গেয়ে চলেছে।

কুর্ট কখনও চুপ করে থাকত না, তার চোখ এড়াবার ত কথা নয়। ফেডোসিয়া তার নিজের জন্যে ভয় করে না, সে তার ছেলের জন্যে—মৃত পুত্রের জন্যে ভাবছে, যে কপালে বুলেটের ক্ষত নিয়ে নালার মুখে পড়ে আছে, বরফে জমে পাথর বনে' গেছে। তার মনে হল, সে যেন তাকে আবার হারাতে বসেছে—তারা মৃত দেহটা সরিয়ে ফেলবে, হয় ত কোন অজানা গর্তে ফেলে দিবে, মৃত দেহের মর্যাদা নষ্ট করবে, নয় ত টুকরো টুকরো করে আকৃতিটা নষ্ট করে দিবে—তারা সব কিছুই করতে পারে, তাদের অকরণীয় কিছু নেই। ...

"কত না প্রেম কত না আশা
কত সে সোহাগ, কত ভালবাসা
ছিল স্বপনে তোমার, জানি তা। ..."

গ্রমোফোনটা অসহ্যরূপে বিরক্তিকর ঠেকছিল।

পুসিয়া আপন মনে কল্পলোক তৈরি করছে। একই রেকর্ড দশবার বাজাচ্ছে। যে প্রেম একদিন ছিল—আজ নেই, যে সুখ অতীতে মিলিয়ে গেছে, সে সব কথার আর কোন অর্থ হয় না, তারই গান বাজছে ওই গ্রামোফোনটায়। চুল্লীর পাশে বসে যে মেয়েটি আজ আকাশ-পাতাল ভাবছে, তার চিন্তার সঙ্গে যেন গ্রামোফোনটার সুর বাঁধা—করুণ মর্মস্পর্শী। ভোঁতা ছুরিখানা ফেডোসিয়া ক্রাব্‌চুক হাতের মুঠায় চেপে ধরল—কোন ব্যথা লাগল না। যেখানটায় একটু কেটে গেল শুধু সেখানটায় এক ফোঁটা রক্ত বেরুল। আঁচলের কোণ দিয়ে সে রক্তটুকু মুছে নিল।

"এখনও জ্বলিছে আগুন
এখনও নিবে নি চিতা ..."

ও কি করবে? কেমন করে তার কাছে যাবে? ও যেন ভাসিয়ার জীবন রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল; কোন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর চেয়েও কঠোর কোন কিছুর হাত থেকে সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে ফেডোসিয়ার মন তখন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু কেমন করে বাঁচাবে?

ও জানত সেখান থেকে তাকে সরানো অসম্ভব, সে জমে বরফ হয়ে গেছে। একমাত্র বসন্তকাল এলে সে জমাট বরফ গলবে, তার আগে ওকে সে বরফের শয্যা থেকে তোলা যাবে না। কিন্তু যদি ... কেমন করে সে তুলবে? দেহটা সঙ্কুচিত হয়ে সেই পনর-ষোল বছর বয়সের মতই হয়ে গেছে! কিন্তু ও কেমন করে তুলবে তাকে? আর তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যাকারীদের চোখ থেকে গোপন করে রাখবেই বা কোথায়?

"কত না প্রেম কত না আশা
কত না সোহাগ, কত ভালবাসা
ছিল স্বপনে তোমার, জানি তা ..."

জার্মানদের পাপ হস্ত ওই মৃতদেহকে স্পর্শ করবে, ওদের পায়ের সে কদর্য বুট দিয়ে হয়ত লাথি মারবে। গরুর মত মুখ নিয়ে জার্মানগুলো হয় ত ভ্রূকুটি করে চাইবে ওর পানে, আর তারই মাঝখান থেকে ক্যাপ্টেন কুর্ট ভের্নেরের ভাঙা গলার কর্কশ হাসি শোনা যাবে। ফেডোসিয়া নিরুপায় হতাশার সঙ্গে হাত মোচড়াতে লাগল—নিতান্ত অসহায় সে। আলুগুলোর কথা সে ভুলে গেল, ভুলে গেল যে, চুল্লীর আগুন উস্কে দিতে হবে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

ওর মনে হচ্ছিল, আর কত খারাপ হতে পারে, যত রকম আঘাত থাকতে পারে—সবই ত ওর অন্তরকে নিষ্পিষ্ট করেছে। তবুও মনে হয়, এ আর এক স্বতন্ত্র আঘাত। এ আঘাতের যেন সীমা নেই। ডিসেম্বর মাসের সেই এক দিন—যে দিন গ্রামের মাথায় কালো মেঘ জমেছিল, প্রতি মুহূর্তে সকলের মনে

অনাগত সর্বনাশের ছায়াপাত করেছিল, ওর এই আশঙ্কা যেন তার চেয়েও বেশী। হঠাৎ ফেডোসিয়ার মনে হল, মাগীটা কেমন করে জানল? কে বলেছে ওকে?

মুহূর্তে কয়েকটি চেনালোকের কথা মনে আসে। মাস্টারনী—না, ফেডোসিয়ার মনে এক তিলও সে সন্দেহ হয় না। কোন অবস্থাতেই মাস্টারনী সে কাজ করতে পারে না। তবে কে? গ্রামের সকল লোকই অবশ্য জানে। কিন্তু গ্রামবাসীরা ত সকলেই ওর আপনার লোক। তবে কি পেলাগিয়া? সে ত কখনও কোথাও যায় না। কেউ তার সঙ্গে কথাও বলে না। সে কেমন করে জানবে? মায়ের এই মর্মবেদনা নিয়ে কে বিশ্বাসঘাতকতা করল? শত্রুর হাতে ভাসিয়া কম নির্যাতন ত সহ্য করে নি।

গ্রামোফোনটা হঠাৎ থেমে গেল। পুসিয়া ফেল্টের বুট জোড়া পায়ে দিয়ে সযত্নে কার্ কোটের বোতাম আঁটতে লাগল। কোটটা পুসিয়ার গায়ে বেশ একটু বড় হয়। কুর্ট শহরের কার গায়ের থেকে ছিনিয়ে এনে তার স্ত্রী পুসিয়াকে উপহার দিয়েছে। জামাটা বেশ গরম। আস্তিনে হাত দুখানি ঢেকে রাখা যায়, তুলোর মত ফোলা কলার দিয়ে গাল দুটো ঢেকে বরফের হাত থেকে বাঁচা যায়।

পুসিয়া দালানে বেরিয়ে এসে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বাতাসটা অত্যন্ত কন্‌কনে, এত ঠাণ্ডা যে, মনে হয় গোটা পৃথিবীটা বরফে ভরে গেছে। যে সব জায়গায় ছায়া আছে, সেখানে বরফগুলোর রং নীল দেখাচ্ছে কিন্তু যে বরফগুলোয় সূর্যের আলোক পড়েছে সেগুলো হীরার মত ঝক্ ঝক্ করে, চোখে তার ছটা লাগে। গ্রামখানি যে পাহাড়ের উপর তার ডাইনে বাঁয়ে সাদা ও নীল বরফের স্তর কত দূর পর্যন্ত ঝক্ মক্ করে তার সীমা নির্ণয় করা যায় না। আকাশ ও মাটিকে তুষারের সাঁড়াশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে চৌমাথার এই ছোট নির্জন গ্রামখানিকে ঘিরে রয়েছে। পুসিয়া একবার কুটীরের দিকে চাইল। সৈনিকেরা ইতস্তত জটলা করছে এবং গীর্জার সামনেকার ময়দানটায় গোলন্দাজদের ছাউনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানেই যত সৈন্যের ভিড়। কিন্তু

গ্রামের লোক একটিও দেখা যাচ্ছে না। পুসিয়া এগিয়ে চলল। কুর্টের সঙ্গে আজ সে তার আপিসে গিয়ে দেখা করবে।

ময়দানের একপ্রান্তে একটি ফাঁসি-মঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে—দুটো সোজা খুঁটির উপর একটি আড়া। আড়ার ঠিক মাঝখানে একটি লোকের দেহ ঝুলছে। গ্রামে ক্যাপ্টন কুর্টের যে কি রকম প্রতাপ—তারই নিদর্শনের পাশ দিয়ে পুসিয়া উপেক্ষা ভরে চলে গেল। ইতিমধ্যে সে এত বার এ দৃশ্য দেখেছে যে আজ তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, মাসখানেক আগে সে যখন কুর্টের সঙ্গে গ্রামে আসে তখন থেকেই এক তরুণের দেহ ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে দেখে আসছে। 'দেহটা শক্ত হয়ে গেছে, একদিন যে ওটা মানুষের দেহ ছিল, আজ তা মনেও হয় না। ওর মনে হয় যেন ও কাচের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। শব্দটা খুব বিরক্তিকর। ও যে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, সে পথটা একেবারে নির্জন। কুঁড়েগুলো বন্ধ, জানলা আগাগোড়া তুষারের প্রলেপে মুড়ে রয়েছে—দেখে মনে হয়, যেন রূপালী পর্দার ছায়াছবি। যে বাড়ীগুলোয় জার্মান সৈনিকেরা বসবাস করছে সেগুলোর কোন কোনটা থেকে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর যেগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না সেগুলোয় রান্না করবারও কিছু নেই।

একটা কুঁড়ের দরজা খুলে কে একজন মুখ বার করেই পুসিয়াকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা হড়াম করে বন্ধ করে দিল। পুসিয়া তার কাঁধ দুটো ঝেঁকে উঠল। তারা ওকে কুষ্ঠগ্রস্ত মনে করে দূরে থাকতেই চায়, ওর সংস্পর্শে এলে পাছে তাদেরও সে রোগ আক্রমণ করে এই আশঙ্কা তাদের চালে চলনে প্রকাশ পায়। পথে চলতে চলতে ছেলেরা ওকে দেখতে পাওয়া মাত্র সে পথ ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যায়। যাক তারা পালিয়ে। কে পরোয়া করে? তারা না খেতে পেয়ে শীতে মরবে, তাদের ভাগ্যে তাই লেখা আছে। আর পুসিয়া সুস্থ সবল হয়েই বেঁচে আছে; দামী ফারকোট গায়ে দেয়, যতটা খুশী চকোলেট খেতে পায় এবং পরম সুখেই আছে সে এবং হয় ত একদিন তার ক্যাপ্টেন স্বামীর সঙ্গে জার্মানী চলে যাবে। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, গ্রামবাসীরা তাদের ভাগ্য বেছে নিয়েছে, আর পুসিয়াও তার নিজের পথ খুঁজে

পেয়েছে। তারা নির্বোধ, এমন একটা জিনিস বিশ্বাস করেছে—যা কখনও ঘটবে না এবং এমন কিছুর প্রত্যাশায় রয়েছে—যা কখনও হতে পারে না। তারা সাংঘাতিক ভাবে ঠকবে। কুর্ট তাকে স্পষ্টই বলেছে যে, জার্মানরাই জিতবে। ওরা যদি জার্মানীর হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ না করে ত ওরা মরবে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এসব কথা সোজা হলেও গ্রামবাসীরা বুঝতে রাজী হয় নি। গ্রামের সকলেই সৈন্যদের আগমন প্রত্যাশায় রয়েছে, পুসিয়া কিন্তু তাদের দেখবার জন্যে এতটুকুও লালায়িত নয়। সে কি তাদের চেয়ে বেশী আরামে নেই? প্রকৃতই সে সুখী।

পায়ের চাপে বরফ মড়্ মড়্ করে গুঁড়ো হতে লাগল, চোখে এসে আলোর ছটা লাগে। এই বিশ্রী তুষার আর কত দিন থাকবে? পুসিয়ার মনে হচ্ছিল, বেরালের মত লেজ গুটিয়ে রোদে শুয়ে শরীরটা গরম করে নিতে পারলে কত আরামই না হত। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কন্‌কনে শীত প্রবেশ করেছে, সূর্যের তাপে সেটা কেটে যেত। কিন্তু সে চোখ-ঝলসানো সূর্যের আলোও যেন এখন তুষার হয়ে গেছে। গরমের পরিবর্তে যেন ঠাণ্ডাই ঝরে পড়ে।

দরজায় সান্ত্রীটা তাকে পথ ছেড়ে দিল। পুসিয়া গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে কুর্টের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই সে বরাবর আপিসের ভিতর ঢুকে গেল।

"ব্যাপার কি?" কুর্ট জিজ্ঞাসা করল।

"কিছুই না," পুসিয়া বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দেয়। "একা একা আমার ভাল লাগছিল না, তাই।" টেবিলের সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তাকে সে এক-নজর দেখে নিল। আধাবয়সী একটি স্ত্রীলোক, চুলগুলোতে পাক ধরেছে, পেটটা মস্ত বড়—দেখলেই মনে হয় অন্তঃসত্ত্বা। পুসিয়া একটা চেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ল।

"তোমার কি অনেক দেরী হবে?"

"আমি কি তোমাকে বলেছি ··· দেখতে পাচ্ছ না কত ব্যস্ত?" কুর্ট যেন বিরক্ত হল। পুসিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে রাগতভাবে কানে কানে বললে,

"কত বার তোমাকে বলেছি, এখানে এসো না। দেখতে পাচ্ছ না আমি ব্যস্ত? কাজ শেষ হলেই বাসায় যাব।"

পুসিয়া ছেলেমানুষের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাল।

"আমার ভারী খারাপ লাগছিল, সাংঘাতিক একা বোধ হচ্ছিল। রাত্তিরে খেতেও কি একবার যাবে না? ভারী বিশ্রী লাগছিল। তুমি ত থাকই না। আচ্ছা, একটা বুড়ো মাগীর সঙ্গে কথা বলে তুমি কি পাও? আর কেউ কি এ কাজ পারে না?"

"না, কেউ পারে না। আর এই স্ত্রীলোকটি কে জান?—একজন গ্যেরিলা!"

পুসিয়া কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল।

"গ্যেরিলা! তুমি বলছ কি কুর্ট! দেখছ না, ও গর্ভবতী, যে-কোন সময় প্রসব হতে পারে!"

"হাঁ, তাই," কুর্ট ওকে বাধা দিয়ে বলে। "এখন বাড়ী যাও, আমি শীগগিরই যাচ্ছি।"

একান্ত আজ্ঞাবহের মত পুসিয়া কুর্টের জামার হাতায় টোকা মারল।

"কুর্ট, লক্ষীটি, আমি একটুক্ষণ থাকি। একটু তোমাদের কথাবার্তা শুনি। এতে আপত্তির কি আছে?"

"বেশ," কুর্ট রাজী হল। "থাকতে চাও থাক, কিন্তু তোমার খুব বিরক্তি আসবে, মোটেই ভাল লাগবে না বলে দিচ্ছি।" সে ওকে একখানা চেয়ার আগিয়ে দিল।

পুসিয়া জামার বোতাম খুলে বসে পড়ল। তার ঠোঁট থেকে তখনও শুষ্ক হাসিটুকু মিলিয়ে যায় নি। চেয়ারের সামনে যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়েছিল তার দিকে একবার কালো গোল গোল চোখ দুটো তুলে তাকিয়ে নিল। তা হলে, এ একজন গ্যেরিলা! এ ত ভারী অদ্ভুত! সত্যি অদ্ভুত! ... ও জানে যে কুর্ট গ্যেরিলাদের বেজায় ভয় করে; অবশ্য সে যে কোন কিছু থেকেই ভয় পায় এ কথা সে কখনও স্বীকার করে না। কিন্তু তবু সে গ্যেরিলাদের ভয় করে। পুসিয়া একথা জানে এবং আরও কোন অজানা কারণেও কথাটায় খুশীই হল। তা

হলে দেখা যাচ্ছে যে, পরম আত্মবিশ্বাসী দুর্দ্ধর্ষ কুর্টেরও সময়ে ভয় পাওয়ার মত বস্তু আছে! অথচ এই কুর্টই সকল প্রশ্নের উত্তর জানে এবং তার কাছে সবকিছুই সব সময়ে সহজ ও সরল।

না, গ্যেরিলাদের সম্বন্ধে ওর যে ধারণা ছিল এ ত সে রকম নয়। ওর ধারণা ছিল, গ্যেরিলাদের মাথায় ইয়া বড় চুল, ইয়া বড় দাড়ি, হাতে কুড়োল—যেন এক একটা দৈত্য। এত কাল সারা পৃথিবীটাকে যে সাংঘাতিক শীত কাবু করে রেখেছে গ্যেরিলারা সেই শীতকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে বনে জঙ্গলে ঘুপটি মেরে থাকে। কিন্তু এ ত দেখছি ফেডোসিয়া ক্রাবচুকের মতই একজন অতিসাধারণ কৃষক রমণী, উপরন্তু এ আবার গর্ভবতী। স্ত্রীলোকটির অতিবৃহৎ পেটটির দিকে পুসিয়া একবার বক্র দৃষ্টিতে তাকাল। সামনের স্কার্টটা পিছনের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে। সে এই মনে ক'রে খুশী হ'ল যে, সে নিজে ছোটখাট এবং তন্বী; নীরবে গরম জামা পরে বসে আছে এবং ইচ্ছে করলে সে এখনই উঠে যেখানে খুশী চলে যেতে পারে, গ্রামোফোন বাজাতে পারে, কুর্টের সঙ্গে সন্ধ্যা বেলা নৃত্যও করতে পারে।

কুর্ট স্ত্রীলোকটিকে সমানে একঘেয়ে প্রশ্ন ক'রে চলেছে, প্রশ্নের যেন শেষ নেই, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাষ। স্ত্রীলোকটিও জবাব দিচ্ছে। প্রথমটায় পুসিয়া প্রশ্ন ও তার জবাবগুলো শুনছিল, কিন্তু একটু ক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করল যে, সত্যি বড় বিরক্তিকর এবং এর কোন মানে হয় না। কুর্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করতে লাগল এবং স্ত্রীলোকটিও একই উত্তর দিচ্ছিল এবং প্রতি বারে একই শব্দ ব্যবহার করছিল।

ওলেনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। শ্রান্তি যেন তার মৃত্যু-যন্ত্রণায় পৌচেছে। তার চোখের সামনে কালো কালো কুণ্ডলী ভেসে ওঠে, টেবিলের তলা থেকে একট অন্ধকার-প্রবাহ এসে যেন ওর চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে ফেলেছে। তুষারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও ওকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। কুণ্ডলায়িত অন্ধকারের ভিতর থেকে ও কেবল দেখতে পাচ্ছে টেবিলের পিছনে উপবিষ্ট সেনানায়ককে ও টেবিলে-পড়ে-থাকা কাগজগুলি।

সেনানায়কের পিছনে যে জানলাটি আছে তার কাচের শার্শিগুলি ওর নজরে পড়ে। ওলেনা শীতার্ত হয়ে ওঠে। মুখখানা চট্‌চটে ঘামে ভরে ওঠে। হাত দুখানা লোহার বাটখাড়ার মত ভারী হয়ে আসে, পা দুটো এত কন্ কন্ করে যে, ওর সহের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। মনে ভাবে, পা দুটো হয় ত ফুলে গেছে। কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে! এক ঘণ্টা? দু ঘণ্টা? তিন ঘণ্টা? না, তার চেয়েও অনেক বেশী, হয় ত সারা দিনই এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। না, তা ত হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও জানলাটার বাইরে সূর্যের আলো দেখেছে। কাজেই যতক্ষণ ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে, আসলে ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে নেই।

তলপেটটাও কন্ কন্ করে, সমস্ত শরীরে এমন একটা ঝাঁকানি লাগে যে মনে হয়, শিরাগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ে পড়ছে। তার উপর আবার চোখের সামনে এসে পড়ল ওই মাগীটা। ওলেনা ওকে চেনে, ওর সম্বন্ধে সবই জানে সে। আরামের সঙ্গে বসে মাগীটা বোতামের মত গোল গোল চোখ দুটো দিয়ে ওলেনার দিকে চেয়ে আছে। ফার্-এর টুপিটা খুলে চুলগুলো গুছিয়ে নেয়। ওলেনার ক্লান্ত চোখে ঝক্ ঝক্ করে লাগে ওর মাকড়ির নকল হীরার ছটা। পাথর দুটো যেন জ্বলছে! কুণ্ডলায়িত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আগুনের ফুলকির মত সরু ছটার রেখা দেখা যাচ্ছে। চোখের সামনে অন্ধকারটা আরও বেশী ঘনিয়ে ওঠে। ওলেনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হাতের মুঠো শক্ত করে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে। 'না, না! ওই জার্মানটার রক্ষিতার সামনে এ দেহ কিছুতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেবো না। ওই মেয়েটা নিজের দেশ—তার জাতির ভাইবোনদের ত্যাগ করে এই সেনানায়-কের শয্যায় নিজের দেহ দান করেছে। এখন ফার্-এর পোশাক পরে, কানে মাকড়ি ঝলমলিয়ে বসে বসে দেখছে ওই জার্মানটার হাতে আমার নির্যাতন। এটা যেন আজ তার দ্রষ্টব্য বিষয়—এতে ওর লাভ হবে!'

পুসিয়ার মুখে সেই অর্থহীন হাসিটুকু যেন দেখতে দেখতে বাঁকা হয়ে উঠল। ও ওলেনার কথাও ভাবছিল না। এমন কি, ওদের কি প্রশ্নোত্তর হচ্ছে সে

দিকেও তার কান ছিল না। বেশ গরম ধরিয়ে আছে এবং কুর্ট-এর আপিসে এসে সে বসে আছে, এ কথা ভাবতেই যেন তার আনন্দ হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, একমাত্র ও ছাড়া আর কেউ বোধ হয় ইচ্ছে মত এখানে আসতে যেতে পারে না। আর যারা আসে, তাদের আনা হয় সৈনিকদের সঙীনের মাথায় এবং তারপর হয় ত এমন জায়গায় পাঠানো হয় যেখান থেকে মানুষ আর কোন দিন ফেরে না। তারা কুর্টকে কত ভয় করে! অথচ এই কুর্ট ওর—শুধু ওরই একার। ও ইচ্ছে করলে মান-অভিমানও করতে পারে। তখন কুর্ট ওকে আদর করে বলবে—ওরে বাঁদরী, তোকে ড্রেস্‌ডেনে নিয়ে যাব।

"তুমি ছেলের মা," কুর্ট বলে।

ওলেনার দেহ অত্যন্ত ঝিমিয়ে এসেছিল। কুর্টের এই কথায় যেন তাঁর দেহ-মন মস্তবড় একটা অবলম্বন পেলে।

নিশ্চয়ই ও মা। অবশ্য জার্মানটার মগজে এ কথা কিছুতেই ঢোকেনি যে, তার এ উক্তি ওলেনাকে সঙ্কট-মুহূর্তে কতখানি সাহায্য করল—ঠিক যে মুহূর্তে ওর পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা সরে যাচ্ছিল, একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতায় ও অভিভূত হয়ে পড়ছিল, চোখের সামনে সব কিছুই যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল।

"তুমি মা। ..."

কথাটা কে বললে, টেবিলের ও পাশ থেকে জার্মান সেনানায়ক, না, বনের ভিতর থেকে কুর্লি বলে উঠল! গ্যেরিলাদের অধিনায়ক, সে হাস্যচঞ্চল ছেলেটি—যার মুখে বসন্তের দাগ আছে!

"তুমি মা। ..."

ওলেনা গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভাবছিল না—যে তার থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে এবং যে ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। ও ভাবছে তাদেরই কথা—যারা বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে, যারা ওকে মাতৃ-সম্বোধনের গৌরব দিয়েছে। দলের সকলকার চেয়ে ও ছিল বয়সে বড়—অনেক বড়। সে তাদের হয়ে অনেক কাজ করেছে, এই সে-দিনও সে একটা সাঁকো উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে সব কাজকে

কুর্ট ভেনের টেবিলে ঘুষি মারল। চার ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পরও একটু খবর বার করতে পারল না। গোড়ায় যেখান থেকে শুরু করেছিল, এতক্ষণ বাদেও সেইখানেই এসে থামতে হল। ক্রুদ্ধ হয়ে সে কাগজপত্র চাপা দিয়ে রাখল।

"দরোজা!"

একজন সৈনিক প্রবেশ করল।

"একে খামার-বাড়ীতে নিয়ে যাও। খানিকক্ষণ শীতে বসলেই তোমার হয় ত চৈতন্য হবে। বসে বসে গিয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখো, ভেবে চিন্তে সান্ত্রীকে বলো, তা হলেই সে আমাকে খবর দেবে।" বলে রেগে মেগে সে উঠে দাঁড়াল এবং দেরাজের চাবি বন্ধ করল।

"পুসিয়া, চলো ঘরে গিয়ে এক সঙ্গে খাই।"

অত্যন্ত খুশী হয়ে পুসিয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে এসেছিল, ভালই হয়েছে। ও না এলে কুর্ট হয় ত সন্ধ্যা পর্যন্তই ওখানে বসে থাকত।

আবার বরফের ছটা তার চোখে মুখে লেগে তার দৃষ্টি ঝাপসা করে দিতে লাগল। কুর্টের সামরিক বুটের চাপে বরফের টুকরাগুলি পুসিয়ার ফেল্ট বুটের চাপের চেয়ে বেশী মড়্ মড়্ করে গুঁড়ো হচ্ছিল! কন্‌কনে বাতাসের ঝাপটা এসে ওদের মুখে চোখে পড়ছিল।

"আকাশে ওটা কি?"

পুসিয়া একটু থমকে দাঁড়াল এবং কুর্ট যে দিকে নির্দেশ করছিল, সেই দিকে তাকাল। দূরে যেখানে দিকচক্রের নীল রেখা আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, সেইখানে একটি মনোরম রামধনু দেখা যাচ্ছে। তার সে বিচিত্র রঙের সম্ভার দেখতে দেখতে উবে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, আবার নতুন করে দেখা দিচ্ছে। সবুজ, নীল, বেগুনী, গোলাপী—নানা রঙ যেন একসঙ্গে ডানা মেলেছে।

"রামধনু!" বিস্মিত কুর্ট বলে উঠল। "শীত কালে রামধনু … এখানে কি তা হয় না কি?"

পুসিয়া খানিকক্ষণ ভাবল।

ওর জীবনের প্রধান কাজ বলে ও মনে করে না। ও দলের সকলকার জামাকাপড় পরিষ্কার করে ধুয়েছে, তাদের জন্যে রান্না করেছে, তাদের দেখাশোনা করেছে, তাদের ত দেখবার শোনবার কেউ ছিল না। পীড়িতের সেবা, আহতকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া, ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করে দেওয়া—এই ছিল তার প্রধান কাজ। সাধারণত মা তার সন্তানদের জন্যে যা-কিছু করে, ও তাই করেছে। তাই তারা ওকে মা বলে ডাকত।

"তুমি মা। ..."

ওর কাছে এই শব্দটা মনে হল যেন বনজঙ্গল পেরিয়ে আসা ওর সেই ছেলেদেরই আহ্বান। এই মুহূর্তে ওর মুখের একটি মাত্র কথার উপর তাদের সকলকার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। শব্দটা যেন ওকে ওর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিল, যেন সেই সুদূর থেকে এখানে তাদের আহ্বান এসে ওকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে দিল।

"গেরিলারা কোথায় লুকিয়ে আছে?"

বনের প্রতিটি পথ, প্রতিটি ঝোপঝাড়, প্রতিটি বৃক্ষগুল্ম ও চেনে। যে পথের কথা সেনানায়ক ওকে জিজ্ঞাসা করছে, ওর স্মরণে তা জ্বল্ জ্বল্ করছে। ওর ভয় হচ্ছিল, পাছে ওর সজল চোখে সেই পথের ছবি ভেসে ওঠে, তাই দেখে হয় ত সেনানায়ক চিনে ফেলবে সেই গোপন পথটি। এই মুহূর্তেই ওকে অন্য কথা ভাবতে হবে, একটুও দেরী করা চলবে না, হয় ওর নিজের বাড়ী, না হয় কোন একটা নদী কিংবা প্রতিবেশীদের কথা। কিন্তু ওর মনে অবিচল হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে পথটি, ঘন ঝার্‌ গাছের অন্তরালে যে আশ্রয়, কুর্লির হাস্যোজ্জ্বল বসন্ত-চিহ্নিত সেই কৌতুকভরা মুখখানি। যোলটি পুত্র, যোলটি নির্ভীক বীর সন্তান। সেই কৃষক রমণীর ছেলে তারা—যারা এত দিন শুধু অপেক্ষা করেই আছে সুখের মুখ দেখবে বলে। একটা স্বাধীন মানুষের সুখ! যে মানুষ প্রভুর পেয়াদার চাবুক কাকে বলে কোন দিন জানে না।

"দলের কথা আমি কিছুই জানি নে। তারা পালিয়েছে, কিন্তু কোথায়, বলতে পারি নে।"

"না, আমার ত মনে হয় না, অন্তত আমি কখনও এর আগে দেখি নি।"

কুর্ট তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল সেখানে যেখানে আকাশ ও পৃথিবীর সীমারেখায় সেই রঙ বিচিত্র স্তম্ভের সৃষ্টি করেছে।

"চলে এসো, ভয়ানক শীত, আমার পা দুটো জমে যাচ্ছে ..."

"লোকে বলে রামধনু ওঠা ভাল ..."

"রামধনু—রামধনুই," বলে পুসিয়া অধৈর্যের সঙ্গে কুর্টের জামার হাতা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

সেই কয় মিনিটের মধ্যেই বর্ণস্তম্ভটি যেন আরও উঁচুতে উঠে ধীরে ধীরে অর্ধ-চক্রাকার ধারণ করল। গোলাপী বেগুনে সবুজ—নানা রঙের উজ্জ্বল একটি সোনার পাত যেন পৃথিবীর মাথার উপর বিজয়-তোরণ রচনা করেছে। তার ভিতরের গোল আকাশটুকু যেন মস্ত বড় একটি কাচের ঘণ্টার মত পৃথিবীর উপর নেমে পড়েছে। ময়দানে বন্দুকধারী সৈনিকেরা এ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখবার জন্যে ঘাড় উঁচু করে রয়েছে।

তারা যখন বাড়ী পৌছল তখন ফেডোসিয়া ক্রাব্‌চুকও দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও নীরবে একাগ্র দৃষ্টিতে রামধনুর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

"লোকে বলে রামধনু শুভলক্ষণ," সেনানায়ক আসতে আসতে মন্তব্য করে!

বর্ষীয়সী কৃষক রমণী তার কাঁধ দুটো ঝেঁকে নিলে।

"হাঁ, হাঁ, লোকেরা তাই বলে বটে," অস্বাভাবিক স্বরে সে জবাব দিল এবং দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের প্রবেশের পথ করে দিল। সে নিজে কিন্তু সেই খানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার দেহে জামা কাপড়ের প্রাচুর্য ছিল না, সামান্য একটি ব্লাউজ গায়ে ও একটি স্কার্ট পরনে, হাত দুখানি অনাবৃত—এত শীত, তবু যেন তার চেতনা নেই, একান্তভাবে ওই বিচিত্র রামধনুটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওই বিজয়-তোরণ যেন আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—সোনালী আভার উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের এক অপূর্ব সুন্দর সমাবেশ।

২

পুসিয়া একটা ক্ষুদ্র জানোয়ারের মত কুর্টের বাহুসংলগ্ন হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস সমান তালে ওঠা-নামা করছে। সেনানায়ক চিৎ হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ফেডোসিয়া ক্রাবচুক রান্নাঘরের চুল্লীর উপর তাকে শুয়ে আছে, সেনানায়কের নাক-ডাকার শব্দ তার কানে আসছিল। শব্দটা অসহ্য রকমের বিরক্তিকর। তার মনে হল, এই নাক-ডাকার শব্দেই তার ঘুম আসছে না। দৃষ্টি মেলে সে জানলার দিকে চেয়ে আছে—সেখানে জ্যোৎস্নার আলো ভারী কুয়াশায় মিশে গিয়ে চক্ চক্ করছে। এলোমেলো নীল আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে টেবিল, টুল ও বালতিটার ছায়াগুলো বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

যাক্, তবু রাত্রি এসেছে। দিনটা কেটে গেছে, আরও একটা গোটা দিন কাটল। সন্ধ্যা থেকে পুসিয়া ওর প্রতি যে বক্র কটাক্ষ করছিল, সেটা অন্তত থেমেছে; জার্মানটার কলহাস্য আর সেই সঙ্গে ছুঁড়ীটার ছেনাল-পনা আর কানে আসে না। ও বোধ হয় মনে মনে স্থির করেছে যে, এবার ওকে নিয়ে সে একটু খেলবে, সহসা জার্মানটাকে কোন কথা বলবে না। না, কোন কথা সে বলেনি। ফেডোসিয়ার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুধু কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। ফেডোসিয়া যে সম্পূর্ণ ভাবে ওর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, ইচ্ছা করলে যে-কোন মুহূর্তে ও তাকে আঘাত করতে পারে—এ কথা ভেবে পুসিয়া আনন্দ পেয়েছে। এই নিতান্ত অস্থায়ী শক্তিটুকু হাতে পেয়ে ও উল্লসিত হয়ে উঠেছে। একটা মায়ের হৃদয়কে নিয়ে ও এখন যা-খুশি তাই করতে পারে। ওই গর্তের মধ্যে বরফের বিছানায় যে শুয়ে আছে, সেও এখন ওর হাতের মুঠোয়। যে-কোন মুহূর্তে পুসিয়া ইচ্ছা করলে তাকে ওই কদর্য জার্মানটার হাতে তুলে দিতে পারে। তার ওই অন্তিম বিশ্রাম-মুহূর্ত পুসিয়ার হাতে বিপর্যস্ত হতে পারে। ইচ্ছে করলেই জার্মানদের হাতে তার ওই মৃত পুত্রের দেহকে পুসিয়া খেলার সামগ্রী করে তুলতে পারে।

সারাটা সন্ধ্যা ফেডোসিয়ার মনটা ভার হয়ে ছিল। কিন্তু এখন সে চুপচাপ শুয়ে আছে, চোখে ঘুম নেই, একদৃষ্টে জ্যোৎস্নার আলোর দিকে চেয়ে কান পেতে পাশের ঘরের সেই বীভৎস নাকডাকার শব্দ শুনছে। ওর সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। করুক! করুক ওরা যা চায়! ওরা ত তার সবই কেড়ে নিয়েছে, পায়ের বুট জোড়া, গায়ের বড় কোটটা, পরনের পায়জামা—সব। জার্মানের হাতের স্পর্শ তার গায়ে লেগেছে, ওরা তাকে বরফের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। যখন ওই দুরন্ত বরফের ভিতর টেনে নিয়ে গেছে তখনও হয় ত ও বেঁচেই ছিল! জার্মানদের গুলীর আঘাতেই দেহের সবটুকু রক্ত নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। আজ সে বেঁচে নেই! নিজের গ্রামখানিকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ দিয়েছে। আর সেই আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুটি মেলে কোন দিনই চাইবে না, সেই মিষ্টি গলায় আর কোন দিনই গেয়ে উঠবে না—"ওরে তরুণ, খোল্, তোর ঘোড়ার লাগাম খোল্ ...” এখন যদি তারা ওকে অবমাননা করে, ওর মৃতদেহের অমর্যাদা করে—কী যায় আসে তাতে? তা করলে ওদেরই মন্দ হবে। ওরা যাই করুক, লোকে মনে রাখবে সেই হাসিখুশি ভাসিয়া ক্রাবচুক-এর কথা, যে গাঁয়ের সকলের চেয়ে ভাল গান গাইতে পারত। নিজের গ্রাম, নিজের দেশ, নিজের ভাষা এবং নিজের জাতির স্বাধীনতার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। ওই নদী যেখানে গিয়ে কত দিন ঘোড়ার গা ধুইয়ে এনেছে, সেই নদীর পাশে একটি খাদে সে আজ পড়ে আছে—তার জন্মভূমির কোলে। লোকের মনে ভাসিয়ার যে চেহারা আঁকা থাকবে, জার্মানরা কোন দিনই তা বিকৃত করতে পারবে না। বরং আরও এই কথা তাদের মনে থাকবে যে, জার্মানরা মৃত্যুর পরও ভাসিয়াকে একটু শান্তি দেয় নি; ওরা তার মৃত দেহকেও লাঞ্ছিত করেছে। শুধু মায়ের মনেই যে গাঁথা থাকবে তা-ই নয়, দেশের লোকও একথা ভুলবে না। এমন কি, পরে যারা জন্মাবে, যারা ওই জার্মান শয়তানদের গলাধাক্কা দিয়ে এদেশ থেকে দূর করবে, তাদের মনেও থাকবে ভাসিয়ার কথা। ওর দেহের যতটুকু রক্ত মাটিতে পড়েছে, যতদিন ধরে ওর উলঙ্গ মৃত দেহ ওই বরফে পড়ে আছে, জার্মানরা

যতবার সে দেহে পদাঘাত করেছে—তার এক শ গুণ প্রতিশোধ তারা নেবে।

ফেডোসিয়ার মনে হচ্ছিল, তাড়াতাড়ি রাত পোহালেই যেন ও বাঁচে। বলুক সে জার্মানটাকে, ওই কালো ইঁদুরটাকে। ধারালো দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে লাগাক সব কথা। দেরী করার দরকার কি? ওই কালো গোল গোল চোখ দিয়ে দেখুক যে, ফেডোসিয়া ক্রাবচুক-এর মুখ তাতে শুকিয়ে যাবে না, সে কাঁদবে না, হাঁটু গেড়ে কারো কাছে ভিক্ষাও চাইবে না। তার মৃত পুত্রের দেহ, যা তুষারে পাথর হয়ে গেছে, তার জন্যে কোন দিন ও হাত জোড় করে জার্মানদের কাছে বলবে না—ওগো, তোমরা আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিও না। ... ওই হতভাগী কেমন করে জানল, সেকথা গোপন করতে চায়। সেটাও যেন ওর একটা খেলার পুতুল, একটা মায়ের বুকের আশঙ্কা উদ্বেগ নিয়েও সে খেলা করে! কিন্তু ফেডোসিয়া তার সে খেলা ভেঙে দেবে। ছুঁড়ীটা ভুল করেছে, ফেডোসিয়ার চোখে সে কোন দিনই জল দেখতে পাবে না, ফেডোসিয়া তার কাছে কৃপাভিক্ষাও করবে না। জয় করবে বলে যে আশা করে সে বসে আছে, তার সে-আশায় ছাই পড়বে।

হৃদপিণ্ডে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হয়ে ফেডোসিয়ার মনটা যেন খুব সতেজ হয়ে উঠল। ও জানে, কেউ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ পারবে না ওকে কোন রকমে আঘাত দিতে। বিদ্বেষের দুর্ভেদ্য বর্ম ওকে সমস্ত আঘাত থেকে রক্ষা করবে।

বাড়ীর সামনে সান্ত্রীটা পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে জানলার নীল আভার উপর তার ছায়া পড়ে। পা দুটো বরফে হিম হয়ে আসছে বলে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে গরম ধরিয়ে নেবার নিষ্ফল চেষ্টা করে। পায়ের চাপে বরফগুলো মড়্ মড়্ করে ভাঙছে। ফেডোসিয়া মনে মনে হাসে।—'তুমি পাহারা দাও। তোমার উপরওয়ালা তার প্রণয়িনীকে নিয়ে গরম ধরিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাক। একটি কৃষকের বিছানা, তার আরামের লেপ দস্যুবৃত্তি করে কেড়ে নিয়ে সে ভোগ করছে। যতই পাহারা দাও, তাকে বাঁচাতে পারবে না; পাহারা

দেবার জন্যে বরফের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় শত লাফালাফি করেও কোন ফল হবে না। পা দুটো যদি জমেও যায়; এমন কি, বাইরে ছুটাছুটি করে যদি মরেও যাও, তবু পারবে না ওকে রক্ষা করতে। সে রাত্রি যখন আসবে তখন ওই গভীর নিদ্রা থেকে ওকে জাগিয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে তোমাদের পালাতে হবে। যাদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় নি, তুষারে অনাবৃত পড়ে আছে, তাদের চেয়েও বেশি দুঃখ তোমাদের ভোগ করতে হবে। ওই লেভোনিয়ুক—যার মৃত দেহ আজ এক মাস ধরে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তার ভাগ্যের উপরও সেদিন তোমাদের ঈর্ষা হবে। হাঁ, আসবে, সে রাত্রি আসবে—যেদিন সেনানায়কের ওই রক্ষিতাও ওলেনা কস্টিয়ুকের ভাগ্যকে ঈর্ষা করবে।

ফেডোসিয়ার মনে আবার প্রশ্ন আলোড়িত হয়ে উঠল: ওলেনাকে কে ধরিয়ে দিলে? সে ত চুপি চুপি এসে নিজের বাড়ীতেই ছিল। জার্মানরা ত গ্রামের সমস্ত মেয়েদের গণনা করে রাখে নি, সে সময়ও তাদের ছিল না। ওলেনা চুপচাপ বাড়ীতেই বসে ছিল, একবারও বাইরে বেরোয় নি, তবুও দুদিন যেতে না যেতেই ওরা এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে জেরা করতে লাগল। কেউ নিশ্চয়ই তার কথা বলে দিয়েছে: তার মানে, গ্রামে কেউ টিকটিকি আছে। ওলেনার কথাও যেমন বলে দিয়েছে, ভাসিয়ার কথাও তেমনি পেলাগিয়ার কাছে লাগিয়েছে। কোন শত্রু কোথাও গুপ্তভাবে আছেই, এমন গা-ঢাকা দিয়ে আছে যে গ্রামের লোক টেরও পায় না। এমন কি, অনুমানও করতে পারে না যে সে গুপ্ত শত্রুটি কে। অথচ সে শত্রু সবই দেখছে, এবং সবই জানে। প্রত্যেকটি খবর সে ওদের কাছে পৌঁছে দেয়। স্থানীয় কোন লোক, যে ভাসিয়াকে চিনত, ওলেনাকে চেনে এবং গ্রামের প্রত্যেকটি লোককেই জানে। কে হতে পারে?

ওলেনা গ্রামে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেডোসিয়া অবশ্য জানতে পেরেছিল। অন্য লোকেরাও জেনেছিল; কিন্তু তারা সবাই আপনার লোক, এক গ্রামবাসী—প্রতিবেশী, একই সঙ্গে মিলে চাষআবাদ করে। ভীষণ তুষারাচ্ছন্ন দিনে রাত্রিতে যারা দেশের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গ্রামবাসীরা ত তাদেরই বাপ-

মা ! তা হলে কে সেই বিষধর সর্প ? মাতৃভূমির সোনালী ফসলে দেহ পরিপুষ্ট করে আজ তারই অন্তরে বিষ দাঁত বসাচ্ছে !

দূরে কাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তুষারাচ্ছন্ন রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই অস্পষ্ট শব্দ যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোলাহল, আর সেই সঙ্গে কার কান্নার শব্দ ! বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ফেডোসিয়া ছুটে জানলার কাছে গেল। জানলার উপর থেকে খানিকটা ঘন তুষার সরিয়ে ফেলে বাইরে তাকাতে চেষ্টা করল। জানলার গায়ে চোখ লাগিয়ে রাস্তার সব কিছু দেখা যায়। কাচের শার্শি তুষারে ঝাপসা হয়ে আসছিল। ফেডোসিয়া শার্শির গায়ে বার বার গরম নিশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে মুছে দেখবার মত একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিচ্ছিল। রাস্তার কতকটা অংশ দেখা যায় : ও দিকের ময়দান থেকে সোভিয়েট দফতর-বাড়ী পর্যন্ত। ঐই বাড়ীটাতেই আগে গ্রাম্য সোভিয়েটের দফতর ছিল। তার ওপাশে অন্ধকারে একটি বড় চালাঘরের অস্পষ্ট সীমারেখা দেখা যাচ্ছে।

দিনের মতই পরিষ্কার রাত্রি। চাঁদের আলোয় পৃথিবীটাকে যেন জমাটবাঁধা নীল বরফস্তূপের মত দেখাচ্ছে। ফেডোসিয়া পরিষ্কার দেখতে পেল : একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক ময়দান থেকে ছুটে রাস্তা দিয়ে চলেছে। না, ছুটে যায় নি—সামনের দিকে ঝুঁকে খুব কষ্টের সঙ্গে সে ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, এক একটি পায়ে এক একবার ভর দিয়ে সে চলেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় তার অতিবৃহৎ পেটটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার পিছনে একজন সৈনিক। সৈনিকের রাইফেলের ডগায় বেয়নেট ঝক ঝক করছে। স্ত্রীলোকটি মুহূর্তের জন্যে একটু থামলেই বেয়নেটের খোঁচা এসে লাগে তার পিঠে। সৈনিকটা কী যেন বলছে, তার সঙ্গে আর দুটো সৈনিকও চেঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্ভবতী স্ত্রীলোকটিও আবার সামনের দিকে ঝুঁকে এগিয়ে চলে, যেন ছুটতে চায়। পঞ্চাশ গজ সামনে গিয়েই সৈনিক অপরাধীকে আবার ঘুরিয়ে চলতে বাধ্য করছে। আবার পঞ্চাশ গজ পিছনে ছুটতে হচ্ছে, বার বার এরকম চলছে। অত্যাচারীরা হাসি-ঠাট্টায় ভেঙ্গে পড়চে, তাদের সে বর্বরতার আওয়াজ কুটীরেও গিয়ে পৌঁচচ্ছে।

ফেডোসিয়া জোরে জানলার কাঠ দুটো ধরে আছে, কিন্তু তার দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিতই রয়েছে। তা হলে রাত্রি বেলায় ওখানে এই চলেছে, আর সেনানায়ক তখন দিব্য আরামে তার রক্ষিতাকে পাশে নিয়ে নাক ডাকাচ্ছে! সৈনিকেরা তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে, আর তাই সে শান্তিতে ঘুমোতে পারছে।

হাঁ, সে-ই ত, ওলেনা কস্টিয়ুকই ত বটে। অনেক দিন আগে তারা উভয়েই জমিদারের চাষে একসঙ্গে কাজ করেছে। পেয়াদার চাবুকের ভয়ে উভয়েই সন্ত্রস্ত থাকত এবং তাকে আসতে দেখলে তাদের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হয়ে উঠত। উভয়েই একসঙ্গে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্যে কত কেঁদেছে—চাষী মেয়েদের সে ছিল এক পরম দুর্ভাগ্যের দিন।

তারপর তারা একসঙ্গে সমবায়-চাষে কাজ করেছে, ভাল ফসল হলে, বা গরুর দুধ বেশি হলে তাই নিয়ে তারা উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে, তারা একসঙ্গে নব জীবনকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে, জীবন তাদের কাছে বছরের পর বছর পরম রমণীয় হয়েই দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এখন ওলেনা কস্টিয়ুকের জীবনে পরম দুর্ভাগ্য এসে তাকে পর্যুদস্ত করেছে। সামনে পঞ্চাশ, পিছনে পঞ্চাশ গজ—সম্পূর্ণ উলঙ্গ, খালি পা, বরফের মধ্যে তাকে হাঁটাহাঁটি করতে হচ্ছে, অথচ দু-এক দিনের মধ্যেই তাকে আঁতুড় ঘরে ঢুকতে হবে। সৈনিকদের অশ্লীল রসিকতা এবং পিঠে বেয়নেটের খোঁচা।

ফেডোসিয়ার চোখ দুটি শুকনো, সে কাঁদছে না। তার অন্তরে দেহের সমস্ত রক্ত ফুটতে থাকে, পরে সেই রক্ত ঘন কালো রং-এ রূপান্তরিত হয়। তারা যতক্ষণ এখানে আছে ততক্ষণ এরকমটাই হবে, এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। এদের নিয়ে কতটা কি করতে পারে, তারা যেন সেইটাই দেখাবে বলে সঙ্কল্প করে বসেছে। তাদের নিষ্ঠুর বর্বরতার যে কোন সীমা নেই, এইটাই যেন তারা প্রমাণ করতে যায়। ফেডোসিয়া ওলেনার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু তার প্রাণে সহানুভূতি জাগল না। না, সেখানে দাক্ষিণ্যের কোন স্থান নেই। ফেডোসিয়ার মনে হল যে, সৈনিকদের হাতে নির্যাতিতা ওই উলঙ্গ স্ত্রীলোক—

যাকে খালি পায়ে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে সে আর কেউ নয়, ফেডোসিয়া নিজে। জমাট বরফে তার পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে এবং বেয়নেটের খোঁচা এসে তার পিঠে পড়ছে। ও ওলেনা কস্টিয়ুক নয়, সমগ্র গ্রামটাই যেন সৈনিকদের বিদ্রূপের ঘায়ে বরফের উপর দিয়ে ছুটাছুটি করছে। ও ওলেনা কস্টিয়ুক নয়, সারা গ্রামটাই বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলের বাঁটের আঘাতে আবার সে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওই যে জমাট বরফের উপর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, ও ওলেনা কস্টিয়ুকের পায়ের রক্ত নয়, ও হচ্ছে জার্মানদের আঘাতে সমগ্র গ্রামের রক্তপ্রবাহ, জার্মান দস্যুদের নির্মম অত্যাচারের ফল।

কাচের সে স্বচ্ছ ফাঁকটুকু দিয়ে ফেডোসিয়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। হাঁ, এই ত হবে। জার্মান সৈনিকেরা নির্মম হাতে সঙীন উঁচিয়ে কৃষকদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, তারা কী। শুধু যে তাই, তা নয়, লোকদের তারা এ-কথাও বুঝিয়ে দিচ্ছে, সোভিয়েটের শক্তি কতটুকু। ফেডোসিয়া বেশ বুঝতে পারছিল যে, যে সকল গ্রামে অন্তত এক দিনের জন্যও জার্মানরা রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছে কিংবা চোখের জলে লোকের বুক ভাসিয়েছে সেই সব গ্রামে বংশ-পরম্পরাক্রমে কস্মিন-কালেও কেউ কোন দিন সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব পোষণ করবে না, বা তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে কর্তব্যে কোন অবহেলা করবে না। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে পুরানো ও নতুন যত রকমের আলোচনা হয়েছে সবই ফেডোসিয়ার মনে পড়ছিল। আজ যেন প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর নিজেদের জীবন থেকেই পাওয়া যায়। জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকেই পেল তারা চরম শিক্ষা।

আর একবার ওলেনা পড়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠলও। এত শক্তি সে পেল কোথায়? ফেডোসিয়া তা জানে, বিশ্বাস করে যে, ওলেনার প্রাণে যে বিদ্বেষের রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তাই এখন টগবগ করে ফুটছে—আর তাকে শক্তি জোগাচ্ছে।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর জানলার শার্শির পিছনে দাঁড়িয়ে গরম নিশ্বাসে ছোট্ট একটুকু ফাঁক তুষারমুক্ত করে নিয়ে সকলেই সে দৃশ্য দেখছিল। ওলেনার

সঙ্গে সঙ্গে তারাও সে নির্যাতন যেন ভোগ করছিল, তারাও যেন অমনি করে বরফের উপর দিয়ে ছুটছে, ওলেনার সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ছে মাটীতে, ওই সঙীনের খোঁচা যেন তাদেরও গায়ে বিঁধছে, আর সেই সঙ্গে কানের ভিতর ধ্বনিত হয়ে উঠছে জার্মান সৈনিকের অসহ্য বর্বর অট্টহাসি।

গ্রামের সকলের দৃষ্টি যে তার উপরেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, ওলেনা সেটা বেশ বুঝতে পারছিল। এ তারই গ্রাম, যেখানে সে দুঃখ-দৈন্যের ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠেছে, তারপর জীবনে এসেছে সুখের দিন, আপন হাতে গড়ে তুলেছিল আনন্দময় সোনার সংসার। বরফের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পা দুটো রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, সমস্ত দেহটা কন্‌কন্ করে, কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ করে। আবার সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সৈনিকেরা বন্দুকের গুঁতো দেয়, সে আঘাত সে গ্রাহ্য করে না। তবুও উঠে দাঁড়ায়। সৈনিকদের বুটের তলায় সে কিছুতেই ওই রাস্তার উপর শুয়ে থাকবে না। ওর উপর উৎপীড়ন করে ওকে জব্দ করে সৈনিকেরা যে আনন্দ পেতে চায়, মরে গেলেও ও সে আত্মপ্রসাদ তাদের পেতে দেবে না। বস্তুত, তখন তার কোন অনুভূতিই যেন আর ছিল না। সর্বাঙ্গ বয়ে রক্ত ঝরছিল, কখনও পড়ে যাচ্ছিল, তখনও কায়ক্লেশে শরীরটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন ওলেনা নিজেই ছিল না ওর দেহে। একটা বিকারের ঘোরে রাস্তার উপর সৈনিকদের সঙ্গে সে ছুটাছুটি করছিল। কানের মধ্যে গুন গুন করে যেন কুর্লির সেই আনন্দময় সম্বোধন—"মা!" গাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে আসে সেই ডাক। গাছের ডালপালাগুলিকে নাড়া দিয়ে শন্ শন্ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, ছাউনির খুঁটিগুলি মড় মড় করে; তারপর ওলেনা দেখতে পেল সাঁকোর কড়ি কাঠগুলোর ভিতর দিয়ে আগুনের শিখা উঠছে। আগুনের সে সর্বগ্রাসী জিভ যেন দেখতে দেখতে লক্ লক্ করে সমস্ত সাঁকোটাকে গ্রাস করে ফেলল,—সশব্দে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওলেনা দেখল—ওর স্বামী মিকোলা যুদ্ধে চলে যাচ্ছে, রাস্তার মোড় ফিরবার সময় হাত তুলে সে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেল।

ওলেনা আবার পড়ে গেল। এবার খুব কষ্টের সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়াল।

"জলদি!" পিছনের সৈনিকটা চীৎকার করে উঠল।

"পেটে একটা গুতো দাও, তা হলে আপনিই চাঙা হয়ে উঠবে।" পাশ থেকে আর একটা জার্মান পরামর্শ দেয়।

"না, ছেলে বেরিয়ে যেতে পারে।" উচ্চহাসির সঙ্গে প্রথম সৈনিকটা আর একবার সঙীনের খোঁচা মারল। "এখনও ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় নি। কথা বলাতে হবে।"

"চিন্তা করো না, ক্যাপ্টেন যা জানতে চায় তা সে বের করে নেবেই, এমন কি, ওর আঁত শুদ্ধ টেনে বের করবে।"

"ঠিক!—এই, চল্-বে চল্।" প্রথম সৈনিক আবার চেঁচিয়ে উঠল।

বেয়নেটের আর একটা খোঁচা দিতেই ওলেনার পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

"জল্‌দি কর, জল্‌দি কর! কোথায় এসেছ ভাবছ তুমি,—এ কি প্রণয়ীর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছ?"

ওরা বলছিল স্ত্রীলোকটি হয় ত তার একবর্ণও বোঝে না। কিন্তু ওদের তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই নাই। কতগুলো অকথ্য গালাগালি করেই ওদের আনন্দ। সৈনিকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তাদের রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। কোথায় নিশ্চিন্তে বালিসে মাথা দিয়ে ঘুমোবে, তা না হয়ে এই হতভাগীকে নিয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে তাদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নিজেদের সেই রাত্রি জাগরণ ও দুর্ভোগের আক্রোশটা গিয়ে পড়ছে ওলেনার উপর।

সে রাত্রে যেন অস্বাভাবিক রকম প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল। মাটী থেকে আকাশের চাঁদ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীটা যেন তুষারে জমাট বেঁধে আসছিল। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় রামধনুর সেই বর্ণচ্ছটা ধুয়ে গিয়েছিল; শুধু একটা অস্পষ্ট রেখা আকাশের গায়ে আঁকা ছিল। চাঁদের দুই দিকে দুটি উজ্জল স্তম্ভ দেখা যাচ্ছিল। দিকচক্রের দু পাশ থেকে স্তম্ভ দুটি উঠে চাঁদের সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে—ঠিক যেন একটি বিজয়-তোরণ। আকাশ থেকে স্তম্ভ দুটি নেমে এসে যেখানে মাটীতে ঠেকেছে সেখানে ঝলমল করে রূপালী তুষার।

"চল্-বে, চল্," জার্মান সৈনিকেরা চীৎকার করে ওঠে। রাত্রির গভীরতা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করছিল। মন থেকে ভয়টা কাটিয়ে ফেলবার জন্যে মাঝে মাঝে এই ভাবে অস্বাভাবিক চীৎকার করে সেই নিশুতি রাত্রিতে নিজেদের প্রকৃতিস্থ রাখবার চেষ্টা করছিল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোকে চারি দিক প্লাবিত হয়ে আছে। এমন আলো তারা জীবনে কখনও দেখেনি। জ্যোৎস্নায় বরফের স্তূপ যে এমন অপূর্ব নীলাভ রূপ ধারণ করে সে কথা তারা কোন দিন ভাবতেও পারে নি। পায়ের তলায় মড় মড় করে ভাঙে বরফের ডেলা। এমন ভীষণ তুষারপাতের কথা তারা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। রাস্তার দু পাশে বাড়ীগুলি নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও জনমানব নেই, শুধু যে-সব কুটীরের তুষারাচ্ছন্ন জানলা থেকে দৃষ্টি এসে পথের ওপর পড়েছে সেই সব জানলায় জ্বল্ জ্বল্ করে কতকগুলো জীবন্ত চোখ। বাড়ীগুলির ঘন কালো ছায়ার ভিতর থেকে সেই উজ্জ্বল চোখগুলি যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি হলে জার্মানরা মোটেই পথে বেরুতে সাহস করত না। কারণ তারা জানে প্রতিটি গৃহের কোণে, প্রতিটি ঝোপের অন্তরালে বিদ্যুতের মত ক্ষীপ্র গতি নিয়ে মৃত্যু তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এমন কি, একবার 'মা' বলবার সুযোগও দেবে না। আজ এত জ্যোৎস্নার আলোতে লুকিয়ে আক্রমণ করবার সুযোগ কেউ পাবে না, তবুও ভয়ে তাদের বুকের ভিতরটা থেকে থেকে আঁতকে উঠছিল। হঠাৎ এক একবার চারি দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিল অন্ধকার ছায়ার আড়ালে কোথাও কিছু আছে কি না। পরক্ষণে আবার একটু সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে খুব জোরে চীৎকার করে উঠছিল। তুষারে তাদের গাল কন্ কন্ করছিল, ঠোঁটের উপর বরফের সর জমে আসছিল। তাই মাঝে মাঝে কান মুখ বেশ করে ঘষে নিয়ে দ্রুত গতিতে গ্রামের পথ ধরে মেয়েটিকে একবার সামনের দিকে আর একবার পিছনের দিকে হাঁটাচ্ছিল।

অবশেষে সে আনন্দেও তাদের বিরক্তি ধরে গেল। সত্যিই বিরক্তিকর: এবারে ওলেনা খুব ঘন ঘন হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল এবং মাটি থেকে উঠতেও বেশি সময় লাগল। কিন্তু তবু সে কাঁদল না বা চেঁচিয়ে উঠল না। ক্যাপ্টেনের

সঙ্গে দেখা করে স্বীকারোক্তিরও কোন আভাষ দিল না। অথচ তুষারপাত ক্রমেই আরো ভীষণ হয়ে দেখা দিল, ফলে যে নির্মমভাবে কেবল তাদের গাল হাত ও পাগুলোকেই দংশন করছিল, তাই নয়, তাদের মনে হল যে, ফুসফুসের স্পন্দনও বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের চোখে অশ্রুধারা বইতে লাগল এবং সারা দেহে এমন একটা কাঁপুনি এল যে, কোন মতেই তা থামতে চায় না।

"চল্, চল্, এবারে জোর পায়ে ঘরে চল্!"

মানুষ যেমন করে গৃহপালিত পশুকে হেই হেই করে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তারাও ওলেনাকে তেমনি করে নিয়ে চলল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার সামনে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে ভর দিয়ে পেটটাকে কোন মতে বাঁচাল। কপালের দু পাশের রগ দুটো দপ্ দপ্ করছিল এবং হৃদ্‌পিণ্ডটা ভীষণ-ভাবে একটা জ্বালা করছিল। কয়েক মিনিটেই তুষারের নির্মম আক্রমণে সে যেন পিষে যাচ্ছিল। এর আগে সে পিঠে বেদনা অনুভব করে নি, কিন্তু এখন অসহ্যরকমে জ্বালা করতে লাগল। অমানুষিক চেষ্টা করে উঠে বসল এবং কাঁধ, পা ও পাঁজরে অবশ-প্রায় হাত দিয়ে রগড়াতে লাগল। দেয়ালের ফুটো দিয়ে ক্ষীণ চন্দ্রালোকও এসে মেঝের উপর পড়েছে। ঘরের এক কোণে এক আঁটি খড় ছিল। নিজেকে কোন প্রকারে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেললে এবং সেই খড়ের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

"আমি জমে যাব," আপন মনে কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে যেন কতকটা সোয়াস্তি বোধ করল।

তার ভেড়ার ছালের কোটটি ও শালখানা জার্মান সেনানায়কের ঘরে টুলের উপর রয়ে গেছে। রাত্রি বেশি, সৈনিকেরা তাকে বাইরে খেদিয়ে আনার পূর্বেই তারা তার দেহের শেষ বস্ত্রখানাও খুলে নিয়েছিল, গায়ে কিছুই ছিল না।

"হয় ত তারা ভুলে গেছে, হয় ত এ চালাঘরেই আমার সে কাগড়গুলি রেখে গেছে।" আপন মনে একথা ভেবে সে একবার চারি দিকে তাকিয়ে দেখল। না, তারা কিছুই রেখে যায় নি। খালি মেঝেটা, এই তুচ্ছ খড়ের আঁটিই এখন তার একমাত্র অবলম্বন।

বাইরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হয় ত সৈনিকেরা মনে করেছে যে ওকে পাহারা দেবার জন্যে রক্ষীর প্রয়োজন নেই—তাই তারা দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেছে। ওর সর্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। ও ঘুমোতে পারছিল না, ঘুমোতেও ওর ভয় হচ্ছিল। দৃষ্টি প্রসারিত করে ক্ষীণ চন্দ্ররশ্মির দিকে তাকিয়ে ছিল—চন্দ্ররশ্মি ধীরে ধীরে মেঝের উপর নড়াচড়া করছে।

হঠাৎ সে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেল। কান খাড়া করল। বরফ গুঁড়ো হওয়ার শব্দ বটে, তবে সান্ত্রীর পায়ের চাপে যে রকম শব্দ হয়, সে রকম নয়। কে যেন খুব ধীর সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে। বরফ ভাঙার ক্ষীণ শব্দ, পর মুহূর্তে আবার সব নিস্তব্ধ, আবার বরফ ভাঙার শব্দ শোনা গেল। কেউ হয় ত হামাগুড়ি দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। ওলেনা ভয় পেয়ে গেল। কে এ? কে হতে পারে?

শব্দটা থেমে গেল। এ নিশ্চয়ই তার কল্পনা। কিন্তু আবার সেই মড়্ মড়্ শব্দ। না, নিশ্চয়ই কেউ যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে রইল। শব্দটা ক্রমেই নিকটতর হল। খামার-বাড়ীর পিছন দিক থেকে আসছে, দরজাটার শেষে প্রান্তের দিকে। পদশব্দ কখন মোড় ফিরবে? সে আপন মনেই নিজেকে প্রশ্ন করল। কিন্তু পদশব্দটা সোজা এগিয়ে আসছে। পদক্ষেপও যেন মন্থরতর হয়ে এল, আরও যেন সতর্ক এবং অবশেষে শব্দ এসে থামল খামারবাড়ীর দেয়ালের গায়ে। ওলেনা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কেউ হয় ত দেয়ালের ও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন শ্বাস-প্রশ্বাসও শুনতে পাচ্ছে, তারপর কে একজন ফাটল দিয়ে উঁকি মারল।

ওলেনা অপেক্ষা করল। এ কে? শত্রু, মিত্র, না, কোন পথিক? কিন্তু যে গ্রামে সন্ধ্যার পর কাউকে বাইরে পেলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয় সেখানে এত রাত্রিতে কে পথিক আসবে?

"মাসি!" শিশুর কণ্ঠের ফিস্ ফিসানি শোনা গেল।

ওলেনা নড়ল না। সাড়া দিতে চাইল, কিন্তু অস্পষ্ট কাতরানি ছাড়া কিছুই বার হল না।

"ওলেনা মাসি !"

কোন প্রতিবেশীর ছেলে হয় ত না বলে চুপি চুপি খামার-বাড়ীতে এসে তাকে ডাকছে। সে আবার কাত্‌রে উঠ্‌ল।

"ওলেনা মাসি, তোমার জন্য একটু রুটি এনেছি।"

রুটি! দু দিন ধরে সে কিছুই খেতে পায় নি। এক টুক্‌রো রুটি বা এক চুমুক জলও সে পায় নি। ক্ষুধা তার বড় একটা ছিল না, তবে জল তেষ্টা ছিল। ভের্নের যখন তাকে সওয়াল-জবাব করছিল, তখনই তার তেষ্টা পেয়েছিল, তারপর আবার তেষ্টা পায় তখন যখন তাকে এই ঘরে তালাবদ্ধ করা হয়। সৈনিকেরা যখন তাকে সে রাত্রিতে খেদিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন সে বার কয়েক বরফের টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরেছিল। বরফ খেয়ে সে খানিকটা তাজা হয়েছিল, শুষ্ক তালু আর্দ্র হয়েছিল। কিন্তু সৈনিকেরা তাকে বামাল ধরে ফেলে। তাই সে যত বার পড়ে গিয়েছিল ততবারই জিভ দিয়ে বরফ চেটে নিয়েছে। এখন সে অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করছে।

ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে সে স্থান থেকে সে কত দূর আছে, মনে মনে হিসাব করে সে শক্তি সংগ্রহ করল।

"যাই বাবা," মাটীর ঠাণ্ডা মেঝের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সে চুপি চুপি বলল। তার মনে হচ্ছিল যে, সে আর উঠতে পারছে না, তাই কনুইয়ে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে সে এগিয়ে চলল।

হামাগুড়ি দিয়ে সে এক-পা এগিয়েছে, মাত্র মূহূর্তকাল—এমন সময় হঠাৎ কানে তালা লাগলো, বিস্ফোরণের শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল! ওলেনা লম্বা হয়ে পড়ে গেল। মুহূর্ত বাদেই সে বুঝতে পারল গুলীর শব্দ—খুব কাছেই। সে সেখানেই অনড় অবস্থায় হাঁ করে পড়ে রইল। দেয়ালের বাইরে নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। বরফের উপর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, সঙ্গেই জার্মানটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে কি একটা নরম জিনিসকে গুঁতো দিতে দিতে গালাগালি দিচ্ছিল। আর একজন কে এল; এখন দু জনে মিলে চেঁচামিচি ও গালাগালি চালাল। ওলেনা

আরও শব্দ শোনার জন্যে প্রস্তুত হল। গুলী যে ঠিক জায়গায় আঘাত হেনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই দু দিন তার প্রতি যে সব লাঞ্ছনা উৎপীড়ন চলেছে, হঠাৎ এই মুহূর্তে যেন তা অনুভব করল, সে যা সহ্য করেছে তা রক্তমাংসের দেহধারীর পক্ষেও সম্ভব নয়, এখন আর সে সইতে পারল না। তার মনে হতে লাগল যে, ধরিত্রী যেন দুলছে, মেঝেটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। সে জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে পড়ল।

গুলী ও চীৎকারের শব্দ কিছুটা দূরেও শোনা গেল। সামনের কুঁড়ে থেকে আরও স্পষ্ট শোনা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিন জোড়া চোখ জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে খামার-বাড়ীর দিকে তাকাল।

ছোট্ট জিনা কাঁদতে শুরু করল :

"মা, মিশ্‌কা! মা, মিশ্‌কা!"

মা তার হাতখানায় এত জোরে মোচড় দিল যে ব্যথা পেয়ে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

"চুপ!"

"মা, মিশ্‌কা! তারা কী করেছে? মা!"

"তুমি শুনতে পাও নি? তারা আমাদের মিশ্‌কাকে খুন করেছে!" স্ত্রীলোকটি শ্রান্ত কণ্ঠে বললে।

আট-বছর বয়স্ক সাশা জানলা থেকে ফিরে এল।

"মা, আমি ওলেনা মাসিকে খানিকটা রুটি দিয়ে আসি!"

"না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। এখন তারা চারি দিকে নজর রাখবে, ভোর পর্যন্ত তারা সজাগ থাকবেই," কঠিন স্বরে সে বলল। মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বললে :

"আর তা ছাড়া, ঘরে আর রুটিও নেই, একটুকুও না। যেটুকু ছিল, মিশ্‌কাই নিয়ে গিয়েছে।"

ছেলেটি আবার ফিরে জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কিন্তু সেখান থেকে কিছুই দেখা গেল না।

চালাটার পাশেই মিশ কা পড়ে ছিল। গুলি তার পিঠে, কাঁধের ঠিক নিচেই বিঁধেছিল। কাঁদবার সময়ও সে পায় নি। একটা সৈনিক ছোট্ট দেহটার উপর লাথি মারতেই হাতের মুঠো থেকে একটুকরো রুটি পড়ে গেল।

"শূয়োরের বাচ্চা, আবার ওই মাগীটার জন্যে রুটি এনেছে," সৈনিকটা বললে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার মৃত দেহটাকে পদাঘাত করল। "ও মাগীটাকে এরা খাওয়াতে চেয়েছিল, বুঝেছ? …"

"ও কেমনি করে এল …"

"আর একটু হলে সে দিয়ে ফেলেছিল। … আমরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই কি একটা ছোট্ট বস্তু নড়ছে—আমার নজরে পড়ল—ঠিক দেয়ালের গা ঘেঁষে। আমি তাক্ করলেম। …"

"খাসা তাক," সঙ্গী সৈনিক তার প্রশংসা করল। বাড়ীর তৈরী সূতোর জামা ভিজে রক্ত বেরিয়ে পড়ছে।

"বাজী রাখো! আমার চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ! কিন্তু একে নিয়ে এখন কী করা যায়? এখানেই ফেলে রাখব?"

"এখানে কেন, খাদের মধ্যে ফেলে দিলেই চলবে।"

প্রস্তাবটায় তাদের উভয়েই খুশি হল। ছেলেটার পা দুটো ধরে তারা তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। বরফ পড়ে জায়গাটা উঁচু নিচু হয়েছে, তার উপর মাথাটা বারবার ঠোক্কর খেতে লাগল! সৈনিকেরা দেহকে ছুঁড়ে রাস্তার ধারে বরফাচ্ছন্ন খাদের মধ্যে ফেলে দিল।

"ওখানে ও শুয়ে থাকুক। আমি অবাক হই, ছেলেটা এল কোথা দিয়ে?"

"ক্যাপ্টেন কাল দেখতে পাবে ত। যদিও এখানে তুমি অনেক কিছুই দেখতে পাও। … গোটা দলটাই একগাঁট্টা হয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে থাকবে।"

"ভেবো না, আমাদের ক্যাপ্টেন তাদের জিভকে নাড়িয়ে ছাড়বে!"

"সে রকমটা করবার সময় হয়েছে। এখানেই সব চেয়ে ভীষণ—বলে দিচ্ছি।"

লম্বা সৈনিকটা তার রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীর দিকে সাগ্রহে তাকাল। আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহ করবার মত সেই গোল মুখ ও থ্যাবড়া নাকে কিছুই সে দেখতে পেল না। তাই বলে চলল ঃ

"ভীষণ। ... আমার আর এখানে একমুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না, বাড়ী যাওয়ার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। আগামী বসন্তে আমার মিচ্যেলের বয়স দশ বছর হবে। দু বছর তাকে দেখি নি—ভেবে দেখো, দু'বছর। ..."

সঙ্গী সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়ল।

"শরতে আমি ছুটি পেয়েছিলাম।"

"আসবার সময় তাকে বলে এসেছিলাম যে, তার জন্যে একটা বাই-সাইকেল কিনে নিয়ে যাব। সেই বাইকের জন্যে ছেলেটা দুটো বছর ধরে প্রতীক্ষা করছে। এখান থেকে পাঠানো মুশ্‌কিল।"

"সার্জেণ্ট কিন্তু দুখানা পাঠিয়েছেন।"

"সার্জেণ্ট ..." লম্বা সৈনিক আস্তে আস্তে বললে, "সে হচ্ছে সার্জেণ্ট, কিন্তু তুমি কি মনে করো তারা আমাকে বাইক পাঠাতে দেবে? তুমি নিজেই ত তা ভাল করে জান। পার্শেল হলে অবশ্য কোন কথা ছিল না, কিন্তু বাই-সাইকেল— না, তারা পাঠাতে দেবে না।"

যে বাড়ীতে ভের্নেরের দফ্‌তর সে বাড়ীর সামনে তারা পায়চারি করছে। জানলায় একটা আলো জ্বলছে। আপিসে তখন কাজ চলছে।

"ক'টা বাজল? মনে হয় আমাদের বদলির সময় হয়ে এসেছে।"

"তা হলেও আধ ঘণ্টা এখনো দেরী।"

শীতটা জেঁকে এল। লম্বা সৈনিকটার সামরিক টুপির নীচেই একখানা গরম আলোয়ান জড়ানো থাকায় তার কিছুটা গরম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু আর একজন—বেঁটে লোকটি, দু হাতে নিজের কান রগড়াতে শুরু করে দিল।

"এখানে লোকেরা থাকে কেমন করে? এরকম তুষার কি তারা সব সময়েই ভোগ করে?"

"কেমন করে জানব? মনে ত হয়, তাই। ··· ওরা বর্বর, ওদের কিছু আসে যায় না!"

"রামধনুটা দেখেছ?"

"হাঁ, দেখেছি।"

"এতে কি মনে হয়?"

লম্বা লোকটা তার কাঁধ ঝাঁকাল।

"কি আর মনে হবে! আমার মনে হয়, এখানে শীত কালেও রামধনু দেখা যায়। কিন্তু আজকের স্তম্ভ দুটির তুলনা হয় না!"

"তুষারের মধ্যে উঠেছে বলেই ওরকমটা দেখাচ্ছে।"

"অবশ্য, রামধনু তুষারের মধ্যেই দেখতে ভাল।"

"হয় ত তাই," বেঁটে জার্মানটি সঙ্গীর কথা মেনে নিল, নিশ্বাসের উত্তাপে হাত গরম করে নিয়ে চারিদিকে অস্বস্তিকরভাবে তাকাতে লাগল।

"ও কি দেখছ?"

"কিছুই না, শুধু দেখছিলাম মাত্র।"

মিনিটখানেক পর লম্বা লোকটিও চারিদিক তাকাল এবং রেগে গিয়ে আপন মনেই নিজেকে গালাগালি দিতে লাগল। অভিজ্ঞতা থেকে এটা তার জানা ছিল যে, একবার যদি সে চারিদিকে তাকায় তা হলে তার হয়ে গেল— বার বার সে কেবল চারিদিক তাকাতেই থাকবে, ফলে, ক্রমেই সে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে।

"অমন করে চারিদিকে তাকিও না। কিছুই ত নেই কোথাও।"

"কিন্তু তুমি ত সারাক্ষণ ওই দিকেই তাকাচ্ছ।"

"আমার সব সময়েই মনে হয়, রাস্তা দিয়ে কে যেন আসছে। সেদিকে তাকালে কিন্তু আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। বার বার মনে হয় কে যেন আসছে।"

ওরা মনে মনে স্থির করল যে, বাড়ীটার সামনে দিয়ে আরও কয়েক পা বেশি যাতায়াত করবে!

দরজাটা খুলে গেল, তারা যেন তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

"কে গুলি করেছে?" সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করল।

"আমি," সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে লম্বা সৈনিকটি বলল। "ওরা কয়েদীকে রুটি দিতে চেষ্টা করেছিল।"

"তারপর? তারপর কি হল, রাশ্‌ক্য!" সার্জেণ্ট খবরটায় যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

"আমার তাক্ ঠিক লেগেছে; কে এক ছোকরা, মনে হয়, ওর কোন প্রতিবেশী পাঠিয়েছিল।"

"ছেলেটা কোথায়?"

"আমরা খাদের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছি।"

"চল ত একবার দেখে আসি।"

তারা তিন জনে সেই খাদের কাছে ফিরে গেল।

"ঠিক এই খানে," হাত দিয়ে দেখিয়ে রাশ্‌ক্য বলল।

সার্জেণ্ট নীচু হয়ে দেখল।

"কই, এখানে ত কিছু নেই।"

"কিছু নেই—মানে?" ভয়বিহ্বল সৈনিক বলে উঠল।

"ফ্রান্‌ৎস, এইখানেই না আমরা তাকে ফেলে গেছি, তাই না?"

তারা লাফ দিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে সোজা হেঁটে চলল।

"অত দূর কেন যাচ্ছ? আমরা ত অতদূর যাই নি।"

সার্জেণ্ট তাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

"দেখো, এ সব কি হচ্ছে?"

"হের্ সার্জেণ্ট, আমি শপথ করে বলছি, আমার সাক্ষীও আছে, ঠিক এখান থেকে আমরা ছেলেটাকে ছুঁড়ে ফেলেছি; এই দেখুন!" বরফের উপর একজায়গায় খানিকটা রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সার্জেণ্ট কাছে গিয়ে জায়গাটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল।

"খানায় নেমে পা দিয়ে বরফের উপরকার সব চিহ্নই নষ্ট করে ফেলেছ। ... বাঃ, কি চমৎকার পাহারাই না তোমরা দিয়েছ! নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোমাদের চোখের উপরই দেহটাকে টেনে নিয়ে গেছে। অবশ্য এখানে কোন দেহ ছিল, এ কথা যদি সত্যি হয়।"

"নিশ্চয়ই ওখানে ছিল, কেন, আমার সাক্ষীও আছে। ... আমরা দু জনে তার পায়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিলাম। ..."

"হয় ত সে তখনও বেঁচে ছিল, তোমরা আস্ত নিরেট, তাই সে উঠে পালিয়েছে!"

"না, না, গুলিটা ঠিক তার পিঠে লেগে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ..."

সার্জেণ্ট চালা-ঘরে আবার ফিরে গেল। বরফের উপর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্তের দাগ দেখা গেল এবং তারই একপাশে একটুকরো কালো রুটি পড়ে আছে। সদ্য জমাট-বাঁধা বরফের উপর একটি শিশুর পায়ের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে আর কারুর পায়ের দাগ পড়েনি।

"এই সেই জায়গা ... তারপর আমরা তাকে খাদের ধারে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাই। ... দেখুন, এখনও তার চিহ্ন রয়েছে।"

"বেশ," সার্জেণ্ট মেনে নিল। ওরা যে সত্যি কথাই বলছে তা স্পষ্টই বোঝা গেল। "চলে এসো। তোমাদের গেরেফ্‌তার করা হল।"

সৈনিকেরা একটু থামল।

"গেরেফ্‌তার!"

"হাঁ! এখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হা করে চেয়ে থেকো না। তোমাদের এ জায়গায় পাহারা দেওয়ার কথা ছিল, কি, ছিল না? ছিল ত? কিন্তু তবু তোমাদের হদ্দায় এরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল, আর তোমরা সে সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখো নি। একজন অপরাধীর মৃত দেহ এখান থেকে কে নিয়ে গেছে, আর গর্দভ তোমরা, তার কিছুই জানো না। কি চমৎকার দায়িত্বজ্ঞান! এ রকম দায়িত্বশীল সান্ত্রী থাকলেই তারা একে একে আমাদের গলা কাটতে

পারবে, মানুষেরা পাখীর মুণ্ডু যেমন করে টেনে ছিঁড়ে ফেলে তারাও আমাদের তেমনি ছিঁড়ে ফেলবে। ...”

উভয়েই মাথা নীচু করে সার্জেন্টের অনুসরণ করল।

“অভিশপ্ত জায়গা,” রাশ্‌ক্য বিড় বিড় করে বলল। তার সঙ্গীটা জবাবে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

“সেখানে আর কেউ ছিল না, কেউ থাকতে পারে না!” রাশ্‌ক্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

ফোগেল ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ল, তার মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি বয়ে গেল। রাশ্‌ক্য জোর দিয়েই বলতে লাগল যে, সেখানে কেউ থাকতে পারে না। তার কথা অবশ্য সত্য—বরফ মড়মড় করে নি, কোন রকম শব্দ পাওয়া যায় নি, বরফের উপর কোন মানুষের ছায়াও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখতে পাওয়া যায় নি। তবু ছেলেটার মৃত দেহটা কোথায় অন্তর্ধান করেছে। এ সবের অর্থ কি?

ফোগেল এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই ভীত হয়ে পড়ল এবং অজ্ঞাতসারেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। অবশেষে কুটীরটার সামনে গিয়ে পৌঁছতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দরজা খুলে দিতেই ঘরের উত্তাপ আলো ও মানুষের কণ্ঠস্বরে অনেকখানি সজীব হয়ে উঠল। সেই খাদ, রাশীকৃত বরফ ও ভয়াবহ রাত্রির বিভীষিকায় তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠছিল, এতক্ষণে সেই বিভীষিকাটা যেন কেটে গেল। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল যে সে বন্দী। আবার সে মানুষের মাঝখানে ফিরে এসেছে—এই ভেবে সে অনেকখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাতির আলো ও মানুষের কণ্ঠস্বরে রাত্রির ভীতিটা কেটে গেল। ঘরের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করল।

“তোমাদের নিয়ে কি করা উচিত, ক্যাপ্টেন এসে স্থির করবেন। সকাল পর্যন্ত এখানেই থাকো,” সার্জেন্ট আদেশের সুরে বলল।

ঘরের এক কোণে তারা বসে পড়ল। ঘরে বেশ গরম থাকায় ওদের ভালই লাগছিল। রাশ্‌ক্য দেয়ালে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগল, কিন্তু উকুনের উৎপাতে

ঘুমোতে পারছিল না। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় সারা গা চুলকোতে চুলকোতে আবার চোখ মেলে চেয়ে মনে মনে বাপান্ত করতে লাগল।

"অদৃষ্টে যত নরক-যন্ত্রণা! এতে মানুষ কেমন করে ঘুমোতে পারে।… বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে পোকাগুলো চুপচাপ থাকে, কিন্তু এখন তারা পেয়ে বসেছে।…"

তারা তখন চুল্লীর কাছে সরে গিয়ে গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলল এবং আলোর কাছে বসে হাতে-বোনা মোটা কাপড়ের জামা থেকে উকুন বেছে ফেলতে লাগল।

*

গালিয়া মাল্যচিখা মেঝেয় বসে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল। খাদের দিকে তিন শ গজের উপর হামাগুড়ি দেওয়া সহজ কাজ নয়। জার্মানদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্যে তাকে অন্তত একশ বারও বরফের উপর মুখ ডুবিয়ে থাকতে হয়েছে। সে দাঁত কামড়ে সয়েছে, নিজের অদৃষ্টে যাই হোক, ছেলেটাকে খাদের মধ্যে কুকুরের মত পড়ে থাকতে দেবে না।

খাদের ওখান থেকে ফিরে আসাটাই সব চেয়ে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ছেলের দেহটা নেহাৎ ছোট হলেও তার পক্ষে বয়ে আনা কঠিন, কেন না, মৃতদেহ অনেকটা ভারী হয়, তা ছাড়া পিচ্ছিল পথে সাবধানতা দরকার, সবার উপর আত্মগোপনের সেই প্রাণপণ চেষ্টা। কষ্টেসৃষ্টে বেড়া পর্যন্ত সে হামাগুড়ি দিয়ে পৌছল, খাদ থেকে উপরে উঠতেও তাকে কম বেগ পেতে হয় নি। তবে একটা সুবিধা হয়েছিল এই যে, সৈনিকেরা কথা বলতে বলতে বাড়ীটার সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক কষ্টে সে দেহটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে এসে পৌছল। তার ছোট্ট মিশা শক্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে টেবিলের উপর পড়ে আছে। এর মধ্যেই বরফে তার দেহ কঠিন হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন সে অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। ছেলেরা তাদের দাদার চার পাশে দাঁড়িয়ে। মাথার সুন্দর চুলগুলি অগোছাল, মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে, হাঁ করেই সে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে, তার শেষ আর্তধ্বনি এখনো ওই

জ্যোৎস্নার ভিতর থেকে শোনা যায়—জানলা দিয়ে সে জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে। জিনা অত্যন্ত সাবধানে তার ছোট্ট আঙুলগুলি দিয়ে মিশার জামার যেখানটা রক্তাপ্লুত হয়েছিল সেখানটায় স্পর্শ করল।

"এ কি ?"

"ওখানে হাত দিস নে, না," সাশা রূঢ় স্বরে বললে। "ওই খানটায়ই তারা গুলি মেরেছে, তাই না মা ?"

"হাঁ বাছা, ওইখানটায়ই," মা অস্পষ্ট স্বরে চুপি চুপি বললেন এবং তাঁর আঙুলগুলি মিশার নরম চুলের মধ্য দিয়ে বুলিয়ে গেলেন। এই খানিকক্ষণ আগেই না ও ওলেনা মাসিকে দেওয়ার জন্যে খানিকটা রুটি পকেটে নিয়ে ঘর থেকে অতি সাবধানে বেরিয়ে গেল। গালিয়া নিশ্চিত জানত, কাজটা ও হাসিল করে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু কাজে ঘটল অন্য রকম।

"ওকে যেতে দেওয়া আমাদের ঠিক হয় নি," হঠাৎ জিনা কেঁদে উঠল।

"তার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, বাবা," মা ক্ষীণস্বরে বিলাপ করে উঠলেন। "ওঃ, যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। ..."

"সেখানে তারা ওলেনা মাসিকে কিছুই খেতে দেয় নি," প্রবীণের মত গম্ভীর স্বরে সাশা বললে।

"হাঁ, বাছা," মা ওর কথায় সায় দিয়ে বললেন। "ওলেনা মাসি আর উনি একই দলে ছিলেন। ... আর দেখ, সেই ওলেনার আজ কি অবস্থা হয়েছে। ও নিশ্চয়ই মরবে। কিছু না করেই মরল, এই আফসোস ..."

"বল ত আমি কয়েকটা আলু নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে আসি, একটা পাত্রে কয়েকটা আলু এখনও রয়েছে," সাশা রাগত স্বরে আউড়ে গেল।

"না, বাবা, এখন কেউ ওখানে গিয়ে পৌছতে পারবে না। তারা এখন ওখানটায় প্রাণপণে নজর রাখবে। ... খামকা তুমি মরবে। ... আমরা মনে করেছিলাম চালাটার কাছাকাছি কেউ নেই, তারা কিন্তু মিশাকে দেখতে পেয়েছিল। ..."

"তারা আমায় দেখতে পেত না," সাশা জোর দিয়ে বলল।

"তুমি বোকার মত কথা বল, আর এসব কথা ভালও নয়। ··· মিশাই যখন পারে নি, তখন আর কেউ পারবে না। ···"

সাশা আর কিছু বলল না। মা মৃত পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, এবং ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

"ওকে কোথায় কবর দিই বল্ ত? ভোর না হতেই তারা ওকে খুঁজবার জন্যে চারিদিকে হাতড়ে বেড়াবে। ওকে পেলে তারা নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।"

"কেন, বাগানে ত কবর দেওয়া যায়," সাশা প্রস্তাব করল।

"কেমন করে বাগানে কবর দেব? তারা আমাদের মাটী খোঁড়ার শব্দ পেয়ে কি হচ্ছে দেখবার জন্যে ছুটে আসবে। ··· তা ছাড়া, বাগানের মাটী পাথরের মত শক্ত। আমরা ত আর সেখানে কবর খুঁড়তে পারব না, আর বরফ দিয়েও ঢেকে রাখা চলবে না। ···"

মৃতের দেহ টেবিলের উপর ছিল, অসহায়ের মত তারা টেবিলটি ঘিরে দাঁড়াল।

"তা হলে কি করা যায়?"

"বাড়ীর মধ্যেই ওকে কবর দেব," চুপি চুপি মাল্যুচিখা বলল।

"বাড়ীর মধ্যে?" জিনা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করল।

"তা ছাড়া আর কোথায়? ও নিজের বাড়ীতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকবে, আমাদের কাছেই থাকবে। ··· এ ছাড়া ত আর কিছু ভাবতে পারছি নে।"

"এখানে, এই ঘরেই?"

সে চারিদিক নিরুপায় ভাবে একবার তাকিয়ে দেখল।

"না। ··· দালানে। ···"

তারা ঘরের বাইরে এল; দালানটা মাটির, এককালি জায়গা। মাল্যুচিখা জায়গাটা একবার দেখে নিল।

"এখানেই খুঁড়ব। কোদালখানা নিয়ে আয় ত সাশা, ওই যে দরজার আড়ালে রয়েছে।"

মা হাত দিয়ে নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিলেন। পরে জায়গাটা দাগ করে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন।

শক্ত মাটী, সুদীর্ঘকাল ধরে কত লোকের পায়ের চাপে মাটীটা শক্ত হয়ে বসে গেছে। শক্ত মাটীতে কোদালের ঘা ফিরে ফিরে আসছিল। স্ত্রীলোকটি অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রান্ত হয়ে পড়ল।

"সাশা, এবার তুই একবার লাগ্ দেখি বাবা।"

"সাশা কোদাল নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মাটী খুঁড়তে লেগে গেল, এক এক কোপ দিতে গিয়ে জিভ্টা বের করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে লাগল।

জিনা একপাশে বসে মাটীগুলো দু হাত দিয়ে সরিয়ে স্তূপ দিয়ে রাখছিল।

একবার মা, আর বার সাশা—এমনি করে অনেকক্ষণ ধরে তারা সেই পাথরের মত শক্ত মাটী খুঁড়তে লাগল। উপরের সব চেয়ে শক্ত স্তরটা ভাঙার পর খোঁড়ার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত ছোট একটি কবর খোঁড়া শেষ হল।

"এখন ওকে ভাল জামা-কাপড় পরাতে হবে। … ওঃ, ওকে যে বিনা কফিনে এ ভাবে কবর দিতে হবে, কে জানত! …"

বালতি থেকে খানিকটা জল নিয়ে মিশার মুখ চোখ ও বুকের আহত স্থানের রক্ত, পিঠ ইত্যাদি সর্বাঙ্গ মুছে পরিষ্কার করে দিল। তারপর দেরাজ থেকে একটি ধোয়া শার্ট বার করে অনেক কষ্টে পরিয়ে দিল। হাতখানা ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে।

"ওকে এমনি ভাবে কবর দেওয়া …"

জিনা ফুঁপিয়ে উঠল।

"কেঁদো না মা, কেঁদো না। লালপল্টনের মতই আমাদের মিশুৎকা মরেছে। জার্মানের গুলির ঘায়েই মরেছে, কর্তব্য করতে গিয়েই সে জীবন দিয়েছে, বুঝতে পেরেছ?"

কথাগুলি সে জিনাকে লক্ষ্য করেই বলছিল বটে, কিন্তু আসলে সে বলছিল নিজেকেই। একটা উদ্যত কান্না গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল। তার ভয় হল যে,

শেষপর্বন্ত হয় ত নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না, হয় ত মৃত পুত্রের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একটা পশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে, তখন সারা গাঁ তার দুর্ভাগ্যের, তার বেদনার, তার পুত্রের মৃত্যুর খবর— যে-পুত্রকে সে প্রসব করেছে, খাইয়ে পরিয়ে স্নেহাঞ্চলে সুদীর্ঘ দশটি বছর মানুষ করেছে, জার্মানের বুলেটে যে মরেছে, তার কথা সকলেই জেনে যাবে।

"উনি যখন গেরিলা দলের সঙ্গে চলে যান তখন মিশাকে বলেছিলেন : 'মনে থাকে যেন, এখানে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করো না!' মিশুৎকা তার বাবার আদেশ পালন করেছে, আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নি।··· বুঝতে পারছ?"

"বুঝেছি," জিনা ফোঁপাচ্ছিল।

"তোমরা কাঁদতে পাবে না। মিশুৎকার কবরের উপর তোমাদের চোখের জল পড়লে সে শান্তি পাবে না। কাজেই তোমরা কেঁদো না। এস, কাপড়টা পেতে দিতে আমায় সাহায্য করো।"

খোলা কবরে তারা চাদরখানা বিছিয়ে দিল, তার উপর ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল।

"কাপড় দিচ্ছি এই জন্যে যে তা হলে আর তার চোখে মাটী লাগবে না," মা বলেন।

"যেন ওর চোখে মাটি না পড়ে," জিনা ফোঁপাতে ফোঁপাতেই কথাটা পুনরুক্তি করল।

"জিনা, খানিকটা মাটী নিয়ে দাদার দেহের উপর ছড়িয়ে দাও," মাল্যুচিখা বলল।

জিনা হাত ভরে মাটী নিয়ে কবরে ছড়িয়ে দিল। তারপর সাশাও ঠিক সেই ভাবে মাটী দিল। তারপর মা নিজে কোদাল দিয়ে মাটী ফেলতে লাগলেন। গর্তটা ভরে গেল, সাদা কাপড়ও ঢাকা পড়ল। কিন্তু জায়গাটা মেঝের চেয়ে অনেকটা উঁচু হয়ে রইল।

"এর উপর দিয়ে আমাদের এখন হাঁটতে হবে," মা বললেন, "নইলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকবে। জার্মানরা যদি আসে ত এটা দেখতে পেয়েই সব বুঝতে পারবে, আর তা হলে মাটী খুঁড়ে আবার মিশাকে বার করবে।"

তারা তিনজনেই ধীরে ধীরে পায়ের চাপ দিয়ে কবরের মাটীটা সমান করে দিতে লাগল। মাল্যুচিখার মনে হল, সে তার পুত্রের কবরের উপর হাঁটছে—যা কেউ কখনও কোথাও করে নি, যা সমস্ত দেশাচারের বিরোধী! মা হয়ে সে তার প্রিয় পুত্রের মাথার উপর, তার সে রক্তাক্ত বক্ষস্থল, তার সে কচি হাত-পায়ের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে।

"এ আমাদের করতেই হবে," মনের কথার জবাবে সে জোরে জোরেই বলল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষ জিনাও তার প্রতিধ্বনির মত বলতে লাগল ঃ

"হাঁ, এ আমাদের করতেই হবে।"

"হয়েছে ?" সাশা জিজ্ঞাসা করল।

"না, বাছা, এখনও মাটী নরম রয়েছে, এখনও দেখলে বোঝা যাবে। এখনও আরো অনেক হাঁটতে হবে, যতক্ষণ না জায়গাটা সমতল হয়ে যায়।

এখানে সেখানে যে-সব মাটীর ঢেলা পড়েছিল সেগুলিও অত্যন্ত যত্ন করে কুড়িয়ে নিয়ে সে চুল্লীর চার পাশে ছড়িয়ে দিল। তারপর ঝাঁটা নিয়ে জায়গাটা বেশ ভাল করে ঝাঁট দিল—যেন কবরের কোন চিহ্নই কেউ না পায়। তারপর সেখানটায় কাঠের কুঁচি, খড়কুটো এবং আরও সব কিছু কিছু ছড়িয়ে দিল—তখন সে জায়গাটা বেশ স্বাভাবিক-গোছের হয়ে দাঁড়াল।

"কিছু বোঝা যায় ?"

সাশা উঁকি মেরে দেখল।

"না।… কাল দিনের আলোয় আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব।"

মাল্যুচিখা সেখানে দাঁড়িয়ে পুত্রের সেই অভূতপূর্ব কবরের দিকে চেয়ে রইল—যেখানে খড়কুটো, কাঠের কুঁচি ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। মিশুৎকার আর কোন চিহ্নই রইল না। মানুষের ছেলেমেয়ে মরে, কিন্তু প্রত্যেকের নিজ নিজ কফিন থাকে এবং কবরের উপর সবুজ ঘাস গজায়। একমাত্র মিশ্‌কারই কোন

চিহ্ন রইল না। এখানে তার নিজের বাড়ীতেই সমাধিস্থ রইল বটে, কিন্তু মাও যদি না জানত ত মিশার শেষ বিশ্রামের স্থান সেও খুঁজে পেত না।

"বাছারা, এবার গিয়ে ঘুমোও," সে বললে।

"আর তুমি ?"

"আমিও শোব। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। আমাদের একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে।"

কিন্তু তার ঘুম এল না। সে মিশুংকার কথা, স্বামীর কথাই ভাবতে লাগল। স্বামী আছেন গ্যেরিলা দলে। তাঁকে সৈন্য দলে নেওয়া হয় নি, ১৯১৮ সালে তিনি হাতের দুটো আঙুল খুইয়ে বসেন। সামরিক বিভাগ তাকে সৈনিক হিসেবে অযোগ্য বলে ফতোয়া দেয়। কিন্তু গ্যেরিলারা কারুর হাতের আঙুল আছে কি নেই তা দেখে না, তারা দেখে মনের জোর আছে কি না।

প্লাতোন বাড়ী ফিরে এসে মিশার কথা শুধাবেন। ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। সে স্বামীকে কি বলবে? তাকে বলতে হবে—তোমার মিশুংকা ওইখানে দালানে মাটীর মেঝের নীচে শুয়ে আছে; তার বুকে জার্মানের গুলি বিদ্ধ হয়েছিল।

মাল্যুচিখা এও বেশ জানে যে, প্লাতোন সব কথাই ধীর ভাবে শুনবেন, তার পর বলবেন সেই কথা—যা তিনি আগেও বলেছেন। জার্মানরা প্রথম যখন গ্রামে প্রবেশ করে তখন আবশ্যক জিনিসের থলে কাঁধে নিয়ে গ্যেরিলাদের সঙ্গে জঙ্গলে আশ্রয় নেবার জন্যে যাত্রা করবার প্রাক্কালে তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন: তোমরা রইলে। যদি আবশ্যক হয় তা হলে যা-কিছু হাতের কাছে পাবে তাই দিয়ে বাধা দিও, দেখো যেন কোন মতেই আত্মসমর্পণ করো না। আমাদের আজ সকলকেই লড়তে হবে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ছেলে মেয়ে—সকলকে!"

সব শুনে প্লাতোন বলবে: "হাঁ, আমাদের মিশুংকা জার্মানদের সঙ্গে লড়ে মৃত্যুবরণ করেছে! তুমি যেন তার জন্যে বিলাপ করো না, সে তার স্বদেশের জন্যে আত্মবিসর্জন করেছে, বুঝেছ?" আর তাই মাল্যুচিখাও কাঁদে নি, তবে

"তুমি কি তাই মনে কর নাকি! তারা মালেরকে পাঠিয়েছিল? অথচ তার পা কয়লার মত কালো হয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে অমন করে চেঁচাতে হবে না।"

"কেন, এখানে ত কেউ নেই।"

"তুমি তাই মনে করে বসে থাক—'এখানে ত কেউ নেই।' কাল সকালে দেখবে, সার্জেণ্ট কিন্তু সব কিছুই জেনে বসেছে।"

"তুমি গিয়ে সব কিছু তাকে না-বললে অবশ্য নয়।"

"ও কথা আর বলো না, বললে …"

"যাক গে, আর গোলমাল করো না। আমি বলতে চাই যে, অলৌকিক ব্যাপার বলে কিছু নেই।"

"না, নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, তা হলে দেহটা গেল কোথায়?"

"সেটা আর এক কথা। … আমি সার্জেণ্টের কথাই বলছি। …"

"ওঃ! …"

চাঁদের চার পাশে যে জ্যোতির্মণ্ডল দেখা গিয়েছিল, এর মধ্যে সেটা কাচের মত নির্মেঘ আকাশে আরও বড়, আরও ঘন, আরও ধবধবে নীল দেখাচ্ছিল।

"বল, কি বলতে চাও। ভোরের দিকে তুষার আরও বেশি করে পড়তে থাকবে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বেশ একটু গরমই লাগছে।"

"আমি বলছি, আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। আমার হাড়ের মধ্যেই তা টের পাচ্ছি।"

"কি, বাতের ব্যথা নাকি?"

"হাঁ, তাই। আবহাওয়া বদলের সঙ্গেই বেদনা শুরু হয়।"

জার্মান সৈনিক দুটো গোটা রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

"ভাল কথা, সেই মেয়েমানুষটা কি এখনও সেই চালা-ঘরেই আছে?"

"হাঁ।"

"সকালেই দেখবে সে জমাট বেঁধে গেছে।"

অদূরে দালানের মেঝের নীচে—যেখানে তার পুত্রের গোপন কবর, সেই দিক পানে সে দুই চক্ষু প্রসারিত করে চেয়ে রইল।

*

এ দিকে বাইরের সান্ত্রীরা তখনও রাত্রির দুর্ঘটনার কথা নিয়ে আলোচনা করছিল।

"জায়গাটা ভূতুরে। আচ্ছা, কে মৃতদেহটা নিতে পারে? রাশ্‌ক্য বলেছে যে তারা কোন শব্দ শোনে নি। অথচ এক পা চলতে গেলে বরফ মড়মড়িয়ে ওঠে।"

"কে জানে কি হয়েছে।" অপর ব্যক্তি বিড় বিড় করে বলল। তার মুখে চোখে একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠেছে। "এখানকার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারবে না।"

তারা থেকে থেকে সারাক্ষণ কেবল চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল।

তাদের মনে হয় বরফ মড় মড় করছে, স্পষ্ট ভাবেই মড় মড় করে গুঁড়ো হচ্ছে, তারা যেন পদশব্দও শুনতে পায়। চারিদিক তাকিয়ে দেখতে গেলে তখন আর কিছুই দেখা যায় না। চাঁদের চার দিকে একটা আবছা জ্যোতির্মণ্ডল জ্বল জ্বল করছে। আলোক-স্তম্ভ, বিজয়-তোরণ—সব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে যেতে তারা যেন কাঁপছে।

"একটু গরম পড়ে আসছে বলেই মনে হচ্ছে," একজন সৈনিক বললে।

"তুমি তা-ই বলছ। আমি ভাবছি আমার কান দুটো কখন খসে পড়বে। বাইরে যখন থাকো তখন এটা নজরে আসে না, কিন্তু যেই ঘরে ঢুকে গরম জায়গা দেখে বসলে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত জ্বলতে লাগল।"

"আমার মনে হয়, একেই বলে তুষারের কামড়।"

"অবশ্য, পা দুটো তুষারে ফেটে চৌচির হয়েছে। কিন্তু আমার পায়ে যেন যন্ত্রণা হচ্ছে। … যেই গরম ধরবে, অমনি পচতে শুরু করবে।"

"বেশ ত, তা হলে ত তোমার পক্ষে ভালই, তখন তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।"

"আবহাওয়া যদি বদলায়, তা হলে জমাট বাঁধবে না।"

"এ সব কাজ বড় নোংরা। স্ত্রীলোক, ছেলেপিলে ..."

"চাড়া নেই। এ সব মেয়েমানুষ এমন যে দেখা মাত্র তোমায় শেষ করে দিতে পারে। ছোট ছেলেগুলি আরও ভয়ঙ্কর। তারা সব জায়গায়ই ঘুর-ঘুর করবে এবং তাদের যেখানে কোন প্রয়োজন নেই, সেখানেও গিয়ে বসবে। আমার বিশ্বাস, গ্রামবাসীরা আমাদের চালচলন লক্ষ্য রাখবার জন্তেই তাদের পাঠায়।"

খানিকক্ষণ তারা চুপ করে রইল।

"আমি হলে এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবেই ব্যবস্থা করতাম। আর একজন ক্যাপ্টেন যা করেছিল, মনে আছে না তোমার?"

নাক থাঁদা লোকটা মাথা নাড়ল।

"দেখো, ওরা আমাদের হয়ে কখনও কাজ করবে না। আমি ওদের ভাল করেই জানি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ করতেই হবে। তবে এখনি করতে দোষ কি? বরং সে-ই ভাল, তাতে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়।"

"সকলকেই?"

"হাঁ, সকলকেই। নিজেই ত বেশ দেখতে পাচ্ছ তারা কি চিজ। এতটুকু খুদে ছেলেগুলি এমনি তৈরি হচ্ছে, আমাদের পক্ষে তাদের নতুন করে কোন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। আর তা ছাড়া, আমরা সে হাঙ্গামা পোহাতেই-বা যাই কেন—সে মেহনতের মজুরি পোষাবে না। তারা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ এবং আলাদাই থাকবে।"

অপর সৈনিকটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, কোন জবাব দিল না। রামধনুর স্তম্ভগুলি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। রাস্তার দু পাশে যে গাছ সারিবদ্ধ হয়ে আছে, তার ডাল-পালায় একটা খস্‌খস্‌ শব্দ হতে শুরু করল। সেখান থেকে বরফ বৃষ্টি হতে লাগল। চাঁদ আবার কুয়াশায় ঢেকে গেল, তখন তার আলো মলিন ও বিষণ্ণ।

"আবহাওয়ার বদল শুরু হয়ে গেছে। মিনিটখানেক আগেও চাঁদকে সূর্যের মতই উজ্জ্বল দেখিয়েছে, আর এখন তাকে দেখ।"

"বাতাস উঠেছে।"

"গরম লাগছে—এ ভালই। বরফে শীতে মরবার জন্যে আমি ত প্রস্তুত হয়েই আছি।"

তখনও পায়ের তলায় বরফ গুঁড়ো হচ্ছে, কিন্তু আগের মত মড় মড় শব্দ হয় না। খুব তাড়াতাড়ি আবহাওয়ার বদল হচ্ছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ আকাশ এখন ধূসর কুয়াশায় নিষ্প্রভ দেখায়; বাতাস ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছে, বাতাসের সঙ্গে মাঠ থেকে বরফও শূন্যে উড়ছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে, মুখে চোখে ঝাপটা মারছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতলা জামার মধ্যে গিয়ে ঢুকছে।

তুমি না বলছিলে গরম লাগছে—এই কি তোমার গরম! ..."

"ঐ আর কতক্ষণ?"

"আরে ভোর হতে এখনও অনেক দেরী—এখনও অনেক হাঁটতে হবে।"

দূর বরফাচ্ছন্ন সমতল থেকে একটা অদ্ভুত গর্জন শোনা গেল, সেটা যেন ধেয়ে আসছে। যতই কাছে আসছে ততই গর্জনের পর্দা উঁচুতে চড়ছে।

"ওটা কিসের শব্দ?"

তারা দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনল। গর্জন ক্রমেই বিকটতর শোনাতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময় গ্রামের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাতাসের প্রতাপে গাছগুলি এক একবার মাটীতে নুইয়ে পড়ছে এবং ডালগুলি তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠছে। মাটী থেকে বরফগুলিকে উপড়ে ফেলে, কখনও ছড়িয়ে, কখনও শূন্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। যাত্রীরা সোজা মাথা তুলে এগোতে পারছিল না, প্রায় মাটীতে নুইয়ে এগোতে চেষ্টা করল। যখন তারা আবার ফিরে চলল, তখন বাতাস তাদের পিঠে লাগায় তাদের চলা সহজ হল, বাতাস তাদের এমন ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল যাতে মনে হয় যে তাদের যেন পাখা আছে। কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, বাতাস

কেবল তার দিক-পরিবর্তন করতে লাগল, কখনও ডাইনে থেকে, কখনও বা বাঁয়ে থেকে, আবার কখনও সোজা রাস্তা ধরে বাতাস বইতে লাগল। জায়গায় জায়গায় কৃত্রিম ফোয়ারা তৈরী হতে লাগল এবং সেগুলি বড় হতে হতে একসময় হঠাৎ ভেঙে পড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মাটী সাদা হয়ে পড়তে লাগল।

"বাপ্‌ রে, কি শীত! এ যে দেখছি দস্তুর মত তুষার-ঝড়। এরকমটা কিন্তু কখনও দেখা যায় নি।"

এমন সময় তারা উভয়েই যেন কার আদেশে যুগপৎ পরস্পরের কাঁধের দিকে তাকাল। কিন্তু রাস্তাটা আগে যেমন জনহীন ছিল এখনও তেমনি।

৩

ক্যাপ্টেন ভের্নের চিঠি থেকে দৃষ্টি তুলে একবার জানলার দিকে চাইল। বাইরে ঝড় বইছে। দেখে মনে হয়, বরফ পড়ছে। কিন্তু বস্তুত বাতাসের ঝাঁপটায় বরফের চাপগুলো উপরে উঠে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঃ কখনও ঝোপের গায়ে, কখনও বা জানলার শার্শিতে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমভূমির উপর ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপি যেন ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। ঝড়ের ঘায়ে গ্রামের ঘরবাড়ীগুলো পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

কুর্ট ভের্নেরের মনটা আজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কত দিন সে দেশ ছাড়া! তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মনটা কেমন দিশেহারা হয়ে মরুভূমির ধূসর বিস্তীর্ণ বালুরাশির মত ওই বরফের স্তূপে ডুবে যায়। আজ মনে হয় ড্রেসডেনের সেই বাড়ীখানির কথা,—তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা না জানি কি করছে সেখানে। কত দিন সে তাদের দেখে নি। ফ্রান্স থেকে চলে আসবার সময় আশা করেছিল হয় ত একবার বাড়ী যেতে পারবে, অন্তত একটি দিনের জন্যে। কিন্তু জার্মানীর ভিতর দিয়ে তাদের পাগলের মত ছুটিয়ে আনা হল। ট্রেন থেকে এক মিনিটের জন্যেও একবার নামবার সুযোগ পেল না। ট্রেনের জানালা-পথে

ওর জন্মভূমির ছবি মুহূর্তের জন্যে ক্ষিপ্রগতিতে দেখা দিয়ে গেল। ও শুধু একটি বার চোখ তুলে চাইল যে-দিকে ওর বাড়ী, সেই পথে। কিন্তু আজ বাড়ী ফিরবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠেছে। যদি আধ ঘণ্টা, এমন কি, দশ মিনিটের জন্যেও একবার যেতে পারত! সেখানে ঝড় বইছে না, নালার জমাট বাঁধা বরফে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে নেই। টেবিলে বসে ও খেত কফি, আর লুইজা রুটিগুলো কেটে টুকরো টুকরো করত। কত আরাম, কত শান্তি ছিল তার মাঝখানে! হাসিমুখে নিটোল হাতখানি বাড়িয়ে লুইজা ওর হাতে পেয়ালা তুলে দিত। আবার কবে সেদিন আসবে তার?

হঠাৎ সকলের উপর এবং সব কিছুর উপর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। পুসিয়ার উপর ওর রাগ হচ্ছিল। অত্যন্ত খেয়ালী মেয়ে, দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোবে আর রাত দিন কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবে। মাথায় তার এটুকু বুদ্ধি জোগায় না যে, বিছানাটা পাতে বা শোবার ঘরখানা পরিষ্কার করে। নোংরা বিছানাটার কথা মনে হলে ওর কেমন ঘৃণা ধরে যায়। ঘরের মেঝেতে রাশীকৃত সিগারেটের টুকরো, টেবিলের উপর কতকগুলি হেয়ার পিন, নখকাটা কাঁচি, মাখন, রুটি—সব কিছু এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। আর ড্রেসডেনে তার সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটটি? কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! প্রত্যেকটি জিনিস বেশ সাজানো গোছানো। লুইজা প্রায় সব সময়ের জন্যেই একখানা ঝাড়ন হাতে ঘুরে বেড়ায়। অধীনস্থ সৈনিকগুলোর উপরেও রাগ হচ্ছিল। যত সব স্টুপিড, নিরেট! সর্বাঙ্গ ভরতি উকুন, বরফে হাত মুখ ফেটে উঠেছে। যত রকম ব্যাধি মানুষের থাকতে পারে তার সবই আছে তাদের। যে গ্রামে সম্পূর্ণ একটি মাস কেটে গেল সে গ্রামখানির উপরেও আজ ভের্নেরের অত্যন্ত রাগ হচ্ছিল। বিশ্রী নিরানন্দ নির্জন গ্রাম! মাটীর দিকে চেয়ে লোকগুলো ওর পাশ দিয়েই যাতায়াত করে, অথচ একবার চোখ তুলে চায় না। অবশ্য ও জানে তাদের সে দৃষ্টিতে বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন শক্তি নেই যাতে করে ওই লোকগুলোর কাছ থেকে এতটুকু ভয় বা বশ্যতা আদায় করা যায়।

"তোমাকে আরও কিছু শোনাব," দাঁতে দাঁত চেপে সে বিড় বিড় করল। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একখানা সাদা কাগজের উপর। টেবিলের উপর মাথা গুঁজে সে দ্রুত লিখতে আরম্ভ করে দিল—এত দ্রুত যে, লিখতে লিখতে চার দিকে অতি ক্ষুদ্র কালির ফোঁটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

"কবে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব, এখন থেকে আমি সেই দিনটি গুণছি। লুইজা, জান, আমরা কেবল এগিয়েই চলেছি, এই অচেনা বর্বর অসভ্য দেশে আমরা এগিয়েই চলেছি। শীঘ্রই সম্পূর্ণ জয়ে আমাদের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠবে।"

লুইজা খুশী হোক। তারা যে পুরো একটা মাস একই জায়গায় আটকে আছে এ খবর তাকে জানানো অনাবশ্যক। একটা অতি বিশ্রী গ্রামে পুরো একটা মাস তারা ভয়ানক তুষার-বরফে বিব্রত, গ্যেরিলারা বনের ধারে খাদের পাশে ঘুপটি মেরে আছে, সৈন্যেরা দিন দিনই দুর্বল হয়ে পড়ছে, এবং তাদের মধ্যে নানা রকম আধিব্যাধি দেখা দিয়েছে, ফ্রান্স থেকে যে সৈন্যদল নিয়ে সে এখানে এসেছিল তার মধ্যে বড় একটা কেউ বেঁচে নেই, একমাত্র শাখের ছাড়া তার ড্রেসডেন-বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ জীবিত নেই—এসব খবর তাকে দেওয়ার দরকার নেই। না, সে এসব জানে না, আর জানবেই বা কেমন করে? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সব চিঠি লেখা হয় তাতে আশার বাণীই থাকা দরকার। তাতে সৈনিকের স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় থাকবে। তা ছাড়া, যে চিঠি সে লুইজাকে লিখবে সে চিঠি লুইজা পড়ার আগে অপরে পড়বে; সুতারং কুর্ট ভের্নের-এর মনোভাব তারা চিঠি থেকে স্পষ্ট জানতে পারবে।

"এখানে শীত খুব বেশী, এরকম তুষারের সঙ্গে আমাদের আদৌ পরিচয় নেই। তবে আমাদের তাতে কোন অসুবিধা হয় না, কেন না, ফুরার-এর আদেশবাণী আমাদিগকে উৎসাহিত করে এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করবার সুযোগ আমাদের উপর ন্যস্ত বলে আমরা গর্ব অনুভব করি। জার্মানীর শৌর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ভারও আমাদের উপরই ন্যস্ত।"

আরও গুটিকয়েক পংক্তি লেখার পর কুর্ট চিঠিখানা আর একবার প্রথম থেকে পড়ল। না, শুনতে ত খারাপ লাগছে না। বরং জার্মানী থেকে সৈন্যদের জন্যে যে সব ইস্‌তেহার এখানে পাঠানো হয় তার চেয়ে এ চিঠি ঢের ভাল হয়েছে। অধিকতর সতেজ ও সহজবোধ্য।

কলমের প্রান্তটা চিবোতে চিবোতে সে আরও খানিকক্ষণ কি ভাবল, তার-পর স্থির করল যে, এ-ই ঠিক। অবশ্য ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে, সেকথাও লিখতে হবে। কেন না, সে ত শুধু জার্মান-বাহিনীর অন্যতম ক্যাপ্টেনই নয়, সে স্বামী এবং পিতাও।

"লুইজা, তোমার দিন কেমন কাটছে? লিজেল কেমন আছে? উইলির টনসিলটা কমেছে? তার জামার জন্যে কিছু ফার পাঠাতে চেষ্টা করছি। তা হলে আর তার ঠাণ্ডা লাগবে না। মোজা চেয়ে পাঠিয়েছ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে তা পাওয়া মুশকিল। প্রথম থেকেই আমরা কেবল পাড়াগাঁয়েই আড্ডা গেড়েছি। কোন শহর দখল করতে পারলে তখন মোজা সংগ্রহ করে পাঠাতে পারব। গেল সপ্তাহে কিছু মাখন পাঠিয়েছি। আমার প্রেরিত জিনিসগুলি যখন যখন পাও, নিয়মিত আমাকে খবর দিও। আগামী বারে কিছু মধু পাঠাব—মধু ব্যবহার করলে উইলির গলার উপকার হবে। …"

দরজায় কে কড়া নাড়ল।

"কি চাও"?

"মোড়ল এসেছে দেখা করবার জন্যে।"

"তাকে বসতে বল," কাঁধের উপর দিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই আবার মাথা গুঁজে চিঠিতে মনোনিবেশ করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল; এতক্ষণ সে তার ড্রেসডেনের বাড়ীতে ছিল, হঠাৎ যেন আবার সেখান থেকে ফিরে এল য়ুক্রেনের এই পল্লীগ্রামে। এত রেগে গেল যে, সে আর লিখতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি স্নেহচুম্বন ও প্রীতি জানিয়ে চিঠি শেষ করে নাম দস্তখত করল এবং খামের মধ্যে পুরে ফেলল।

"এই—কে আছিস? ওকে আসতে বল্!"

দ্বার-পথে একটি লম্বা ছিপ্‌ছিপে লোক এসে উপস্থিত হল।

"হের ক্যাপ্টেন, আমায় ডেকেছেন?"

"হাঁ, ডেকেছি এই জন্যে যে, ..."

কুর্ট পা দুটো টেবিলের তলায় লম্বা করে ছড়িয়ে দিল এবং ক্ষণেকের জন্যে লোকটার ভিতরটাকে যেন একবার বুঝে নিতে চেষ্টা করল।

"হাঁ, যা বলছিলাম, খাদ্যশস্য কবে নাগাদ পাঠাতে পারবে?" কুর্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মোড়ল কেঁপে উঠে মাথা নীচু করে রইল।

"আমার যা সামর্থ্য, আমি করছি। প্রাণপণ চেষ্টা করছি—কিন্তু খাদ্যশস্য মোটেই পাচ্ছি নে। ..."

"তুমি কি বলতে চাও যে খাদ্যশস্য নেই? গ্রামে তিন-শ ঘর লোক আছে, এবছর ফসলও যথেষ্টই ফলেছে, আর তুমি বলছ খাদ্যশস্য নেই? তারা সব লুকিয়ে রেখেছে।"

লোকটা দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

"হাঁ, নিশ্চয়ই তারা লুকিয়ে রেখেছে। ..."

বাইরে ঝড় বইছে, জানলার দিকে চেয়ে সে কি যেন ইঙ্গিত করল।

"কি দেখব? ওখানে কি আছে?"

"তুমি দেখবে," ক্যাপ্টেন তাকে প্রতিবাদ করে বলল। "তোমাকে শুধু ঠিক মত তল্লাস করতে হবে। বুঝলে গাপলিক, ঠিক মত তল্লাস। ... বসো।"

মোড়ল একখানি চেয়ারের কিনারা ঘেঁষে আড়ষ্টভাবে বসে পড়ল।

"তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট নই, মোটেই না। সত্য বলতে কি, তারা যে কেন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে তার কারণও আমি বুঝতে পারছি নে। আমার মনে হয়, স্থানীয় কোন লোক হলেই আমাদের কাজের সুবিধা হত। ... মাসখানেক তুমি এখানে এসেছ, অথচ আজও তুমি এখানকার লোকদের ভাল করে চিনতেই পার নি। এ গ্রামে কারা বাস করে, তুমি জান?"

মোড়লের চোখে একটা আশার দীপ্তি কেঁপে কেঁপে উঠল।

"সত্যিই, আমি যে তাদের চিনতে পারি নি, এটা ঠিক। ··· গ্রামটা বেশ বড়, এবং আমার কাছে তাদের কারুরই কোন প্রয়োজন নেই। স্থানীয় লোক হলে কাজটা সহজই হত সন্দেহ নেই। ···"

ক্যাপ্টেন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

"ও, তাই নাকি! ··· তা হলে ত দেখছি, এ কাজ নিয়ে তুমি খুশী নও, তাই কি?"

গাপলিক তাঁর হাতের টুপিটাকে মোচড়াতে লাগল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

"ভাল। ··· কিন্তু তোমার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, লাল্লপল্টনের লোকেরা তোমাকে গুলি করে মারত, হয় ত তার চেয়েও খারাপ কিছু করে বসত, চাষীরা লেজা দিয়ে ফুঁড়ে মারত। ··· জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ তোমাকে বাঁচিয়েছে। এখন তারা যা বলবে, তোমার পক্ষে তা-ই করা উচিত। বিশেষত, তারা ত তোমার কাছে কিছু দাবি করছে না, করেছে বলতে পার?"

মোড়ল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

তোমার মধ্যে উৎসাহের অভাব যথেষ্টই আছে বলে আমাদের মনে হয়। বলশেভিকরা তোমার জায়গা-জমি সবই কেড়ে নিয়ে তোমাকে বন্দী করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম তুমি সাধ্যমত আমাদের উপকার করতে অবশ্য চেষ্টা করবে। কিন্তু সত্য বলতে কি, তুমি কিছুই করছ না। ... সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে গায়ের জোরে যতটুকু আদায় করতে পেরেছে ততটুকুই আমরা পেয়েছি। তোমার চেষ্টার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, কিছুই তুমি কর নি। এমন কি, তোমার কাছ থেকে একটা সামান্য খবরও আমরা পাই নি।"

"কিন্তু আমিও কস্টিয়ুক-রমণীর কথা আপনাকে জানিয়েছি। ···"

একটি মাত্র কাজ করে দিয়েছে সেই কথা উল্লেখ করে সে এখন আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা পেল। সে যখন জার্মান দফতর থেকে লুকিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন খবরটা দৈবাৎ সে শুনে ফেলেছিল।

ভের্নের ভ্রূকুটি করল।

"বেশ। তারপর ?"

"তারপর মাস্টারনী।..." গাপলিক অস্পষ্ট স্বরে বললে।

"ও, হাঁ, মাস্টারনী। তার সম্বন্ধে খুব সামান্য খবরই দিয়েছ, সেই সামান্য খবরও আবার প্রমাণসাপেক্ষ।"

"সেটুকুও স্থানীয় লোকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। ..."

"রাখো তোমার স্থানীয় লোক! স্থানীয় লোক হলে যে সুবিধাই হত, সে ত জানা কথা, কিন্তু পাই কোথা ? গ্রামে তিনশটি পরিবার আছে, তার সবগুলিই সমবায়ে চাষ করে। একটিও স্বাধীন চাষী নেই। জমিগুলি সবই ভদ্রলোকদের। এখানকার সব লোককেই যেমন তুমি জান, তেমনি আমি জানি—সকলেই ছিল নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য ; বলশেভিকেরা তাদের জমি দিয়েছে, কাজেই তারা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের প্রায় সকলেই গৃহযুদ্ধের আগে ছিল দিন-মজুর, সুতরাং তাদের মধ্যে আমাদের অনুরাগী স্থানীয় লোক পাব কোথা থেকে ?" ক্রুদ্ধ হয়ে ভের্নের টেবিল চাপড়ে উঠল। "তোমাকে সজাগ হতে হবে, বুঝেছ গাপলিক, একটু মন দিয়ে কাজ কর, নইলে তোমার সম্পর্কে আমার অন্য মনোভাব পোষণ করতে হবে। তোমাকে তিন দিন—না, চার দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে তোমাকে খাদ্যশস্য জোগাড় করতে হবে। সৈন্যদের খেতে দিতেই হবে, তুমি চাষীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য আদায় করতে অক্ষম বলে কি এই হতভাগা গ্রামে পড়ে আমার সৈন্যেরা না খেয়ে মরবে ?"

"আমার নিজের কিছুই করবার সামর্থ্য নেই," মোড়ল অগ্রসর হয়ে বললে। "সামরিক সাহায্য পেলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।"

"সামরিক সাহায্য দিতে কবে আমি গররাজী ? তোমার যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অবশ্যই তা পাবে, কিন্তু তোমাকে কিছু কাজ করতেই হবে, কি করবে ভেবেচিন্তে ঠিক করে নাও। ..."

মোড়লের ক্ষুদ্র চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"বেশ তবে তাই হবে, একটা মতলব ঠিক করে আপনাকে জানাব।"

"উত্তম, তবে একটা কথা বলে রাখি, বেশি দেরী যেন না হয়। মনে রেখো, মাত্র চারটি দিন তোমার হাতে আছে। হাঁ, তারপর সেই ছোকরার কথা। অপরাধীদের খুঁজে বার কর, নইলে এর জন্যে তোমাকেই দায়ী হতে হবে। মনে থাকে যেন! এর জন্যেও মাত্র চার দিন সময় পাবে।"

ভের্নের গাপলিকের দিক থেকে ফিরে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে তখনও ঝড় বইছে, বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত বরফ মিশে যাচ্ছে, ঘরটা মড় মড় করে উঠছে এবং এক এক সময় মনে হচ্ছে যে, এখনই বোধ করি হুড়মুড় করে ঘরটা ভেঙে পড়ল। গাপলিক বুঝতে পারল যে, তাদের সাক্ষাৎকার তখনকার মত শেষ হয়ে গেছে। সে মাথা নীচু করে ক্যাপ্টেন ভের্নেরকে সেলাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে খোলা জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত সে মাথায় টুপি পরতে সাহস পেল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কেমন করে প্রচুর খাদ্যশস্য জোগাড় করবে, পথ দিয়ে চলতে চলতে কেবল এই ফন্দিই সে আঁটতে লাগল। সে নিজের চিন্তায় এমনি মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, বিপরীত দিক থেকে একটা লোকের সঙ্গে বরফের দমকা ঝাপটায় ধাক্কা লাগবার উপক্রম হয়ে পড়ল। ভয়ে সে পিছন দিকে লাফ দিল। অপর ব্যক্তি প্রবীণ, তার মাথায় পাকাচুল, ত্রুটি স্বীকার করতে উদ্যত হল, কিন্তু পরে তাকে চিনতে পেরে ইচ্ছে করেই মাটীতে থুথু ফেলল এবং ফিরে কুটীরগুলির দিকে যে পথটা গেছে সে পথে চলে গেল।

গাপলিক দ্রুতগতিতে বাড়ী গিয়ে দেরাজ থেকে একখানি কাগজ নিয়ে একটা আদেশের খসড়া রচনায় লেগে গেল। মাথাটা একবার একদিকে, আর বার আর একদিকে রেখে কলম চালাতে লাগল। একবার লেখা অপছন্দ হওয়ায় কেটে বাদ দিচ্ছে, হাই তুলছে, ঘর্মাক্ত কলেবরে টাক রগড়াচ্ছে। বাইরে তখন ঝড়ের মাতামাতি চলেছে। ক্যাপ্টেন তাকে যে রকম শাসিয়েছে তা মনে পড়ছে, অধিকন্তু তার প্রতি গ্রামবাসীদের যে মনোভাব তার অপ্রীতিকর স্মৃতিও তাকে ঘরের বার করতে পারছে না। সে খুব ভাল করেই জানে যে, এই তার শেষ সুযোগ, এবারে সে যেমন করে পারে ভের্নেরকে খুশী করবেই

এবং ভের্নেরও স্থির করে বসেছে যে, যেমন করে হোক, গ্রামবাসীদের প্রতিকূলাচরণ সে ভাঙবেই।

ঝড়ের মুখে বরফের স্তর চার দিকে উড়ে পড়ছে, তারই মধ্যে গ্রামখানি নীরব নিস্তব্ধ। গ্রামবাসীরা কুটীরে বসে বরফ-ঝড়ের গর্জন শুনছে। কেবল মাত্র য়েভদোকিম ওখাবো একা আর কোন মতেই ঘরে বসে থাকতে পারছে না, তাই ঝড় দাপাদাপি করুক আর না-ই করুক, সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করবেই। ভীষণ বাতাসের মুখে সে প্রাণপণ চেষ্টায় মাল্যুকদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল এবং বিশেষ যত্নের সঙ্গে বুট থেকে বরফের কণাগুলি ঝেড়ে ফেলে দাওয়ায় গিয়ে উঠল। ভিতরে সব নিস্তব্ধ। য়েভদোকিম দরজার কড়া নাড়ল এবং কেউ এসে দরজা খুলে দেওয়ার অপেক্ষা না করেই ভিতরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে তিন জোড়া চক্ষু ভয়ে তটস্থ হয়ে তার দিকে নিবদ্ধ করল।

"তোমরা সব কেমন আছ গো ?"

মাল্যুচিখা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। তার বুকটা তখন ভীষণ ভাবে দপ্ দপ্ করছিল।

"দেখতে পাচ্ছ না, আমি! এত ভয় কিসের জন্যে ?"

সে জবাব দিল না। য়েভদোকিম লাঠিতে ভর দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে।

"আমাকে কি বসতেও বলবে না ? এটা ত দেখছি নতুন ব্যবস্থা।"

"আমাদের বাড়ীতে এসে তোমার বসা উচিত নয়, আসাও উচিত নয়," নীচু গলায় সে বললে।

"কেন ?"

সে তার কাঁধ দুটো ঝাঁকাল। বৃদ্ধ হাত ঝেড়ে নিয়ে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

"ব্যাপার কি গালিয়া, তোর মাথা খারাপ হয়েচে না কি ? ও রকম করে বসে আছিস যে ? মিশ্‌কা কোথায় ?"

হঠাৎ জিনা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

"কি হয়েছে, বল্ না ছাই!"

"চুপ কর্ জিনা, কাঁদে না," তার মা কঠোর স্বরে বলে উঠল।

য়েভদোকিম তার মাথাটা আঁচড়াতে লাগল।

"কি ঝড় বইছে, ভয়ানক বিশ্রী লাগছে। গোটা বাড়ীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে; একা একা মোটেই ভাল লাগছিল না ··· তাই মনে করলাম একবার তোমাদের কাছে আসি। ···"

"হাঁ দাদু, আমরা প্রতিবেশীই বটে। ···" মাল্যুচিখা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে।

য়েভদোকিম লাঠি গাছটির ডগা দুখানি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার উপর গালখানি কাৎ করে রেখে স্ত্রীলোকটির দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

"কিছু হয়েছে নাকি? মিশ্‌কাই বা কোথায় গেল? এ রকম ঝড়বাদলায় সে নিশ্চয়ই কোথাও বেড়াতে বার হয় নি?"

"দাদু, মিশ্‌কা চলে গেছে ···"

"চলে গেছে? কোথায়?"

"কোথাও না। ··· রাতে জার্মানরা মিশাকে গুলি করে মেরেছে।"

বৃদ্ধের স্বর কেঁপে উঠল।

"তারা—মিশাকে—গুলি—করেছে? কি বলছ মেয়ে! কি বলতে চাও?"

মাল্যুচিখা হাত কচলাতে কচলাতে আঙুলে ব্যথা ধরিয়ে দিল।

"শোন তা হলে। ··· ওলেনাকে দেওয়ার জন্যে খানিকটা রুটি নিয়ে খামার-বাড়ীতে গিয়েছিল, সেখানে তারা তাকে গুলি করেছে। ···"

বৃদ্ধের চোখে যেন একটা জিজ্ঞাসা ভেসে উঠল।

"না, তাকে জার্মানদের হাতে ফেলে রাখিনি, রাখতে পারি নি। গর্ত থেকে মৃতদেহটা তুলে বাড়ী বয়ে এনেছি। ··· কবরও দিয়েছি। এখন আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। ···"

"ও কে, তারা জানে?"

"জানবে কেমন করে? ওকে গুলি করে মেরে কুকুরের মত নালায় ফেলে দিয়েছে। অবশ্য পরে তারা ওকে নিশ্চয়ই খুঁজবে, কিন্তু এখনও খোঁজ পড়ে নি। তুমি যখন কড়া নাড়, তখন আমার মনে হয়েছিল তারাই এসেছে।"

বৃদ্ধ তার মাথা নাড়ল।

"তা হলে এই। আমাদের কত জনকে যে তারা এমনি করে মেরেছে। ছোট ছেলেরাও বাদ গেল না। ··· আর তুই, সাশা, এসবই মনে করে রাখিস, ভাল করে মনে রাখিস।"

ছেলেটি নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"তোর বাবা ও আর সকলে যখন ফিরে আসবেন—তাঁদের সব কিছু বলিস, সব কিছু, বুঝেছিস?"

"তুমি কি বলতে চাও দাদু, যে, তারা এ সব কিছুই জানে না?" স্ত্রীলোকটি শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল।

"অবশ্য তা জানে। নিজেদের চোখে তারা প্রচুর দেখেছে। কিন্তু তবু এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ···এর আগে, তোমার প্লাতোন অন্যের জন্যে প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু এখন থেকে নিতে হবে মিশার জন্যে, তার নিজের রক্তমাংসের জন্যে।

"তাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই," শান্তভাবে মাল্যুচিখা জবাব দিল।

"হাঁ, নিশ্চয়ই না, কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তবু, ছেলে—ছেলেই। আঠার সালে জার্মানরা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমার অনেক কথা মনে আছে, কিন্তু সে কথাটা সব চেয়ে স্বতন্ত্র। বুকের যত কাছাকাছি আঘাত লাগবে, আঘাতটা তত বেশি মারাত্মক হবে। শুধু আমিই পড়ে রইলাম বাসি রুটির ছিলকার মত—কারুর কোনও কাজে লাগি না। আজ যদি সে বেঁচে থাকত, তা হলে আমার ঘর আজ নাতি-নাতনীতে ভরে থাকত, একা একা ঘরে হাঁপিয়ে উঠতাম না।"

"ঠাকুর্দা, সারা গাঁয়ের লোকই ত তোমার নাতি-নাতনী, কেমন, তাই না?"

"হাঁ, হাঁ, একরকম তা-ই বটে, কিন্তু—কিন্তু নিজের রক্ত-মাংস—আলাদা।"

"চুপ! ওই শোন, তারা ঢ্যাঁড়া পিটোচ্ছে, মানে—সভা। ..."

মালুশ্চিখার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

"সভাটা নিশ্চয়ই মিশ্‌কার ব্যাপার নিয়েই।"

বৃদ্ধ তুড়ি মারল।

"হতে পারে মিশ্‌কার ব্যাপার, আবার অন্য কিছু হওয়াও বিচিত্র নয়। তাদের কাছে বিষয়ের অভাব নেই।"

ঢ্যাঁড়ার শব্দ তখনও চলেছে।

"আমরা সভায় যাব, নিশ্চয় যাব। নতুবা তারা এসে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি আসছ ত ঠাকুর্দা?"

"না গিয়ে উপায় কি? যেতেই হবে," য়েভদোকিম বলল, এবং উঠে লাঠির উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"আর দ্যাখ্‌, সাশা, তুই ঘরেই থাকিস্‌, বাইরে বেরোবিনে, বুঝলি? জিনাকে দেখিস। সভা হয়ে যাওয়া মাত্রই আমি চলে আসব।"

তারা ধীর মন্থর গতিতে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল, তখনও বাতাসের সঙ্গে বরফের কণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার দু ধারের কুটীরগুলির দরজা খুলে গেছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবতী একে একে বাইরে বেরিয়ে এল।

"কি ব্যাপার, কিছু জান?"

"কেমন করে জানব বল? তুমি যতটা জান, আমিও ততটাই জানি। ঢ্যাঁড়ার শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

"হা ভগবান, এবার আবার কি হবে?" একটি স্ত্রীলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল।

"ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করো না," ফেডোসিয়া ক্রাবচুক গম্ভীর স্বরে জবাব দিল। "কেন, কি বৃত্তান্ত কিছু জানবার আগেই হা-হুতাশ শুরু করে লাভ কি? ..."

"কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে বড় সুবিধার নয়।"

"ওদের কাছ থেকে কি তুমি কখনও ভাল কিছু প্রত্যাশা কর নাকি? ভাল! সব ব্যাপারে ওরা এত ভাল করেছে যে, ভাল ছাড়া আর কিছুই আশা করাই যায় না। ..."

"ঠিক।"

"কাজেই আঘাত পাওয়ার আগেই কেঁদে ওঠার কোন মানে হয় না। অবশ্য পরে কেঁদেও কোন লাভ নেই।" ফেডোসিয়া বলল।

কেউ কোন জবাব দিল না। তারা সকলেই ভাসিয়ার ব্যাপারটা জানে। ফেডোসিয়ার মুখের কোণে কেন ওই দুটো গভীর রেখা পড়েছে, তারা তাও জানে। সুতরাং এখন হা-হুতাশের যে সময় নয়, এ কথা বলবার অধিকার তার যথেষ্টই আছে—কেউ কখনও তাকে অভিযোগ করতে শোনে নি, যদিও আর সকলে যে যুক্তিতে সান্ত্বনা পেতে পারে তার পক্ষে সে যুক্তি খাটে না: আর সকলের স্বামী বা ছেলেরা সৈন্যদলে বা গ্যেরিলা দলে কাজ করছে, তারা হয় ত বেঁচে আছে, হয় ত তারা একসময়ে বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরে আসবে, তখন হয় ত রুশিয়ায় শেষ জার্মানটি নির্মূল হয়ে যাবে লাল পণ্টনের গুলির ঘায়ে।

চারদিকে ঘন অন্ধকার, বরফের ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে কালো মূর্তিগুলি একে একে আসতে লাগল। গ্রামবাসীরা চার দিক থেকেই ইস্কুল-বাড়ীতে গিয়ে জমায়েত হতে লাগল। এখনও তারা অভ্যাসবশেই একে ইস্কুল-বাড়ী বলে। বাড়ীটা বেশ বড়, তাতে অনেকগুলি কামরা, প্রত্যেক কামরায় বড় বড় জানলা, সিলিং খুব উঁচু, এবং প্রত্যেক ঘরেই সাদা টালির চুল্লী। ঘড়গুলি খুব প্রশস্ত এবং খোলামেলা। কিন্তু এখন আর এটা ইস্কুল-বাড়ী নয়। জার্মানরা বেঞ্চ ইত্যাদি টুক্‌রা টুক্‌রা করে জ্বালানী-রূপে ব্যবহার করেছে, দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলেছে, তাকের উপর যে সব জিনিসপত্র ছিল তাও ভেঙে দিয়েছে, ঘরে ঘরে যে সব ছবি ও প্রতিকৃতি টাঙানো ছিল তাও নষ্ট করে ফেলেছে, ঘরগুলি এখন খাঁ খাঁ করছে, চুল্লীতে আগুন নেই। আজ কাল এখানেই সভা হয়। এবারও গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এসে জমেছে।

মালাশা ভিশনিয়েভা একা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে মনে হয়, জনতার সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যেন তার ছায়া মাড়াতে রাজী নয়। দেয়ালের কাছে সে মৃতের মত পাংশু মুখে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এবং বিশেষ কোন দিকে তার নজর ছিল না। গায়ে মাথায় শাল জড়ানো, তার ভিতর থেকে থোবা থোবা কালো চুলের গোছা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সেগুলিকে বিন্যস্ত করবার চেষ্টাও সে করে নি।

ঘরের ভিতর যে একটি মঞ্চ ছিল, সেটি এখনও জার্মানদের হাতে বিনষ্ট হয় নি। তারই উপর একখানা ছোট টেবিল নিয়ে গাপলিক বসে আছে। পাশেই জার্মান সার্জেণ্ট অধিষ্ঠিত। সার্জেণ্ট বসে বসে হাই তুলছে এবং একটা উপেক্ষার সঙ্গে সভায় যারা উপস্থিত তাদের দিকে চেয়ে আছে।

"সকলে এসেছে ত?" গাপলিক পা দুটোকে কোন রকমে ঠেলে তুলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল। তার লম্বা লিক্‌লিকে দেহের উপর ততোধিক লম্বা গলার উপর টাক-পড়া মাথাটা যেন স্থির করে রাখতে পারছে না।

"হাঁ, সকলেই হাজির হয়েছে," কে একজন দরজার পাশ থেকে জবাব দিল।

মোড়ল তখন টেবিলের উপর থেকে খান কয়েক কাগজ হাতে তুলে নিল, কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে আবার টেবিলের উপরই রাখল। তার হাত-পা একটু একটু কাঁপছিল।

"টেকোর মনে ভয় ঢুকেছে রে," কে একজন জনতার মধ্যে থেকে চুপি চুপি বলে উঠল।

"ও হয় ত এমন কোন জঘন্য চাল চালতে চাইছে যা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ..."

"ভয় ও নিশ্চয়ই পেয়েছে; ও ঠিক জানে যে আমাদের ছেলেরা ফিরে এসে জ্যান্ত ওর গা থেকে চামড়া তুলে ফেলবে।"

"অর্থাৎ—আমরা যদি ওকে আগে থেকে পাই এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করি, তা হলেই ওর গাঁয়ের মোড়ল হওয়ার নেশা ছুটবে।"

"ওকে নিয়ে তোমরা কি করবে?" সমবায় খাঁমারের আস্তাবল-রক্ষক খোঁড়া বৃদ্ধ আলেকজেন্দার জিজ্ঞাসা করল।

"ভেবো না। কি করতে হবে আমরা জানি!" ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী ফ্রসিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

"চুপ করো, তোমরা সব চুপ করো! কি সব আলাপ চলছে তোমাদের! সভার কাজ শুরু হল!" জনতার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গাপলিক বলে উঠল।

"সভা আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণই ত দেখতে পাচ্ছিনে," য়েভদোকিম বিড় বিড় করে বললে।

"বিড় বিড় করে কি বলছ তুমি? স্বয়ং মোড়ল সভায় অনুগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছেন, তার প্রভু ও মনিবও এখানে উপস্থিত। আর কি চাও তোমরা?" প্রত্যুত্তরে কে একজন বলে উঠল।

"চুপ!" গাপলিক গর্জন করে উঠল, এ স্বর যেন তার নয়। "চুপ করবার জন্যে তোমাদের আর কত বার বলতে হবে, শুনি? ফিসফিসানি এখনই বন্ধ কর!"

"চুপ, মেয়েরা, চুপ করে থেকে ইনি কি প্রলাপ বকেন শোন," তেরপিলিখা বললে এবং সশব্দে নাকটা ঝাড়লে।

গাপলিক গলা পরিষ্কার করে পকেট থেকে লোহার-ফ্রেম চশমা বার করে নিয়ে নাকের উপর বসাল এবং চোখের সামনে কাগজগুলি ধরলে।

"ওঃ-হো। ..."

"উনি কাগজ পড়ে শোনাবেন! ..."

"জিনিসটা নতুন বটে।"

চশমার ভিতর দিয়ে মোড়ল জনতার উপর একবার চোখ দুটো বুলিয়ে নিল। ততক্ষণে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার গলা পরিষ্কার করল, তারপর তীব্রকণ্ঠে পড়া শুরু করল: "এই গ্রামের অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত তাদের দেয় খাজনা পরিশোধ করে নি—অবশ্য আমি খাদ্যশস্যের কথাই বলছি।—"

জনতার মধ্যে একটা কলগুঞ্জন উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার সব নীরব হয়ে গেল।

"এই ঘোষণাবাণী প্রচারের তিন দিন পরেই খাদ্যশস্য জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।—"

আবার গুঞ্জন শুরু হল।

"যে-কেউ তার দেশ ও জার্মান সৈন্যবাহিনীর প্রতি এই কর্তব্যে অবহেলা করবে, তাকেই ··· আইন ··· অনুসারে দায়ী ···"

গাপলিক থামল। চশমার ভিতর থেকে জনতার উপর বিজয়োল্লাসে একবার তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ নীরবতা এল তখন দেখা গেল, সকলেই উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে।

"কর্তৃপক্ষের আদেশ না-মানা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দায়ে অভিযুক্ত হবে! ···"

"আমরা ও সব জানি," একজন অস্বাভাবিক শান্তভাবে অবজ্ঞার স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

জার্মান সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে উঠে যে দিক থেকে কথাটা উঠেছে সে দিক পানে ঘাড় বাঁকিয়ে ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কিন্তু গ্রামবাসীরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের সকলের দৃষ্টিই মোড়লের দিকে নিবদ্ধ।

"··· অভিযুক্ত হবে," গাপলিক কণ্ঠ চড়িয়ে দিয়ে বলল, দ্বেষে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল, "··· এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।"

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, মুহূর্ত কয়েক থেমে রইল। তার আদেশের তারিখ, ক্যাপ্টেন ভের্নেরের দস্তখত ইত্যাদি সব পড়ে কাগজখানা ভাঁজ করে ফেলল।

"সকলে শুনতে পেয়েছ ত?"

"হাঁ সকলেই শুনেছি।" ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

"সকলে বুঝতে পেরেছ ত?"

"হাঁ, সকলেই বুঝতে পেরেছি, ভাল করেই বুঝেছি," মঞ্চের সম্মুখস্থ নিজের আসন থেকেই তেরপিলিখা জবাব দিল। "এর মধ্যে বোঝবার যেটুক আছে, আমরা সকলেই বুঝেছি।"

গাপলিক তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু সে নীরবে তার দিকে সোজা তাকিয়ে রইল, তার মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল।

"বেশ, তা হলে ত সবই ঠিক হয়ে গেল। ..."

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। এবং কেউ কেউ বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্মে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"কোথায় চললে সব ?"

"কেন, সভা কি শেষ হয় নি ?"

"না, আর একটা বিষয় এখনও বাকী আছে," গম্ভীর ভাবে মোড়ল জবাব দিল। মাল্যুচিখার বুকটা দপ্ দপ্ করতে লাগল। সে আতঙ্কে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল।

"ব্যাপারটা এই যে ..."

চাষীরা সকলেই সাগ্রহ প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"গত কল্য রাত্রিতে কে একজন গোপনে বন্দীকে রুটি দিতে চেষ্টা করে ..."

মাল্যুচিখা শক্ত করে চেচোরিখার হাতখানি ধরে ফেলল এবং সে তার মুখের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চাইল।

"কি হয়েছে তোমার ?"

"না, কিছুই না ..."

চেচোরিখার হাতখানা শক্ত মুঠোয় ধরে, নিশ্বাস নেওয়ার জন্মে সে হাঁপিয়ে উঠল।

"যে গোপনে রুটি দিতে চেষ্টা করেছিল তার বয়স প্রায় দশ বছর।"

জনতার মধ্যে একটা ফিস্‌ফিসানি শুরু হল। তারা পরস্পরের কানে কানে কথা বলাবলি ও দৃষ্টিবিনিময় করতে লাগল।

"চুপ করো! প্রায় বছর দশেকের ছেলে। তাকে গুলি করা হয়েছে।"

চেচোর মাল্যুচিখার মড়ার মত পাংশু মুখখানির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাড়াতাড়ি তার অপর হাতখানা দিয়ে আস্তে আস্তে তার হাতে চাপড় দিয়ে বলল :

"সইতে হবে বোন্! নইলে ও টের পেয়ে যাবে," মাল্যুচিখার কানে কানে বলল।

কিন্তু গাপলিক তাদের দিকে তাকায় নি। নাকিস্বরে সে পড়ে চলল :

"কোন অজ্ঞাতনামা লোক বা লোকেরা সেই ছেলেটার মৃত দেহ গায়েব করেছে। যদি কেউ ছেলেটার পরিচয়, যে বা যারা মৃত দেহ সরিয়েছে তাদের পরিচয় জানে তা হলে তা অবিলম্বে জার্মান কমাণ্ডাণ্টুরে খবর দিতে হবে—"

গাপলিক কাগজখানা তার চোখের সামনে তুলে ধরল এবং তার পার্শ্বোপবিষ্ট সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে কাশতে শুরু করে দিল। সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে উঠে সোজা জনতার মধ্যে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জনতা সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। সে পথ-প্রকোষ্ঠের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সেখানে সশস্ত্র সৈনিক মোতায়েন ছিল, সকলেই দেখতে পেল। রাইফেলের ডগায় বেয়নেটগুলো ঝকমক করছে। গ্রামবাসীরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ তাদের গুঞ্জন ও ফিসফিসানি থেমে গেল।

"... আইন ও শৃঙ্খলার খাতিরে এবং অপরাধীদের গ্রেফ্তারের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মান কমাণ্ডাণ্টুর আদেশ করছেন ..."

কৃষকেরা রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষায় রইল।

"যে, নিম্নলিখিত গ্রামবাসীদের জামিনদার হিসেবে গ্রেফ্তার করা হল ..."

সকলের মাথাই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। য়েভদোকিম ভাল করে শুনবার আশায় কানের পিছনে হাত রাখল।

"গ্রামের উক্ত সকল অধিবাসী : অল্‌গা পালাঞ্চুক ..."

দরজার সামনে একটি যুবতী দাঁড়িয়েছিল, সে চমকে উঠল। এমনই ভাবে সে হাঁ করে উঠল যে মনে হল সে এখনই চেঁচিয়ে উঠবে, কিন্তু কোন শব্দই করল না।

"য়েভদোকিম ওখাবকো। ..."

তার চার পাশে যেসব লোক দাঁড়িয়েছিল য়েভদোকিম তাদের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে রইল।

"কি ?"

"য়েভদোকিম ওখাবকো," জোর দিয়ে গাপলিক নামটা পুনরায় উচ্চারণ করল। এবং বলে চলল ঃ "অসিপ গ্রখাচ। …"

একঠেঙে জোয়ান একজন চাষী বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল।

"মারিয়া চেচোর …"

মাল্যুচিখা প্রতিবেশিনীর হাত ছেড়ে দিয়ে তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চাইল।

"ঠিক আছে, গালিয়া, এর জন্যে ভাবিস না। আমার বাচ্চাগুলোকে দেখিস," চেচোরিখা শান্তভাবে বলল।

"মালানিয়া ভিশনেভা। …"

মেয়েটি একটুও বিচলিত হল না, স্থির দৃষ্টিতে চেয়েই রইল।

সহসা মোড়লের মনে হল যে, খাদ্যশস্য আদায়ের জন্যেও এই সব জামিনদারকে লাগানো যেতে পারে। গুলি করে, ভালই। এমন হয় ত অনেকেই আছে যারা মরতে ভয় পায় না, কিন্তু তাই বলে কোন প্রতিবেশীর জীবন দিতে তারা প্রস্তুত নয়। আগেও সে এরকম দেখেছে। জার্মানদের কোন্ কাজে বাধা দেওয়া উচিত বা কোন্‌টা মেনে নেওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে সে বলে উঠল ঃ

"তিন দিনের মধ্যে যদি অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া না যায় বা ওই সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য দেওয়া না হয় তা হলে জামিনদারদের ফাঁসী দেওয়া হবে।"

জনতা অঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাদের মধ্যে অস্পষ্ট বিক্ষোভের গুঞ্জন শোনা গেল।

"এই ত সব, আমরা এখন যেতে পারি?" হঠাৎ ফেডোসিয়া ক্রাবচুক জিজ্ঞাসা করল।

জনতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এবং স্বস্তিবোধ করল।

"সভা শেষ হয়েছে। যাদের নাম পড়া হল, তারা ছাড়া আর সকলে চলে যেতে পার।"

একে একে কৃষকেরা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জামিনদার পাঁচজন আদেশের পূর্বেই টেবিলের সামনে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াল। গ্রামবাসীরা তাদের পাশ দিয়ে একে একে চলে গেল, কেউ কেউ মাথা নীচু করে, আর কেউ কেউ বা তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল।

একটু ক্ষণের মধ্যেই ইস্কুল-ঘরটি খালি হয়ে গেল, কিন্তু তারা একেবারে চলে গেল না। বরফবৃষ্টির মধ্যে তারা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। গাপলিক এবং সার্জেণ্টও বেরিয়ে এল; তাদের পিছনে একে একে জামিনদার পাঁচজন এগিয়ে গেল। সৈনিকেরা সঙ্গীন উঁচিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। মারিয়া চেচোর ও অল্গা পালাঞ্চুক পরস্পর হাত-ধরাধরি করে চলেছে। য়েভদোকিম প্রতিপদক্ষেপে লাঠিটা মাটীতে ঠুকতে ঠুকতে চলল। নীরব জনতার পাশ কাটিয়ে তারা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল। হঠাৎ মারিয়া চেচোর ফিরে দাঁড়াল।

"এর জন্যে দুঃখ করো না, ঠিক থেকো; বশ্যতা স্বীকার করো না! আমাদের জন্যে ভেবো না! স্থির থেকো!" সে স্পষ্ট করে কথাগুলি বলল।

যে সৈনিকটা পাশে পাশে যাচ্ছিল সে ওর বুকে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। ও প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু মাথা উঁচু করেই এগিয়ে চলল।

জনতা আস্তে আস্তে একটা বিষণ্ণ নীরবতায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। গাপলিক সার্জেণ্টের পাশাপাশি চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল। সার্জেণ্ট চলছে লম্বা পদক্ষেপে; তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে গাপলিককে দস্তুরমত দৌড়তে হচ্ছে। কিছুতেই সে সার্জেণ্টের পাশ থেকে পিছনে পড়তে রাজী নয়। এই গ্রামের মোড়ল হয়ে আসার পর এই সব প্রথম সে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘোষণা প্রচার করল। কৃষকদের মুখের ভাব মনে হতেই একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি তার মেরুদণ্ড ভেদ করে বয়ে গেল। তা ছাড়া, ক্যাপ্টেন ভের্নেরের আদেশও তার মনে আছে; তাতে ভয়ের কারণ যথেষ্টই রয়েছে। জার্মান ক্যাপ্টেন সকালেই তাকে শাসিয়েছে, চেষ্টা সার্থক না হলে ওর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। গ্রাম গ্রামই, গ্রামে বাস করে কতকগুলি বৃদ্ধ বৃদ্ধা, আর ছেলেমেয়ে। সুতরাং তাদের তত ভয় করবার কিছু নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন ভের্নের হচ্ছে জার্মান

কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং তার আদেশের সঙ্গে রাইফেল ও বেয়নেট এসে মিলিত হবে। গাপলিক প্রথমটায় কৌশলে এড়িয়ে যেত, কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে যে, আর এড়ানো চলবে না এবং এড়িয়ে যেতে চাইলে অনেক দুঃখ পেতে হবে। জার্মানরা যে দিন রস্তোভ থেকে পশ্চাদপসরণ করে সেই দিনের কথা তার মনে পড়ে, সেই অভিশপ্ত দিনেই সে জার্মানদের সঙ্গে যোগ দেয়। তার উচিত ছিল লুকিয়ে থাকা, দুদিন সবুর করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

কোন রকমে সে জীবিকার্জন করতে পারতই। সে-ই যে বাদার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে জার্মানদের নিজের গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে একথা যুদ্ধের সময় আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হত না।

'জার্মানরাই জয়ী হবে,' সে নিজেকে এই বলে আবার আশ্বাস দিল। কিন্তু সে যত দিন এই গ্রামে বাস করবে ততদিন এইটে ভেবে কোন মতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না যে, গ্রামে তিন শ ঘর অধিবাসী আছে, তারা প্রত্যেকেই তাকে তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করে এবং সেই তিন শ কুটীরের যে-কোনটিই তার হত্যাকারীকে আশ্রয় দিতে পারে এবং সুযোগ পেলে তাকে চিরজনমের মত শেষ করে দিতেও এতটুকু ইতস্তত করবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে কমাণ্ডাণ্টুরে প্রবেশ করল—সভার কার্য্য-বিবরণী পেশ করতে হবে।

কৃষকেরা একে একে যে-যার বাড়ী চলে গেল। মাল্যুচিখা ভয় পাওয়ার পর থেকেই এমন মৃতকল্প হয়ে পড়ল যে সে যেন বেঁচে নেই। পৃথিবীটা যেন তার পায়ের তলায় দুলছে এবং বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে।

সাশা চুল্লীর সামনে কতকগুলি কাঠের কুচো নিয়ে জিনার সঙ্গে বসে বসে খেলছে। ছেলেমেয়েদের খোলা মাথার দিকে সে একবার তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের যন্ত্রণা আরও তীব্রভাবে বেড়ে উঠল।

"ভালয় ভালয় ছিলে ত, জিনা কোন রকম গোলমাল করেনি ?"

"না, লক্ষীমেয়ের মতই ছিল। ... সভা শেষ হয়েছে?"

"হাঁ, শেষ হয়েছে। আমি এখনই একবার চেচোরদের বাড়ী যাচ্ছি, বেশি দেরী হবে না, এখনই ফিরে আসব। ..."

"কেন, তাদের বাড়ী যেতে হবে কেন?"

"জার্মানরা চেচোরিখাকে গ্রেফ্‌তার করেছে; তার ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে আসব," নির্জীবের মত বলল। সাশা খেলা থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল।

"গ্রেফ্‌তার করেছে? কেন?"

জার্মানদের কি এখনও চিনতে পার নি?" মা উদাসভাবে জবাব দিল; এবং বেরিয়ে গেল। একটু ক্ষণ পরেই মারিয়ার তিনটি শিশুকে নিয়ে ফিরে এল। বড়টির বয়স আট বছর, সাশারই বয়সী।

"মা, মা!" তিন বছরের নিনা তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল।

"কাঁদে না বাবা, মা এখনই আসবে," মাল্যুচিখা তাকে আশ্বাস দিল। "বসো এখানে; খেতে দিচ্ছি।"

চুল্লীর তলায় আলু লুকানো ছিল, সেখান থেকে গোটা কয়েক আলু নিয়ে বেশ ভাল করে ধুয়ে নেকড়ায় বেঁধে সিদ্ধ করতে দিল। এতটুকু নষ্ট করা চলবে না। কিন্তু আলু ও সামান্য রাইশস্য ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। খাদ্যশস্য আলু, শূয়োরের মাংস, মধু—সবই বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে এমন জায়গায় মাটির নীচে লুকানো আছে যে, তা সংগ্রহ করা এখন অসম্ভব, বরফ পড়ে পড়ে জায়গাটা বেশ ভাল করেই ঢেকে আছে।

"শুধু আলুই খেতে হবে, আর ত কিছু নেই বাছা। তারা যখন ফিরে আসবে, তখন রুটি তৈরি করব, তার আগে ত সম্ভব নয়।"

"কেবল আলু!" জিনা অসন্তোষ প্রকাশ করল।

মা তাকে ভর্ৎসনা করল।

"তার বেশি আর কি চাও? এখনও যে এই আলু পাচ্ছ, এ-ই ভাগ্য বলে মনে করো। ... ইচ্ছে মত খাবার কোথায় মিলবে বাবা!—"

বাচ্চা মেয়েটার দিকে ক্রোধভরে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, মেয়েটার হাত দুখানি অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গেছে, মুখের দু পাশে ছোট ছোট দুটি বলিরেখা পড়েছে। মায়ের মনে একটা অসহ বেদনা দেখা দিল।

"কেঁদো না, মা, কেঁদো না! ওরা ফিরে আসবে, নিশ্চয় ফিরে আসবে। তখন আর কোন অসুবিধা থাকবে না। রুটি তৈরী করে তাতে মধু দিয়ে তোমরা খাবে! কিন্তু এখন আলু নিয়েই খুশি থাকতে হবে।"

"নিশ্চয়, এ-ই যথেষ্ট," সাশা বুক ফুলিয়ে বলল। এবং জিনাও তাড়াতাড়ি দাদার কথার পিঠ পিঠ বলল, "হাঁ, এই যথেষ্ট। ..."

মাল্যুচিখা তখন চুল্লী ধরাল, ছেলেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ একটু কথাবার্তা কইল, কিন্তু মনের অস্বস্তি কোনমতেই চাপা দিতে পারছিল না। তার হাত থেকে জিনিসপত্র কেবলই পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, কি বলতে চায় তাও ভুলে যাচ্ছিল, জিনাকে খোসা-ছাড়ানো আলুর বদলে খোসাগুলো এগিয়ে দিল, এবং জল দিতে গিয়ে খানিকটা জল ফেললে। ছেলেরা আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

"মা, তোমার কি হয়েছে বল ত?" সাশা শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসল। ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে মা ভয় পেয়ে গেল।

"না, বাবা, কিছু না। কি আবার হবে?"

"মাথা ধরেছে?"

"মাথা ধরা? হাঁ, হাঁ, মাথাই ধরেছে।" এই অজুহাতটাই সে মেনে নিল। "হাঁ, আমার ভয়ংকর মাথা ধরেছে।"

"সভায় যে ভিড়, তাইতেই তোমার মাথাটা ধরেছে বোধ হয়," সাশা গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করে বসল।

"হাঁ, হয় ত তাই। গুমটেই মাথা ধরেছে। তাই হবে।"

ছেলেরা এই কৈফিয়ত মেনে নিয়ে যার যার মত চুপ করে গেল। মাল্যুচিখা বাসন ক'খানা ধুয়ে মুছে রেখে দিল।

ছেলেরা তখন চুল্লীর পাশে খেলা করছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে লাগল। তার হাত দুখানা ঠাণ্ডায় যেন জমে গেছে, আর বুকটা দুঃখে ফেটে পড়ছে।

তিনটি শিশু, তিন বছরের নিনা, পাঁচ বছরের অস্কা, আট বছরের সোনিয়া। কচি ছেলে। আর চেচোর নিজে লড়াই করছে। ওর উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে উঠল, ওকে যেন দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে মারছে, ওর বুকটা যেন চিবোচ্ছে। বার বার সে জানলার ধারে যায় ও বাইরে তাকিয়ে কি দেখে।

"কেউ আসবে নাকি ?"

"ন, বাবা, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু আমাকে ত এখন একবার বাইরে যেতে হবে। শীগগির ফিরে আসব!"

"তুমি খালি খালি বাইরেই যাবে," জিনা অনুযোগ করল, কান্নায় ফেটে পড়বার পূর্ব লক্ষণ।

"চু-প্! আমাকে যেতেই হবে। অবশ্য বেশি দেরী হবে না। বেড়াতে যাচ্ছি না," মাল্যুচিখা রাগের সঙ্গে বলল।

শুধু পাতলা একটা ব্লাউজ পরেই যেতে দেখে সাশা বলে উঠলঃ "মা, শালখানা গাঁয়ে দিয়ে নাও না।"

গ্রথাচ্দের বাড়ী অনেকটা পথ। ঝড়ের ঝাপটায় মাল্যুচিখার মুখে চোখে বরফের কণা এসে বিঁধছিল। বরফের আঘাতে তার গাল দুটো ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে সে হাঁপিয়ে উঠল এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে গ্রথাচ্দের বাড়ী গিয়ে পৌছল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, মনে মনে বলে উঠল যে, এরকম দম-বন্ধ অবস্থায় তাদের সামনে যাওয়া উচিত হবে না। আসল কথা, গ্রথাচ-পরিবারকে মুখ দেখাবার সাংঘাতিক মুহূর্তটাকে সে খানিকক্ষণের জন্যেও পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। গৃহিণী ও তার দুই কন্যা হয় ত খালি বাড়ীতে বসে বসে কাঁদছে, গ্রথাচের গলায় ফাঁসীর দড়ি এগিয়ে আসছে।

কিন্তু শুনল আঙিনায় কে করাত চালাচ্ছে, কেউ কাঁদছে না। ও বিস্মিত হল। আজকার দিনেও গ্রথাচদের বাড়ীতে কাজকর্ম চলতে পারে এ ধারণা ওর ছিল না।

গ্রখাচ-গৃহিণী ও তার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফ্রসিয়া করাত দিয়ে কাঠ ফাড়ছে। গ্রখাচের মেয়েটি দেখতে লম্বা, কালো কালো দুটি চোখ। গালিয়াকে আসতে দেখে তারা উভয়েই চমকে উঠল। কেন না, যে দিনকাল পড়েছে, কেউ কারুর বাড়ী বড় একটা যাওয়া-আসা করতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে বসে ভাবে, এর পর জার্মানরা কি করবে।

"তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে এলাম দিদি। ..."

"বেশ, ভাল কথা।" গ্রখাচ-গৃহিণী সোজা হয়ে দাঁড়াল। "এসো, ভিতরে এসো।"

ঘরের ভিতর গিয়ে মাল্যুচিখা দেখলে গ্রখাচদের ছোট মেয়ে জানলায় বসে কি-একটা সেলাই করছে।

"একটু গোপন কথা, কেউ থাকলে চলবে না। ..."

"বেশ, তাই হবে।" গ্রোখাচিখা অবাক হয়ে বলল। "যা ত মা লিদিয়া, বাইরে গিয়ে করাত চালা, আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

মেয়েটি সেলায়ের জামাটি ভাঁজ করে স্ঁচটা কাপড়ের উপর ফুঁড়ে রেখে নীরবে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে।

মাল্যুচিখা একখানি বেঞ্চিতে বসে হাত কচলাতে শুরু করে দিল। গ্রখাচ-গৃহিণী নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল।

বাইরে কি ভীষণ ঝড় বইছে!" অবশেষে সে বললে।

"হাঁ," মাল্যুচিখা জবাব দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার নীরব হয়ে গেল।

গ্রখাচের কোটটি দেওয়ালের একটি আংটায় টাঙানো রয়েছে। একটা পকেট ছেঁড়া, বুকে ও পিছনে তালি দেওয়া। একটা বোতাম তখনও সুতার সঙ্গে ঝুলছে। শ্রমিকদের কোট যেমন হয় তেমনিই।

"কি যেন বলতে চেয়েছিলে, কই, বলছ না ত?" গ্রখাচ-গৃহিণী শেষটায় বলে উঠল। মাল্যুচিখা তার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাল।

"তোমার স্বামীকে তারা গ্রেফ্তার করেছে," চুপি চুপি সে বলল।

অপর স্ত্রীলোকটি চোখ পাকাল।

"হাঁ, তারা তাকে গ্রেফ্‌তার করেছে। আমরা তাতে কি করতে পারি? আমাদের অদৃষ্টের লেখন্‌। হয় ত সে ফিরে আসবে। তুমি কি সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছ?"

"হাঁ, তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে।"

"এতে বলবার কি আছে? প্রথমে আমার বুকটা এমন ভাবে কেঁপে উঠেছিল যে, মনে হয়েছিল, আমি হয় ত ওখানেই হার্টফেল করে মারা যাব। তারপর বাড়ী ফিরে এসে ভেবে দেখলাম, কাজ নিয়ে থাকাটাই ভাল, আর তাতে নিজেকে ভুলে থাকাও সহজ। তাই, সঙ্গে সঙ্গে করাত নিয়ে ফ্রস্কার সাহায্যে কাঠ ফাড়তে লেগে গেলাম। মাথা খুঁড়ে মরলেও ত দেয়াল ভাঙতে পারব না—এবং বসে বসে কাঁদলেও কোন ফল হবে না। আজ উনি গেলেন—কাল আর কেউ যাবে। আর বেশি দিন ওরা থাকলে গ্রামে আর কেউ বেঁচে থাকবে না—এ তুমি নিশ্চয়ই জেনে রেখো। তারা আমাদের সকলকেই হত্যা করবে; তবে একে একে।"

হয় ত এরকমটা আর বেশি দিন চলবে না।"

"আমিও ত তাই বলছি—যদি চলে। কিন্তু তেমন কিছু হবে বলে ত এখনও জানা যায় নি। সামান্য শব্দ পেলেই আমার মনে হয় গুলি ছুঁড়ছে, হয় ত আমাদের ছেলেরা আসছে। কত দিন হল? এক মাস্‌। অথচ মনে হয় যেন এক বছর। আর কত লোক যে মরল! ··· মোড়ল যখন ওঁর নাম উচ্চারণ করে, তখন সে, আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি মনে মনে বললাম: আমায় হাঁ করে দেখছ, ভাবছ এখনই আমি কেঁদে চেঁচিয়ে উঠব। কিন্তু তুমি কখনও সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবে না, কখনও না! তোমার মত একটা খেঁকি কুত্তার বাচ্চার সামনে কখনও কাঁদব না। এমন সময় আসবে যখন তোমাকেই কাঁদতে হবে, কেঁদে বুক ভাসাতে হবে! আমরা—গ্রামের মেয়েরা—পেরেকের মত কঠিন; হাঁ, সত্যি লোহার মত শক্ত। তুমি আমাদের কিছুতেই হার মানাতে পারবে না। ···"

"দিদি!"

"কি, কি বলতে চাও বোন ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

মাল্যুচিখা উঠে দাঁড়াল এবং গ্রোখাচিখার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

"কি হচ্ছে ? তুমি কি পাগল হলে নাকি ? কি করছ ?"

"দিদি, কাল রাতে জার্মানরা যাকে গুলি করেছে সে আমাদের মিশ্‌কা ..."

"মিশ্‌কা ?"

"আমি রাত্রেই গিয়ে গর্তের ভেতর থেকে মৃতদেহ বাড়ী এনে কবর দিয়েছি। ... আমার জন্যেই তোমার স্বামী ও আর সকলে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছে। ..."

তার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছিল, তার পা দুটো যেন আর তাকে বইতে পারছিল না। কিন্তু সহসা সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিল। শেষ পর্যন্ত সব কথা বলতে পেরেছে। গ্রখাচ-গৃহিণী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

"একথা আমায় কেন তুমি শোনাচ্ছ ? অন্যে কেন একথা শুনবে ?"

মাল্যুচিখা তার কথা বুঝতে পারল না।

"কেন ! তোমার স্বামীকে গ্রেফ্‌তার করেছে। ... আমি জার্মান ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে সব বলব। তা হলে তারা ওদের ছেড়ে দেবে।"

গ্রোখাচিখা আঁতকে উঠল।

"তুমি কি সত্যই বদ্ধ পাগল হয়েছ ? বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে ? তুমি যাবে জার্মানদের কাছে ?"

"হাঁ, কি ঘটেছে, সব তাদের জানাতে। ... বলব—ওদের কোন দোষ নেই।"

"কিন্তু দোষ কি তোমারই আছে ? ছেলেটার মৃতদেহ তাদের হাতে তুলে দেবে ? কি বুদ্ধি তোমার ! হিতাহিতজ্ঞান কি একেবারে লোপ পেয়েছে ? এ হচ্ছে মোড়লের হাতে গিয়ে পড়া ! পাঁচ জনকে আটকে তারা তোমাদের সকলকে জালে ফেলতে চায়। এর ফল কি হবে ভেবে দেখেছ, নির্বোধ কোথাকার ? তুমি তাদের পথ দেখিয়ে ঘরে ঢোকাতে চাও, তারা যে এই

সুযোগে আমাদের পেয়ে বসবে। তুমি তাদের কাছে গিয়ে এ-কথা বললে, ফল এই হবে যে, আজ গ্রেফ্তার করেছে পাঁচজনকে, কাল করবে পঞ্চাশজনকে। এমন কথা কখনও শুনি নি। আজ পর্যন্ত আমাদের কোন লোক বশ্যতা স্বীকার করতে জার্মানদের কাছে যায় নি, আর তুমি কি না তাই করতে চাও? ...”

“কিন্তু ওঁরা ত আমার জন্যেই আজ বন্দী। আমার দোষেই ওঁরা ...”

“না, তোমার জন্যে নয়। কারণ, আমাদের দুর্ভাগ্য, কারণ, এই লড়াই, কারণ, জার্মানরা! তারা মিশকাকে হত্যা করেছে! এরা খুনে, এরা শিশুদেরও গুলি করতে সঙ্কোচ করছে না!”

মাল্যুচিখা বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

“তা হলে তুমি মনে কর ...”

“আমি কিছুই মনে করি নে! মনে করবারও কিছু নেই! তুমি বাড়ী চলে যাও বোন, আর কারুর কাছে কোন কথা বলো না। এখানে সকলেই অবশ্য আমাদের আপন লোক কিন্তু মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে লাভ কি? এসব কথা কারুরই জানার দরকার নেই। জিহ্বাই আমাদের পরম শত্রু। বাড়ী গিয়ে কাজকর্মে মন দাও, পাগলামি করো না।”

“কিন্তু, তোমার স্বামী!”

“মেয়েটার কথা শোন! বলি, সে আমার স্বামী, না তোমার? আমি যদি মুখ বুজে চুপ করে থাকতে পারি, তোমারও পারা উচিত নয় কি? যা হবার, হবে। তার অদৃষ্টে যদি এরকম মৃত্যু লেখা থাকে ত তারা তাকে খুন করবে। যদি অদৃষ্টে না থাকে ত সে বাঁচবে। আর অদৃষ্টে যদি এই লেখা থাকে যে, জার্মানদের অধীনেই থাকতে হবে, তা হলে যত শীঘ্র মরি, ততই মঙ্গল। ...”

“জার্মানদের অধীনে আমরা চিরদিন থাকব না।”

“দেখ বোন, আমি যদি তা মনে না করতাম ত একমুহূর্তও অপেক্ষা করতাম না—গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তাম! কিন্তু একটা কথা বুঝি যে, এখন

আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু তাদের পালাও আসছে; তখন তারা তাদের অদৃষ্ট ভোগ করবে।”

গ্রোখাচিখার মুখখানা উজ্জল ও চোখ দুটি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মাল্যুচিখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

“তুমি আমার সব গুলিয়ে দিলে। ...”

“আমার মনে হয়, অনেক দিন আগেই তোমার সব গুলিয়ে গেছে। ... তোমার ঈশ্বরদত্ত বিবেক আছে বটে, কিন্তু ধারণাগুলি অত্যন্ত নির্বোধের মত। তোমার নিজের কথাই শুধু ভেবো না, আর সকলের কথাও ভেবো। সকলের কথা ভাবলে ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাবে, তোমার কিছু বলার অধিকার নেই। নিজের জন্যে তোমার পক্ষে জার্মানদের ফাঁদে ধরা দেওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই! তারা আমদের কিছু করতে পারবে না। অত্যাচারই করুক, ফাঁসীই দিক, আর গুলি করেই মারুক। ... একজন দুজন মরবে, কিন্তু সকলকে ত মারতে পারবে না। ... যত দিন না আমাদের ছেলেরা ফিরে আসে তত দিন প্রাণপণে তোমাকে সবুর করতে হবে। ...”

মাল্যুচিখা অর্থহীন ভাবে মাথা নাড়ল। একটা দুর্বলতা তাকে প্রবল ভাবে পেয়ে বসল, তার সকল শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। সে বসতে চায়, সোজা মেঝের উপর বসে প্রাণ ভরে কাঁদতে চায়! সে মিশুৎকার জন্যে কাঁদতে চায়, গ্রখাচের জন্য কাঁদতে চায়, আর কাঁদতে চায় মারিয়ার বাচ্চা তিনটির জন্যে—সাশার হেপাজাতে যাদের ঘরে রেখে এখানে চলে এসেছে! কাঁদতে চায় ভাসিয়া ক্রাব্চুকের জন্যে, যে খাদের মধ্যে বরফে শুয়ে আছে। কাঁদতে চায় তরুণ পাশচুকের জন্যে, যাকে গুলি করে মেরে খাদের পাশে ফেলে রেখেছে। কাঁদতে চায় সেই ছেলেটির জন্যে, যাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রেখেছে। কাঁদতে চায় গোটা গ্রামখানির জন্যে; আর কাঁদতে চায় তাদের জন্যে যারা গ্রামের জন্যে লড়াই করেছে,—যারা নিরুপায় হয়ে হটে গিয়েছে। আজ এক মাস হয়ে গেল, তাদের আর দেখা গেল না।

"শোন, নিজের হাতে রাশ টেনে ধরে থেকো, নইলে সকল কাজেরই অযোগ্য হয়ে পড়বে," গ্রোখাচিখা পরখ করবার জন্যে বললে।

মাল্যুচিখা নীরবে বিদায় নিয়ে চলে এল। লিদা ও ফ্রসিয়ার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে সে মনকে রাজী করাতে পারল না; তারা দু বোনে তখন আঙিনায় দাঁড়িয়ে কাঠ ফাড়ছিল। গ্রোখাচ-গৃহিণীর ভৎর্সনা তখনও যেন তার কানে ধ্বনিত হচ্ছিল। গ্রামসুদ্ধ সকলেই গ্রোখাচিখার এই পরিচয় জানে যে, সকলকেই উচিত কথা বলতে এবং কলহ-বিবাদ করতে সে অভ্যস্ত। তার মুখ থেকে কেউ কখনও একটা মিষ্টি কথা শুনতে পায় নি। তার স্বভাবই ওরকম। আর আজ কি পরিবর্তনই না হয়েছে তার! ···

বাড়ীতে তখন সাশা ছেলেদের নিয়ে খড়কুটোর একটা খেলাঘর বানাতে ব্যস্ত: এখানে আঙিনা,—সেখানে গোয়ালঘর, এটা আস্তাবল, আর ওটা কি? ··· কান্না থামিয়ে খেলায় যোগ দিয়ে নিনা সাগ্রহে সব কিছু লক্ষ্য করছে।

"কিন্তু এখানটায় কি রাখবে?"

"এখানে থাকবে ভেড়ার পাল, নতুন ভেড়াগুলি।"

"বেশ।"

"আমাকে একটা কাঠকয়লা দাও। ভেড়াগুলি হবে কালো: আরও গোটা কয়েক দাও, অনেকগুলি ভেড়া থাকবে। ···"

"বেরালটা কোথায়?" নিনা জানতে চাইল।

"বেরাল বাইরে চলে গেছে, তারা সব সময়ই বাইরে থাকে," জিনা তাকে বুঝিয়ে দিল, নিনা তার কৈফিয়তে খুশি হয়ে গেল।

"জার্মানরা আসছে। পশুগুলিকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" অসিয়া খাঁটি বিষয়ী লোকের মত ভারিক্কি চালে আদেশ জারি করল।

"বেশ, কিন্তু তাদের খেদিয়ে নেবে কে, শুনি?"

"কেন; আমি।" নিনা স্বেচ্ছায় কাজটা নিল।

"আমি কিন্তু গ্যেরিলাদের সঙ্গে থাকব," অসিয়া স্থির করল। "এখন এসো আগে ভেড়ার পাল খেদিয়ে নিয়ে যাই।"

তারা কাঠের কুচি সরিয়ে নিয়ে রাখল, কেন না, সেটা হল সদর দরজা, আর সমবায় খামারের সমগ্র সম্পত্তি—ফেঁকড়ি ও কাঠ কয়লাগুলি—খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

"তা ত হল, কিন্তু ভেড়াগুলি কোথায় নিয়ে যাব?

"কেন, ভিতরের দিকে," গম্ভীরভাবে সাশা উত্তর দিল। "নদীর ধারে নিয়ে রাখব। আমাদের লোকেরা জার্মানদের নদী পার হতে দেবে না।"

"কিন্তু তারা ত নদীতে বোমা ফেলতে পারে," অসিয়া বলল।

"তাতে কিছু যায় আসে না, রাত্রিবেলা আমরা পার হব," সাশা জবাব দিল। "আমাকে ওই তক্তার টুকরোটা দাও, ওটা হবে নদী।"

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। পাঁচ জোড়া চোখ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। সাশা নড়া চড়া করতেও পারল না।

দরজায় একজন জার্মান সৈন্য দাঁড়িয়ে। রক্তাভ চোখে ছেলেদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে—মাথায় কতকগুলি ছেঁড়া নেকড়া জড়ানো। তার সারা গায়ে বরফ। ঘরের চারিদিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, বয়স্ক কাউকেই দেখতে না পেয়ে যেখানে স্টোভের ধারে ছেলেরা খেলছিল সেখানে এসে উপস্থিত হল। প্রথমটা সাশা তার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি। তার ধারণা হয়েছিল যে, সে মিশার খোঁজেই এসেছে, জার্মানরা সব কিছু জেনে ফেলেছে, মাকে তারা আটক করেছে এবং এ লোকটা এসেছে মিশার খবর নিতে, এখনই কবর খুঁড়তে শুরু করবে। মিশা জার্মান সৈনিকের ভুল উচ্চারিত রুশ শব্দ প্রথমটা বুঝতে পারে নি, ফলে সৈনিককে বার কয়েকই তার বক্তব্য পুনরুক্তি করতে হল। সে বলছিল:

"দুধ, দুধ! ..."

"আমাদের দুধ নেই," সাশা জড়িত স্বরে জবাব দিল।

কিন্তু সৈনিকটা জেদ করতে লাগল।

দুধ, দুধ দাও। ..."

সাশা উঠে বাইরে চলে গেল, এবং একমুহূর্তের জন্যও সৈনিকের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালো না। দালান পার হতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেল যে, সে তার দাদার কবরের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, এইখানেই ত তার দাদা মিশকা চির-নিদ্রায় শুয়ে আছে। সৈনিক তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। সাশা গোয়ালের দরজা খুলে হাত-মুখের ইশারা করে তাকে বুঝিয়ে দিল যে, সেখানে কিছুই নেই। আর সত্যি, জার্মানরা যেদিন প্রথম এখানে আসে সেই দিনই তাদের গরুটাকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে কমাণ্ডেণ্টের বাড়ীর সামনে জবাই করেছে।

খালি গোয়ালের দিকে সৈনিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মেঝেয় কিছু খড় ও গোবর তখনও পড়ে ছিল, তার থেকে ওটা যে গোয়াল ঘর তা বোঝা যায়, কিন্তু গরুর জাবনার তাগাড়িটা শূন্য পড়ে আছে। এ সব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এখানে সত্যসত্যই দুধ পাওয়া যাবে না।

এদিকে জিনা ভয়ে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। মা বাড়ীতে নেই, সাশা জার্মানটাকে নিয়ে গোয়ালঘরে গেল, কাজেই সে ভয় পেল। নিনা কাঁদবার সুযোগের প্রতীক্ষাই করছিল, সুযোগ পেয়ে সেও জিনার অনুসরণ করল।

সৈনিক আবার ঘরে ফিরে এল এবং ছেলেদের দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসি হাসল।

"কেঁদো না," জার্মান ভাষায় বলল, সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষয়ে যাওয়া কালো দাঁতগুলি বের হয়ে পড়ল।

জিনা ভয়ে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল। জার্মানটা তার রাইফেল জিনার দিকে তাক করল। নিরুপায় সাশা লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল এবং বোনকে আড়াল করে দাঁড়াল। দুহাত উঁচু করে করে তুলে সে জার্মানটার ঘেয়ো রক্তাভ চোখ দুটোর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। জার্মানটাও ছেঁড়া নেকড়ার পটিবাঁধা মাথার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"হো-হো," সৈনিকটা দাঁত বের করে হাসতে লাগল এবং রাইফেলের নলের মুখটা এবার নিনার দিকে ঘুরিয়ে ধরল। কি হচ্ছে, ছেলেমানুষ নিনা বুঝতে

পারল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কান্না থামাল এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটার দিকে চোখ পাকিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। অবশ্য সেও এটা বুঝেছিল যে লোকটা জার্মান।

"গুলি করব," সৈনিকটা বলল। নিনা তার কথা বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা সে বুঝতে পেরেছে যে, তার কথাগুলি সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়। ইতিমধ্যে জিনাও চুপ করেছে। সাশা রাইফেলের মুখটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল।

রাইফেলের কালো মুখটা খুব উঁচুতে ছিল না। এমনভাবে তাক করছিল যে, প্রথমে একটি ছোট্ট মাথা এবং পরে আর একটিকে যেন লক্ষ্য করা হয়েছে।

হঠাৎ সাশার মাথায় একটা মতলব এল ঃ লাফ দিয়ে গিয়ে রাইফেলটা ধরলে হয়! কিন্তু সৈনিকের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবে? কেমন করে গুলি ছুঁড়বে? জার্মানটাকে খুন করার পর কি হবে? আর সব চেয়ে বড় কথা, ও কি সৈনিকটার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিতে পারবে?

জার্মানটা তখনও দাঁত বের করে হাসছিল। খেলাটা তার কাছে মন্দ লাগছিল না। ছেলেরা সকলে ভয় পেয়ে গেছে, তাদের চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাশে, সব চেয়ে বড়টির মুখের অসচ্ছন্দতাও তার নজরে পড়ল। একটুক্ষণের মধ্যেই সাশা বুঝতে পারল যে, সৈনিক তাদের নিয়ে কৌতুক করছে। ইঁদুরের সঙ্গে বেরালেরা যেমন কৌতুক করে থাকে, সৈনিকও ছেলেদের সঙ্গে সেই রকম করছে। হাঁ সত্যিই, ও ওদের সঙ্গে কৌতুক করছে। রাইফেলের কালো মুখটা দেখতে দেখতে খাড়া হয়েই আবার নীচের দিকে নামল। সাশা মনে মনে কামনা করছিল যে, সৈনিক গুলি ছুঁড়ুক। যত তাড়াতাড়ি ছোঁড়ে ততই ভাল, এ দৃশ্য আর সহ্য হয় না।

তার মনে হল, জার্মানটা সর্বাগ্রে তাকেই গুলি করবে, কেন না, সে-ই সকলের বড়। রাইফেলের নলের দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ও তাড়াতাড়ি গুলি ছুঁড়ুক। শেষ করে দিক।

অবশেষে খেলায় সৈনিকের শ্রান্তি এল এবং তাড়াতাড়ি রাইফেলটা কাঁধে ফেলে আর একটিবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে চলে গেল। ছেলেরা এক

জায়গাতেই যে যেমন ছিল তেমনি ভাবে রইল, এবং তাদের সকলের দৃষ্টিই দরজার দিকে নিবদ্ধ। সাশা অপেক্ষা করল—হয় ত জার্মানটা দরজার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে আছে, হয় ত সে অপেক্ষা করছে, যেই তারা নড়াচড়া করবে অমনি দরজা খুলে গুলি ছুঁড়বে। এমন কি, ইঁদুরের মতই চুপচাপ রইল। তারা পায়ের শব্দ শুনতে পেল, এবার আরও কাছে। দরজা খুলে মা এসে উপস্থিত হল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মনের সমস্ত রুদ্ধ আবেগ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। জিনা প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল। নিনা কাঁদতে শুরু করে দিল এবং অসিয়া ও সোনিয়াও কান্না জুড়ে দিল। একমাত্র সাশা মায়ের সামনে নীরবে গিয়ে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে বাবা? হল কি তোদের?" ভয়ার্ত হয়ে মা জিজ্ঞাসা করল।

"বিশেষ কিছুই না, একটা জার্মান এসেছিল," সাশা জবাব দিল।

"জার্মান? কি চায়?"

"কিছু না। দুধ চাইতে এসেছিল।"

"তারপর কি হল?"

"আমি দেখিয়ে দিলাম যে, আমাদের গরু নেই।"

"তারপর সে চলে গেল?

"হাঁ।"

"তা হলে, তোরা এত চেঁচাচ্ছিলি কেন?" রাগত স্বরে সে শুধাল। "সে ত চলেই গেছে, আর চেঁচানো কেন? তোদের মেরেছে?"

"না। মারে নি," সাশা মুখ ভার করে জবাব দিল। তবে তার মনের উত্তেজনা তখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। মাল্যুচিখা শালের উপর যে বরফের কণাগুলি পড়েছিল তাই সুদ্ধ ঘরে না এসে দালানে গিয়ে ঝেড়ে ফেলল।

"কি দুর্যোগ চলেছে! থামবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ..."

দূর থেকে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল।

"ও কি?"

"কিছুই না। ...ওলেনার প্রসব হচ্ছে," মাল্যুচিখা চোখ পাকিয়ে বলল।

ছেলেরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। খামার বাড়ীর দিক থেকে একটা চাপা কাতরানি শোনা গেল। কখনও জোরে, কখনও আস্তে, পরক্ষণেই তা থেমে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার নতুন করে শুরু হল।

৪

জার্মানদের আটক-ঘরটা কমাণ্ডাণ্টুরের ঠিক পিছন দিকে। চারদিকে চারটি দেয়াল আর মাটীর মেঝে। এক সময় এখানে বইয়ের আলমারি, টেবিল, তাক, তাতে গ্রাম্য সোভিয়েট ও সমবায় খামারের কাগজপত্র, বই—কত কি ছিল।

পুরানো ঘরের দেয়াল তৈরী হয়েছিল মোটা মোটা কাঠের কুঁদো দিয়ে। জার্মানরা তক্তা দিয়ে জানলাগুলি সব ঢেকে দিয়েছে, ফলে ঘরটা অন্ধকার হয়ে পড়েছে। দরজার ফাটল দিয়েই একমাত্র আলো আসে—সে আলোও আসে আবার সান্ত্রীদের ঘরের আলো থেকে। গ্রামের যে পাঁচ জনকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে তাদের এনে এখানেই রাখা হয়েছে। দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল—একবার, দুবার,—তারা সেইখানেই রয়ে গেল। চারিদিকে দেয়াল, ঘরখানি আঁধারে ডুবে গেল। ঘরে টুলও নেই, বেঞ্চও নেই। অন্ধকারে ক্রমশ চোখ অভ্যস্ত হয়ে এল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সেই মেঝেতেই যে যার মত বসে পড়ল। গ্রথাচ হাতের উপর মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু করল।

কিন্তু আর কেউ অবশ্য ঘুমোতে পারল না। অলগা পালাঞ্চুক চেচোরিখার গা ঘেঁষে বসল। তার ভয় হচ্ছিল। ঘরটাকেই তার ভয়, অন্ধকারকে ভয়, দরজার বাইরে যে আলো আছে তাকে ভয়। কি হবে তাই তার ভাবনা। চেচোরিখা দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। এবং তারা উভয়ে উভয়কে অবলম্বন করে বসল।

একমাত্র মালাশাই কারুর গা ঘেঁষে বসে নি, হাঁটু দুটো দু হাতে জাপটে ধরে সে এক কোণে বসে ছিল, অবশ্য দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সে চোখ দুটো মেলে

অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। তার সঙ্গে আর যারা বন্দী, তারা যা ভাবছিল, তার ভাবনা তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। নিস্পন্দ হয়ে, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শ্বাস রুদ্ধ করে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল। পাশের ঘর থেকে যে অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল, তা কি, জানবার আগ্রহও সে করল না, অথবা, ঘরের বাইরে—গ্রামে কিসের শব্দ হচ্ছে তা শুনবার আগ্রহও তার ছিল না। ভুরু কুচকে সেখানে বসে সে নিজের ভিতর থেকেই কি যেন একটা শুনবার চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে—না, বেশি, দশ দিন। কিন্তু কিছুই হল না। … ক্রমাগত একটা প্রশ্নই ঘুরে ঘুরে মনে হয়ে তাকে পীড়িত করতে লাগল ঃ হাঁ, না,—না ? হাঁ,—না ? সমস্ত রক্ত মাথায় এসে জমা হয়েছে। বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন দেহের রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এবং শিরাগুলিতে কে যেন ছোট হতুড়ি পিটোচ্ছে। কেমন করে বুঝতে পারবে, কি করে নিশ্চিত জানবে ?

আর একবার সে দিনগুলি গুণল। হয় ত সে ভুল করেছে। কিন্তু, না, বার বারই দশ দিন, সেই একই দশ দিন। এবং কারণও আছে যথেষ্ট … দশ দিন। … কিন্তু সে বেশিক্ষণ এ চিন্তা নিয়ে থাকতে পারছিল না, তন্ন তন্ন করে আতি-পাতি করেছে, আজ পর্যন্ত প্রতিদিনের কথা পুনরালোচনা করেছে এবং সেই দিনটিই তার জীবনকে দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। সেদিনটির কথা মনে হতেই মালাশা একটা তীক্ষ্ণ দৈহিক বেদনা অনুভব করল। এত জোরে সে হাত মুঠো করল যে, নখগুলো তেলোতে বসে গেল, হাঁটু দুটো বুকের উপর গুটিয়ে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসল। একটা অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা যেন তার মজ্জায় মজ্জায় আঘাত করছে। মনে হল, সে আর সইতে পারছে না, হয় ত হঠাৎ কখন বন্য জন্তুর মত চীৎকার করে উঠবে। ইচ্ছে করে, মাথার চুলগুলো টেনে সব ছিঁড়ে ফেলে। ও নিজের চীৎকারে নিজেরই দম বন্ধ করে ফেলতে চায়। সব কিছু একটা গণ্ডগোলে ডুবিয়ে দিতে চায়—সব কিছু ঃ সেদিনের স্মৃতি, এই দশ দিনের অবিরাম গণনা, পুনর্গণনা এবং তার একই ফল।

যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ আলোড়িত হতে লাগল। ও ঠিক জানে, এ রকম যন্ত্রণা আর বরদাস্ত করতে পারবে না। হয় ত সেখানেই পড়ে মরে থাকবে। কিন্তু মরণ এল না। মরণ অত সহজ নয়। ওকে সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও বাদ না দিয়ে স্মরণ করতে হবে যে, ও—মালাশা, একটা পাপিষ্ঠা, জাতিচ্যুতা। চিরকালের জন্যে—আর সকলের থেকে, গ্রামের থেকে ও পৃথক হয়ে গেল, এমন কি, যে-জীবন ও এর আগে পর্যন্ত যাপন করেছ এখনকারটা তার চেয়েও স্বতন্ত্র। এবং কেন? কেন এমনটা হল? গ্রামের আরও ত মেয়ে ছিল, তাদের কারুর কিছু না হয়ে ওরই বা হল কেন?

অন্ধকারের দিকে ওর দৃষ্টি ছিল না, ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই তিনটা মুখ—যে তিনটা বীভৎস কুৎসিত মুখ ওর পানে ঝুঁকে পড়েছিল। ওর স্মরণে চিরকালের মত জ্বল জ্বল করবে—যেন ফটোগ্রাফ। অনন্ত কাল ধরে তারা ওর চোখের সামনে ভেসে থাকবে, কোন মতেই স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা বা ঢেকে ফেলা যাবে না। তিনটা মুখ, দাড়ি-গোঁফ কামানো হয় নি, শূয়োরের কুঁচির মত খোঁচা খোঁচা লাল গোঁফ-দাড়ি, দাঁতগুলি ক্ষুদ্র ঠোঁটের ফাঁকে দেখাচ্ছে যেন পশুর দাঁতের মত, চোখে তাদের বর্বরতা।

মাস কয়েক আগেও সেই ঘরেই ও ইভানের সঙ্গে বাস করেছে। সেই একই ঘর, একই বিছানা। কিন্তু সেই রাত্রিতে তার বালিশের পালকগুলি ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছিল, মেঝেতে খড়কুটো ছড়ানো, চিত্রিত ফুলদানি জানলা থেকে স্থানচ্যুত এবং সুগন্ধ গোলাপও জার্মান সৈন্যের বুটের চাপে ম্লান। ও আর ভাবতে চায় না, ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায়, কিন্তু না ভেবেও পারে না। যেন জোর করে ওকে ভাবায়, এক মুহূর্তও না ভেবে পারে না। তারা তিন জন। তিন জনের মুখে খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ঘরে ঢুকে তারা চেঁচাতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে তার দেহটা জাপটে হাত দুটোকে চেপে ধরল। তারপর ওর অসাড় দেহটা ফেলে রেখে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তারা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধূমল বাষ্পে ঘরটা ছেয়ে গেল। তারপর

থেকেই এ অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। আরও অসহ্য এই দশটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং বিনিদ্র রাত্রি ও নিজের দেহের বিপর্যয় মন দিয়ে শুনেছে এবং একটির পর একটি করে দিন গুণে আজ উন্মত্ততার সীমায় এসে পৌঁচেছে। প্রতি দিন একটি করে দিন বেড়ে বেড়ে আজ দশটি দিনে এসে পৌঁচেছে। একটি, আর একটি—এমনি করে একদিন তার গোণার শেষে এসে পৌঁছবে, যেদিন মালাশা, লাল পল্টনের স্ত্রী মালাশা একটা জার্মান বর্ণসঙ্করকে প্রসব করবে।

তবু কান পেতে শোনে। রক্তের প্রবাহ ওর হাতের কব্জিতে, কপালে মুহুর্মুহু হাতুড়ির আঘাত করে। পেটে হাত দিয়ে দেখে, সেখানেও যেন অমনি হাতুড়ি মেরে রক্তস্রোত বইছে। বিজাতীয় ঘৃণায় সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। ওর এই দেহ হয়ে উঠেছে একটা জার্মানের আবাস, এখন হয় ত তার অস্তিত্ব নাই, এর আগেও হয় ত ছিল না, তবু সে জার্মান যেন সর্বাঙ্গ জুড়ে বসেছে। ও যা খাবে তা নিজে খাবে না, ওর ভিতরে বসে খাবে সেই জার্মানটা। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে, বড় হবে।—হয়ে ওরই দুর্ভাগ্যের উপর লাঞ্ছনার তিলক পরিয়ে দেবে। ও যদি ঘুমোয় তাতে ওর নিজের দেহ আর সবল হবে না, কারণ সে বিশ্রাম ওর বিশ্রাম নয়—ওর ভিতরে থেকে বিশ্রাম করবে সে জার্মানটা। তাকে ও আর আজ সন্তান বলে ভাবতে পারে না। ও সেই ওলেনার ছেলে নয়, যার কান্না মাঝে মাঝে ওই অবরুদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে শোনা যায়। ওই যে অজানা ছেলেটাকে ওরা গুলি করে মেরেছে—চেচোরিখা আর মাল্যুকদর ছেলে, যারা এ গ্রামে জন্মেছে এবং স্বদেশের জন্যেই জার্মানদের হাতে প্রাণ দেবে, তাদের মত কোন সন্তান নয়। এরাই হল ছেলে। মাথায় সুন্দর কালো কালো চুল, চঞ্চল কালো চোখের তারা,—কখনও কাঁদে কখনও হাসিখুশি। দোলনায় শুয়ে খেলা করে। মায়েরা তাদের সত্যই গর্ভে ধারণ করেছে, জন্মের পর লালন পালন করে বড় করেছে। আর ও যাকে প্রসব করবে সে সন্তান নয়—একটা জার্মান-কুকুরের বাচ্চা। অথচ যা ঘটেছে তা পরিবর্তন করবার কোন উপায়ই নেই—ভাবতে গিয়ে মালাশা শিউরে ওঠে। যদি সেটা মরেও যায়, এমন কি, ও নিজেও যদি তাকে গলা টিপে মারে, তবু কোন ফল হবে না। চিরদিনের

জন্যে লোকে ওকে ঘৃণা করবে, বলবে—ও একটা জার্মান-বাচ্চা পেটে ধরেছিল, দেহের রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করেছিল। লোকে বড় পেটটার দিকে চেয়ে থাকবে। সবাই ওকে পথ ছেড়ে দেবে—সেটা গর্ভবতী নারীকে সহজে পথ চলবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে নয়, ওর প্রতি দারুণ ঘৃণায়—পাছে ওর গায়ের ছোঁয়া লাগে ; ও হয়েছে জার্মানের শয্যাসঙ্গিনী, একটা জার্মানকে গর্ভে ধারণ করছে।

গ্রামের সকলেই অবশ্য এ কথা জানে। সকলেই ওর জন্যে দুঃখিত, তারা সকলেই জার্মানদের অভিশাপ দেয় এবং একদিন যে সব কিছুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে সে কথাও তারা বলাবলি করে। কিন্তু মালাশা জানে, এর প্রতিশোধ নেওয়া আর সবের মত তত সহজ নয়। প্রত্যেকটি অন্যায়েরই প্রতিশোধ নেওয়া হবে, পাশ্‌চুক লেভন্যুক এবং ওলেনা, বিনষ্ট গৃহ, নিহত বালকের—সব কিছুরই প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু ওর ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে কেউ কখনও পারবে না। এ এমন একটা বস্তু যার প্রতীকার করা যাবে না। কেউ মুখ ফুটে না বললেও ও দেখেছে যে অন্যান্য মেয়েরা ওর দিকে চেয়ে দেখে না পর্যন্ত, লোকেরা তাকে একটা প্লেগের রোগী মনে করে এড়িয়ে চলে। সেদিন ওই তিনটা লোক যখন জোর করে ওর ঘরে প্রবেশ করে তখনই গ্রাম আর ওর মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে উঠল। সাধারণত তাদের হাতে যারা পড়ে তাদের তারা গুলি করে মারে, কিন্তু সেদিন তারা ওর পবিত্রতা নষ্ট করেও ওকে গুলি করে নি। সারা জীবন গ্লানি ভোগ করবার জন্যেই জীবিতদের সঙ্গে ওকে বেঁচে থাকতে হবে। যেন এ সব কিছুই যথেষ্ট নয়, তারা যে ওর অমর্যাদা করেছে, এটাই যেন যথেষ্ট নয়, ওকে একটা ছেঁড়া নেকড়ায় পরিণত করেছে, তাই আজ ও কেবলই দিন গুণে চলেছে, দিনগুলির সমষ্টি বার বার একই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ও হতাশার মধ্যে দিয়ে আশার মরীচিকা দেখতে পায়, একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আলেয়ার পিছনে ছুটে চলে, একবার ওর মনে হয়েছে হয় ত ভুল করছে, হয় ত তা সত্য নয়, অনেক সময়ই ত এরকম হয়, তাই বলেই যে কিছু হয়েছে তার কোন মানে হয় না, দু-একদিন সবুর করেলেই হয়ত সব কিছু ঠিক হয়ে

যাবে। কিন্তু সব কিছুই বৃথা, অন্তরের অন্তস্তল থেকে জেনেছে যে সত্য সত্যই ও গর্ভবতী এবং কিছুতেই তার পরিবর্তন হতে পারে না।

একটি গ্রীষ্মকালের কথা ওর মনে পড়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্মকাল—গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার সুগন্ধ। শিশিরসিক্ত রূপালী রাত্রিগুলি! ঘাসগুলো মানুষের কোমর পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে। নদীতীরে ঘাসুড়িয়ারা তাঁবু ফেলেছে। সারা রাত্রি তারা সেখানেই থাকে। চারিদিকে ঘাসফুলের সুগন্ধ, আকাশে উজ্জ্বল তারা, বাইরে পাগলা বাতাসের লুটোপুটি। তারই মাঝখানে তারা রাত্রি যাপন করছে তাঁবুতে। তখনকার সে আদর, আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে কোন সন্তান তার হয়নি। মধুর আনন্দময় রাত্রি! চুম্বনের স্পর্শে বুকখানি আনন্দে দুলে দুলে উঠত। সে সব দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার কোন স্মৃতিচিহ্নই রেখে যায় নি। দেখলে মনে হয়, যেন জীবনে সে সব দিন কখনও আসে নি অথচ এসেছে, এমনি কত মধুর রাত্রি এসেছে তার জীবনে, সারা গ্রীষ্মকাল! উন্মত্ত ভালবাসায় সে নিজেকে তুলে দিয়েছে, বিচ্ছেদের কোন কলহ, কোন মান-অভিমান হয়নি কোন দিন। আঁচলে কোন ফলই ত পায়নি সে।

আর এখন এই একটি মুহূর্ত, বীভৎস আধঘণ্টা মাত্র, তারই ফল ওকে ভোগ করতে হবে সারা জীবন। ওর জীবন জুড়ে থাকবে এই কুৎসিত ক্ষত যার থেকে চিরদিন রক্ত ঝরবে।

ইভানের কথা মনে পড়ে। বিবাহের পর বেশি দিন দাম্পত্যজীবন ওরা ভোগ করতে পায় নি। কত রজনীর আনন্দস্মৃতি তাতে জড়িয়ে আছে। ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে এবং জুন মাসের রাত্রিতে গ্রীষ্মের হাওয়া বয়ে এনেছে। ওরকম সুখের দিন একসময় ছিল—ওর স্বামীর সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার আগে, কিন্তু এখন,—কিছুই নেই।

তার পরও গ্রামের মধ্যে দিয়ে ও ধীর মন্থর গতিতে হেঁটেছে, ওর সে কৃশতনু, কুমারীসুলভ বক্ষস্থল, সরু কোমর—ছেলেরা ওর দিকে তখনও তাকাত, ওকে দেখে হাসত, তারা ভুলে যেত যে ও বিবাহিতা, ইভানের জায়গায় আর কাউকেই

ও বসাবে না। তবু তারা ওর সাদা ধবধবে দাঁতগুলো দেখবার আশায় ব্যগ্র হয়ে উঠত, ওর হাসি ঠাট্টা শুনতে চাইত, আর চাইত ওর কালো চোখের একটি দৃষ্টি।

কিন্তু আধঘণ্টার একটি মাত্র দুঃস্বপ্ন ওর সব কিছু একদম বদলে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তার বেশি কেউ জানে না, এখনও কারুর নজরে পড়বার মত হয় নি। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন সকলের কাছে ওর দুর্ভাগ্য প্রকট হয়ে পড়বে, কেবল যে ওর কপালে কলঙ্কের ছাপই পড়ল, তাই নয়। ওকে জার্মান-শিশু গর্ভে ধারণের দুঃখও সইতে হবে এবং শেষে প্রসবও করতে হবে জার্মান-সন্তান। কে তখন ওকে সাহায্য করবে, ওর সে চরম প্রয়োজনের দিনে কে ওর কাছে আসতে চাইবে? কোন্ নারী হাত কলুষিত করতে চাইবে—নেকড়ে বাঘের বাচ্চাকে প্রসব করিয়ে—একটা মাথা-পিয়ালা খুনের ডিম! অলগা মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছিল। কিন্তু মালাশা নিশ্চয় করে জানে যে, তার মরণ হবে না। তারাই বা নিষ্কৃতি পাবে কি না কে জানে! ও ভাবতে পারে না যে, কেউ এসে সেই মৃত শিশুটির দেহ জার্মানদের হাতে ফিরিয়ে দেবে বা যারা সেটা সরিয়েছে তাদের ধরিয়ে দেবে। কিন্তু একথা ঠিক যে, জার্মানদের কেউ কোনরকম খাদ্যশস্য দেবে না।

ও জানত না কেমন করে এটা ঘটল, আর কেনই বা ঘটল, তবে একথা স্থির জানে যে, মৃত্যু ওর হবে না। তারা ওকে হত্যাও করবে না। ওকে যদি তারা হত্যা না করে, তা হলে ওরা কয়জনও বেঁচেই থাকবে।

প্রথমে চেচোরিখা নীরবে অলগার হাতের উপর মৃদু করাঘাত করছিল। কিন্তু অলগার কান্না থামছে না দেখে তার ধৈর্য আর রইল না।

"কিসের জন্য তুমি দুঃখ করছ? যা হবার তা হবেই। এমনি করে কাঁদতে তোমার লজ্জা হয় না?"

"কাঁদতে আমি চাইনে, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছি নে," অসহায় শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চেচোরিখার কানে ওর সে কান্না তার ছোট মেয়ে নিনার মতই মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা নরম হল।

"হয়েছে, হয়েছে, আর অমন করে কাঁদতে হবে না।... আমরা এখনও কিছু জানি নে।..."

মালাশা অন্ধকারে এক কোণে বসে তিক্ত হাসি হাসল। কি হবে না হবে ও বেশ ভাল করেই জানে। মৃত্যুর কোন আশাই নেই।

"বাড়ীতে তিনটি ছেলেমেয়ে রেখে এসেছি, তাদের কি হচ্ছে জানি নে।... আমি ত কাঁদছি না," চেচোরিখা বললে বটে, কিন্তু হঠাৎ ছেলেমেয়েদের একটিবার দেখবার আগ্রহ তাকে পেয়ে বসল। যদি একটি মিনিটের জন্যে তাদের দেখা পেত! তারা না জানি এখন কি করছে, কেমন করে তাদের চলছে? মাল্যুচিখা কি তাদের নিজের কাছে নিয়ে গেছে, কি, নেয় নি? হয় ত তারা একাকীই পড়ে আছে, রাত্রিতে তারা নিশ্চয়ই ভয়ে কাঁপছে, রাস্তায় পায়ের শব্দে হয় ত তারা আঁতকে উঠছে। জার্মানরা যেদিন এসে ঘর দখল করে তাদের বাইরে বের করে দিয়েছিল সেদিন থেকেই তারা সব কিছুতেই ভয় পায়।

"বেরোও!" লম্বা একটা সার্জেণ্ট চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেরা যাতে শীতে একেবারে জমে না যায় তাই সে কিছু ছেঁড়া নেকড়া সঙ্গে নিতে উদ্যত হলে সার্জেণ্ট রাইফেলের বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করে। "বেরোও!" আবার সে গর্জন করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা ভয় পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বরফের মধ্যে—কঠিন বরফের মধ্যে বেরিয়ে গেল, সোনিয়ার গায়ে ছিল মাত্র একটি সামান্য ছোট শার্ট।

পরে কিন্তু বাড়ী অপছন্দ হওয়ায় জার্মানরা তাদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আর একটা বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। তখন আবার চেচোররা তাদের বাড়ীতে এসে বাস করতে শুরু করে। সৈন্যেরা গলি-পথটাকে এমন নোংরা করে রেখেছিল যে ও এসে সর্বাগ্রে সেটা পরিষ্কার করল। তুষারের ভয়ে তারা বাইরে বেরুতে পারে নি, তাই সেখানেই—দরজার সামনেটাতেই তারা মলমূত্র ত্যাগ করে রেখেছিল। এবং সেই সব নোংরা মাড়িয়েই তারা যাতায়াত করত, তাতে তাদের কোনই অসুবিধা হয় নি। চেচোরিখা দাঁতে দাঁত চেপে সে সব নোংরা পরিষ্কার করেছে, দুর্গন্ধে তার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উলটে এসেছে। ঘরখানাকেও

ভাল করে পরিষ্কার করতে হয়েছে, সেখানেও আবর্জনার অভাব ছিল না। বাড়ী তাদের পছন্দ হয় নি, ছেড়ে দেবে, তাই হয় ত আড়ি করেই একাজ করেছে—চেচোরিখার তাই মনে হল। কিন্তু গ্রামের সর্বত্রই তারা এরকম করেছে।

মাল্যুচিখার বাড়ীতে ছেলেরা কেমন থাকবে? অস্কা যদি সাশার সঙ্গে ঝগড়া না করে তবেই মঙ্গল; সে বয়সেও ছোট, দুর্বলও, কিন্তু ছেলেটা ভারী ঝগড়াটে, তাই যত ভাবনা। চিরকালই সে মার খেয়ে বাড়ী ফেরে, হাত-পা ছড়ে যায়। সব সময়েই সে তার চেয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। সোনিয়ার জন্যে কোন ভাবনা নেই। মেয়েটা সরল, তা ছাড়া বয়সের তুলনায় বুদ্ধিমতীও। কিন্তু আর দুজন—অস্কা আর নিনা ··· সে যাই হোক, মাল্যুচিখা ছেলেদের উপদ্রব মানিয়ে নেবেই, তারও ত আর দুটো আছে! কেমন করেই না সে এ দুঃসময়ে এ-কয়টিকে খাওয়াবে!

য়েভদোকিম এক কোণে হেলান দিয়ে বসেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"দেখ তোমরা, গ্রোখাচ্ কেমন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে!"

অন্ধকারে তার নাক ডাকার শব্দ সমান তালে শোনা যাচ্ছিল।

"কিন্তু তুমি, তুমি ঠাকুর্দা, ঘুমোবে না একটু?" ছেলেমেয়ের দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে চেচোরিখা বলে উঠল।

"আজকাল আমার বড় একটা ঘুম হয় না। ঘুমোতে চাই, কিন্তু ঘুম আসে না, কতকাল যে ঘুমোই নি। ··· দু-তিন ঘণ্টা ঘুমোই, কিন্তু তারপর আর ঘুম আসে না। আজকাল দিনটাই বড়। ···"

"আচ্ছা, আমরা কি এখানে অনেকক্ষণ এসেছি?" হঠাৎ অলগা প্রশ্ন করে বসল।

"কে জানে? এমনি করে বসে থাকলে সময়ের জ্ঞান রাখা যায় না। ··· সন্ধ্যা নেমেছে বলেই মনে হয়। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হয় সন্ধ্যা হয়েছে।"

"মাত্র সন্ধ্যা," হতাশার সঙ্গে অলগা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, "কতক্ষণ এখানে এসেছি আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। ···"

"সে যাক গে বাছা, দুর্ভাবনা দূর কর, কে জানে আরও কতক্ষণ আমাদের এখানে থাকতে হবে। ..."

"ও ছেলেমানুষ। আর ছেলেমানুষরা সব ব্যাপারেই একটু তাড়াহুড়া করে," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে য়েভদোকিম বললে।

অন্ধকারের মধ্যেই চেচোরিখা তার দিকে তাকাল। আঁধারে তার চোখ দুটো ইতিমধ্যেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং দরজার ক্ষীণ ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে একটু আলোর রেখা এসে ঘরে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধের সাদা মাথাটা অস্পষ্টভাবে দেয়ালে হেলানো।

"তাড়ার কি আছে? ঠাকুর্দা, আমাদের এখন কোন তাড়াইং নেই কোন দিক থেকে। ... এখানে যতক্ষণ বসে আছি, সেটা নিতান্তই আমাদের; নিজস্ব, পরে কি হবে না হবে, সে পরেই দেখা যাবে। ..."

"আর আমাদের সৈন্যরা যদি ফিরে আসে?" ভয়ে ভয়ে অলগা কথাটা পাড়লে। কোন দিক থেকে যে কোন আশা নেই এটা সে কোন মতেই ভাবতে পারছে না, এ আঁধার ঘরের দরজা যে শুধু মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যেই খুলবে— এও সে ভাবতে পারে না।

"ভুলে যেয়ো না, জার্মানরা আমাদের মোটে তিনটি দিন সময় দিয়েছে।"

"তিন দিনে অনেক কিছু হতে পারে।"

"কিন্তু এই ঝড় বাত্যা! ব্যাপারটা সহজ নয়। তারা কেমন করে আসবে, কেমন করে তাদের মেশিনগান, কামান নিয়ে আসবে? বাইরে এমন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে যে সামনেকার কিছুই দেখা যায় না। তা ছাড়া, নালাগুলি বরফে ভরে গিয়ে এমন হয়েছে যে, নালার অবস্থানও ঠিক রাখা যাবে না। ..."

চেচোরিখা ধীরভাবে কথাগুলো বললে, কিন্তু হঠাৎ তার জ্ঞান হল যে, সে নিজেই কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে না।

সত্যি বরফ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দিনের পর দিন একান্ত ভরসা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছে যে লালপল্টন আসবেই, তাদের বিশ্বাসের মূল এতটুকু শিথিল হয় নি। সেদিনও সকাল বেলা ও মনে মনে ভেবেছে যে, তারা নিশ্চয়ই আসবে,

হয় ত তারা লেশচান পর্বন্ত এগিয়ে এসেছে, হয়ত তারা নদীর ওপারে এসে পৌছে পাহাড়ে রাস্তাটা ধরে গ্রামে ঢুকবার চেষ্টা করছে। তা হলে তারা এখন কেন আসবে না? কালও বরফবৃষ্টি হয়েছে, পরশুও—কিন্তু বরফবৃষ্টিতে তাদের কি আসে যায়? তারা দেশের পথঘাট সব জানে, তারা ত এখানকারই অধিবাসী। এরকম ঝড়বাত্যা বরফের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে, আর জীবনে এই প্রথম তাদের এ সবের সঙ্গে পরিচয় নয়। ...

হাঁ, অলগার কথাই ঠিক। তারা আসতে পারে। এই তিন দিনের যে কোন এক দিন তারা এসে পড়তে পারে। হয় ত হঠাৎ এসে তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বে, চারদিক গুলির শব্দে প্রতিধ্বনিত হবে। তারা সকলে এ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিশাল খোলা প্রান্তরে উপস্থিত হবে, সেখানে লাল পল্টনের দল ওদের প্রতীক্ষা করবে, তারপর যে যার মত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবে। ও কিন্তু সর্বাগ্রে মাল্যুচিখার বাড়ী গিয়ে ছেলেদের নিয়ে ঘরে ফিরবে। ... মুহূর্ত বিলম্ব না করেই ওরা ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে।

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না—ওরা আগে আসুক ত," চেচোরিখা মিষ্টি করে বললে। "তুমি এমনি ভাবে কথা বলছ যে, তারা যেন ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রামপ্রান্তে এসে পৌচেছে।"

"সত্য সত্যই কি তারা আসতে পারে না?"

"সত্যিই হয় ত পারে," চেচোরিখা অস্থিরতার সঙ্গে আঙুলগুলো মোচড়াতে মোচড়াতে বলল।

মালাশা তখনও সেই একইভাবে একই জায়গায় অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসেছিল। হাঁ, ওদের পক্ষে প্রতীক্ষা করা ভালই, ওরা এভাবে মুক্তি আশা করতে পারে। কিন্তু তাকে ত কেউ সাহায্য করবে না, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। লাল পল্টন আসবে, কিন্তু তারপর? ও ত তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, তাদের বরণ করতে পারবে না, তাদের আনন্দের অংশ গ্রহণও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ও ত তাদের এক গ্লাস জল দিতে বা ওর ঘরে তাদের আমন্ত্রণ করে নিতে পারবে না। ও কে?—একটা জার্মানের

শয্যাসঙ্গিনী। একটা জার্মানকে ও গর্ভে ধারণ করছে, চিরকালের অভিশপ্ত সৈন্যেরা আবার গ্রামে ফিরে এলে গ্রাম আবার নবজীবন লাভ করবে, মে রাস্তায় এসে দল. বেঁধে গান গাইবে, লাল পল্টনের দিকে স্মিতহাসি হাসে আবার ঘরে ঘরে ভালবাসা-বাসি চলবে, কেউ তাতে নিন্দা করবে না—সৈন্যে ত গ্রামবাসীদেরই ছেলে? ছেলেদের মধ্যে বেঁচে কে কবে ফিরে আসবে, আসবে না—কেউ জানে না, সুতরাং কোন মেয়েই তাদের চুমু খেতে আপ করবে না। একমাত্র ওর পানেই কেউ ফিরেও তাকাবে না, সকলেই ওর ক থেকে দূরে সরে থাকবে। যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় আর ইভান ফিরে আ সেও আর ওর কাছে আসবে না। সকলেই ইভানকে সব কিছু বলবে। আর ঘরে যাবে না। পথ চলতে চলতে যদি ওর সঙ্গে দেখাও হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতই সে ওর সঙ্গে ব্যবহার করবে, হয় ত বিরক্তির স ওকে দেখে থুথু ফেলে চলে যাবে।

অপর কোণে অলগার কথা ও শুনতে পাচ্ছে। "ওরা আমার থেকে যত সম্ভব দূরে সরে বসেছে," বিদ্বেষের সঙ্গে মনে মনে ভাবল, অথচ ভুলে গেল ওরা এসে বসবার পর ও এসে নিজের ইচ্ছামত জায়গা বেছে নিয়েছে। হঁ অলগা প্রতীক্ষা করতে পারে, অলগার পক্ষে মরণ-ভয় থাকার কারণ আছে অলগার বেঁচে থাকার মানে আছে। অস্তাপ সৈন্যদল থেকে ফিরে আসবে, ওদের বিয়ে হবে, আর পাঁচজনের মত ওরা বাস করবে, আর পাঁচজনের মত কাজকর্ম করবে—যেমন লড়াইয়ের আগে সকলে করত। ওদের ছেলেমেয়ে হবে। আর একমাত্র ও, গ্রামের সব চেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে কাজের মেয়ে মালাশা যুদ্ধের আগে যেমনটি ছিল তেমনটি আর হতে পারবে না।

ফেডোসিয়াও ভাসিয়ার শোক ভুলতে পারবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যাবে, তখন সে ধীরভাবেই মৃত পুত্রের স্মৃতি মনে করবে। কেন না, ভাসিয়া ছাড়া আরও ত অনেকে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। লেভন্যুকের মা-বাবাও ভুলে যাবেন যে তাঁদের আরও দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে ছিল। ছেলেরা যখন লড়াই থেকে ফিরে আসবে, ওদের ঘর ভরে থাকবে।

জার্মানরা যে সকল বাড়ী ধ্বংস করে ফেলেছে সেগুলি আবার গড়ে উঠবে, বাগানের যে-সব গাছ নির্মম হস্তে নষ্ট করেছে সেগুলির জায়গায় আবার নতুন গাছ লাগানো হবে। আহতদের ক্ষত শুকিয়ে যাবে এবং সব কিছুই আবার আগের মত হবে। একমাত্র ওর পক্ষেই আশা করবার কিছু রইলো না—কিছুই ও ফিরে পাবে না এবং ভুলবার মতও কিছু নেই ওর। প্রত্যেকের জীবনেই একটা পথ খোলা আছে, কারুর বন্ধুর, কারুর সহজ, একমাত্র ওর জীবনেই কোন পথ খোলা রইল না।

গ্রামের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে বলে একসময় তার গর্বের সীমা ছিল না। সমবায় খামারের যারা কাজ করে, ও ছিল সকলের চেয়ে সেরা কাজের মেয়ে, দশ-বারটি মেয়ের সামনেও সকলের দৃষ্টি ওরই উপর পড়ত, যখন সকলে একসঙ্গে গান গাইত, ওর কণ্ঠই সকলের চেয়ে স্পষ্ট ও উচ্চারণ বিশুদ্ধ হত, ওর চোখের মত চোখ আর কারুরই ছিল না, ওর মত বেণী, রোদে-পোড়া গোলাপী গাল, ধনুকের মত ভ্রূ আর কারুরই ছিল না। আর সবার উপর, নিজের সৌন্দর্যে উৎফুল্ল হয়ে ও মাথা উঁচু করে চলত।

কিন্তু সেই সৌন্দর্যই আজ এনে দিয়েছে ওর জীবনে বিপুল দুঃখ ও চরম গ্লানি। ও যদি গ্রামের ঠাকুরমা মার্তার মত বুড়ী হত, ওর মুখ যদি শুকিয়ে যেত, যদি মুখময় বলিরেখা পড়ত, তা হলে আজ এত দুঃখ গ্লানি ওকে সইতে হত না। ও যদি খোঁড়া উস্তিয়ার মত কুঁজো হত, তা হলেও কোন ভাবনা ছিল না। ও তাদের কারুর মতই নয় বলেই না ওই তিনটের নজর এসে পড়ে ওর উপর, আর তাই আজ ওর সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাঝে মাঝে দরজার বাইরে লোকজনের কণ্ঠস্বর, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একদিন যে বাড়ীতে গ্রাম্য সোভিয়েটের দফ্তর ছিল আজ সেই বাড়ীতে ওরা সকলের উপর হুকুম চালাচ্ছে, যেন ওটা নিজেদের বাড়ী। ওরা যেন বাড়ীর কর্তা। মালাশা হাত মুঠো করল। তারা কেবল এখানেই নয়, কীয়েভেও আছে। একবার মালাশা একটা মেলা দেখতে সেখানে গিয়েছিল। জার্মানরা কীয়েভের বড় রাস্তাগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কীয়েভের সোনার গম্বুজ পার হয়ে

ফুটপাথের উপর দিয়ে দম্ভভরে হেঁটে চলে। তারা খারকভেও আছে, সেখানেও তারা বুকের ছাতি ফুলিয়ে য়ুক্রেনের মাটী মাড়িয়ে চলে। কেবলমাত্র মালাশাকেই নয়, ওরা য়ুক্রেনের মাটী পর্যন্ত কলুষিত করেছে। শহরগুলি পরিত্যক্ত এবং বাতাসের আগে ভস্মীভূত গ্রামের ছাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে সেখানে মৃত দেহ পড়ে আছে এবং ফাঁসীকাষ্ঠে মৃতদেহ আজও ঝুলছে। ধরিত্রী মানুষের রক্তে সিক্ত, চোখের জলে ভিজে আছে।

কিন্তু এমন দিন আবার আসবে যেদিন স্বাধীন দেশের মাটীতে আবার লুটিয়ে পড়বে সূর্যের সোনালী আলো। ওই দ্নীপার আবার উন্মুক্ত হয়ে অবাধ গতিতে প্রবাহিত হবে; ভর্স্‌কৃলা, লোপান, প্সেল আবার তেমনি কলনাদ করে আপন গতিতে বয়ে চলবে, উচ্ছ্বসিত জলস্রোতে ধুয়ে যাবে দেশের মাটী, মুছে যাবে তার যা-কিছু লাঞ্ছনা ও মলিনতার গ্লানি। রক্তসিক্ত মাটীতে আবার ফলবে শত গুণ সোনার ফসল। গমের ক্ষেতে আবার সাগরের ঢেউ খেলে যাবে। সূর্যমুখীর বন সোনার বরণ ফুলে আলো হয়ে উঠবে। বাগানে বাগানে ফুটে উঠবে হলিহক, উদ্যান ছেয়ে যাবে লাল টোমাটোতে।

দেশে আবার ফুল ফুটবে, আবার হবে সব পরিচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ঐশ্বর্য।

কিন্তু মালাশা যা হয়েছে, চিরদিন তাই থাকবে—একটা হতভাগিনী পতিতা, যার জীবনের সব পথ রুদ্ধ হয়েছে! একটা অব্যক্ত বেদনায় মালাশার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল।

"মা[illegible]ন ঘুমোও নি?" চেচোরিখা জিজ্ঞাসা করল।

মালাশা চমকে উঠল। চেচোরিখার স্বরে যেন একটা সংকোচের সাড়া পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ইচ্ছে যদি না থাকে ত কথা বলার দরকার কি? ছলনা কেন?

"না, ঘুমোই নি। তোমার তাতে কি?" ও ভেঙে পড়ল।

"না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।"

"জিজ্ঞাসা করার ত কিছু নেই। আমার সম্পর্কে অত কৌতূহলী না হলেই ভাল করতে।"

"রাগ করছ কেন? সকলের অবস্থাই ত সমান।"

মালাশা হেসে উঠল—একটা অপ্রীতিকর কাষ্ঠহাসি।

"সকলের অবস্থাই সমান? না, আমার অবস্থা আলাদা।"

"সেটা একটা দুর্ভাগ্য। ..."

"দুর্ভাগ্যের কথা তুমি কত জান!" ওর ভিতরে একটা বিদ্বেষ যেন ক্ষীণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং কারুর উপর দিয়ে তা প্রকাশ পেতে চায়। "তোমার গায়ে যতক্ষণ না আঁচড় লাগছে ততক্ষণ ওখানে বসে চুপ করে থাকাই বরং সঙ্গত। গ্রখাচের নাক কেমন ডাকছে বসে বসে শোন।"

"ওর সঙ্গে কথা বলো না। ... ওর মেজাজই তিরিক্ষে," অলগা চেচোরিথার হাতখানি ছুঁয়ে সস্নেহে চুপি চুপি বলল।

মালাশা কথাটা শুনল।

"ঠিকই ত, আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন? আমার মেজাজ তিরিক্ষে, সকলেই তা জানে। আর তোমরা সব সময়ই মধুবর্ষণ কর, তাও সত্যি!"

মেয়েরা কথা বলা বন্ধ করল। মালাশা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল অন্ধকারের মধ্যে।

ওর মনে পড়ল ফসল কাটার সময় ওর সম্বন্ধে কাগজে কি লিখেছিল। হাঁ, তখন কিন্তু ওর মেজাজ তিরিক্ষে ছিল না। যুবতীরা, বর্ষীয়সীরা ওকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন করেছে। কাগজে ওর ছবি ছাপা হয়েছিল। সে ছবিটায় মালাশাকে বিশেষ ভাল দেখায় নি; হাসতে গিয়ে দাঁতগুলো চক্ চক্ করছে—দেখলেই নজরে পড়ে। মুখখানা ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু তবু ওর ছবি কাগজে বার হয়েছিল, সে সঙ্গে আদর্শ সমবায় চাষী বলে বহু প্রশংসা বার হয়েছিল। তখন কিন্তু ওর সম্বন্ধে লেখবার সত্য সত্যই অনেক কিছু ছিল। ...

কিন্তু এখন সেই মালানিয়া ভিশনেভা, আদর্শ সমবায় চাষী, নিজের গর্ভে একটা জার্মানের ডিম বহন করছে!

বাইরে বাতাস আর্তনাদ করছে। সে শব্দ পুরু দেয়াল ভেদ করেও শোনা যাচ্ছে। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে আটক-ঘরের দেয়াল তৈরি। গ্রখাচ হঠাৎ জেগে উঠে জোরে হাই তুলল।

"তোমার ত বেশ ঘুম হয়েছে," য়েভদোকিম ঈর্ষার সঙ্গে বলল।

"কেন হবে না? এতে ঘুমের ব্যাঘাত হবার ত কোন কারণ দেখছি নে। পরমুহূর্তে কি হবে না হবে কেউ বলতে পারে না।"

"কি হতে পারে? কি হবে, আমরা জানি।"

"হয় ত আমাদের ছেলেরা ফিরে আসবে," অলগা তাড়াতাড়ি বলে ফেলল। ছেলেরা যে ফিরে আসছে এবং তারা আসবে এ সত্যটা ও গ্রখাচকে বুঝিয়ে দিতে চায়।

"নিশ্চয় তারা আসতে পারে। ... এবং এই তিন দিনের মধ্যে আসাটাও বিচিত্র নয়। ..."

"অথবা আমাদের গ্যেরিলারাও আসতে পারে। ..."

"এতটা প্রত্যাশা বাড়াবাড়ি," চাষী আপত্তি জানাল। "তারা এখানে এসে পৌঁছবে কেমন করে? তারা যে জঙ্গলে আছে তা অনেকটা দূরের পথ এবং সেখানে তারা আটকে আছে। এরকম বরফের মধ্যে দিয়ে আসার কথা তারা ভাবতেও পারে না। তা ছাড়া, তারা এখানে আসতে চাইলে জার্মানদের তরফ থেকে তাদের লক্ষ্য করা হবে। ফলে সকলকেই মরতে হবে। অবশ্য গ্রীষ্মকালে এতটা অসুবিধা হবে না। গ্রীষ্মকালে যেখানে খুশি যাওয়া যায়, প্রতিটি ঝোঁপে আত্মগোপন করা চলে। কিন্তু এরকম আবহাওয়ায় খোলা মাঠেও যাওয়া চলে না।"

"কিন্তু সৈন্যবাহিনী?"

"সৈন্যবাহিনীর কথা আলাদা। তারা লড়াই করতে পারে।"

অলগা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"বাতাস কেমন আর্তনাদ করছে। ..."

"লোকে বলে এরকম রাত্রিতেই মৃত্যুর দেবতা দম্ভ ভরে ঘুরে বেড়ায়," য়েভদোকিম বলল।

অলগা মেরুদণ্ডের ভিতর একটা তীব্র ঠাণ্ডা কাপুনি অনুভব করল। আটক-ঘরটা অন্ধকার এবং ভয়াবহও বটে। বৃদ্ধ কেন এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করে?

"সত্যি কথা," চেচোরিখা বিষণ্ণ মনে মেনে নিল। "হাঁ, মরণ বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়ায়। ..."

চওড়া দেয়ালের ওপাশ দিয়ে মরণ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে, তার পায়ের শব্দ শুনে তারা নীরব হয়ে গেল। মরণ যেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, তারা যেন তাকে দেখছে।

"জান, আজকাল যম একটা নয়,—দুটো," বৃদ্ধ মন্তব্য করল।

"যম দুটো, সে আবার কি কথা?"

"খুব সোজা, দুটো। ... একটা—জার্মান যম, যে আমাদের লোক-জনকে মারছে, আর একটা সেই যম—যে জার্মানদের মারবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।"

অলগা চেচোরিখার গা ঘেঁষে এসে বসল।

"ঠাকুর্দা, তোমার কিন্তু এরকম কথা বলা উচিত নয়। ... এ যে ভয়ংকর কথা। ..."

"ভয়ংকর কথা শুনে তোমাদের আর ভয় পাওয়া উচিত নয়," গ্রখাচ কঠোর ভাবে বলল। "পৃথিবীটাই আজ হয়ে উঠেছে ভয়ংকর, মানুষগুলোও ভয়ানক। ... কি চাও তুমি, তাই তোমাকে জানতে হবে এবং কোন কিছুতেই ভয় পেলে চলবে না। তারা একবার তোমাকে ভয় দেখাতে পারলেই পেয়ে বসবে, তখন তোমাকে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত সব কিছু করিয়ে নিতে পারবে।"

"তারা কারা?"

"কারা? কেন, জার্মানরা। ... আজ তারা যা করতে চাইছে, তা হচ্ছে জনসাধারণের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। একবার তোমরা তাদের ভয় করেছ কি তোমাদের হয়ে গেল। কিন্তু তোমরা যদি কিছুতেই ভয় না পাও, তা হলে জার্মানরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।"

"ভাস্‌কা তাদের ভয় করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে গুলি করে মেরেছে। আর পাশচুক। ..."

"তারা গুলি করবে না, একথা কি আমি বলেছি? গুলি করবার জন্যেই তাদের হাতে আছে রাইফেল—তাই দিয়ে তারা গুলি করবে—মারবেও, কারণ, তারা জাতে জার্মান। আমি তার কথা বলি নি, শক্তি সেইখানেই নয়। ..."

"তা হলে শক্তি কোথায় আছে?"

"তুমি নিজেই কি তা জান না?"

কি জবাব দেবে তা জানে না বলেই সে কোন জবাব দিল না।

"শক্তি নির্ভর করে তোমাদের শক্ত মুঠোয় বন্দুক ধরে রাখার উপর—যাতে করে আত্মসমর্পণ না করতে হয়। সে শক্তি এখন নির্বাক্ হয়ে আছে, তাই তোমাদের মুখ থেকে তারা কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু এ কথা মনে রেখো যে, সব কিছুরই শেষ হবে এবং তারা একটি প্রাণীও এখান থেকে জীবন্ত ফিরে যেতে পারবে না। তারা যদি গুলি করে? এঃ, এখনও তোমরা যুবক ... গত মহাযুদ্ধে কত লোক মারা গিয়েছিল, আর রাষ্ট্রবিপ্লবেই বা কত গেল? ১৯১৮ সালে জার্মানরা আমাদের কি করেছিল সেটাও একবার মনে করে দেখো। কিন্তু তাতে ফল কি হয়েছিল? তার কোন চিহ্ন বা ছাপও আজ আর নেই, কিন্তু আমরা আছি। আমাদের সে দেশ আছে, অর্থাৎ—যা-কিছু সবই আছে।"

"ওঃ! কিন্তু ১৯১৮ সালে তারা যেভাবে হত্যা চালিয়েছিল এবারে তার চেয়েও ভয়ানক ভাবে চালাচ্ছে।"

"হাঁ, ভয়ানকই। কিন্তু তারা আমাদের সকলকে হত্যা করতে পারবে না। কেউ-না-কেউ নতুন করে জাতিটা গড়ে তুলবার জন্যে বেঁচে থাকবেই। দুদিন সবুর কর; যদি আমরা বেঁচে থাকি, দেখতে পাব, আর যদি বেঁচে না থাকি, আর সকলে দেখতে পাবে কেমন করে সব ঘটবে। বদলাবে: যুদ্ধের আগে যা ছিল তার চেয়েও সুন্দর, সমৃদ্ধ এবং মহত্তর হয়ে। ..."

"সে যাই হোক, আমি নিজের চোখেই সব দেখতে চাই।…" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অলগা বলে।

"আমি বলছি, তুমি দেখতে পাবে! বয়স তোমার কত হল?"

"উনিশ।"

"উনিশ।… আচ্ছা ঠাকুর্দা, কত দিন আগে আমাদের বয়স উনিশ ছিল?"

"শোন কথা!" মেজাজের ভান করে য়েভদোকিম বলে উঠল। "তুমি যখন টেবিলের তলে হেঁটে বেড়াতে তখন আমার দাড়ি গোঁফে বেশ পাক ধরেছে।…"

"সে কথা সত্য। তবু ওর তুলনায় আমি বৃদ্ধ। তুমি যে নিজের চোখে সব কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা কর তাতে তোমাকে দোষ দেওয়া চলে না।… তোমার ত মাত্র উনিশ বছর বয়স, আমি ও ঠাকুর্দা তোমার কাছে নিশ্চয়ই বুড়ো, অথচ আমরাই আশা করছি বেঁচে থেকে তা দেখে যাব।…"

"যুদ্ধের পরে সব কিছু কেমন হবে তাই দেখতে সাধ যায়।…" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অলগা বললে।

অকস্মাৎ গ্রখাচ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"না, আমি শুধু ওইটুকুই দেখতে চাই নে! আমি চাই দেখতে শেষ জার্মানটির মৃত্যু এখানে—আমাদের গ্রামে হবে! কীয়েভে শেষ জার্মানটি ফাঁসী কাঠে ঝুলবে, পাহাড়ের উপর একটি ফাঁসী কাঠ খাড়া করে সেখানে শেষ জার্মানটিকে এমনি ভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে—যেন দ্নীপারের সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তারপর, যারা জার্মানীতে বসে আমাদের জন্যে ফাঁসীর দড়ি তৈরী করছে তাদের এখানে ধরে এনে তাদের দিয়ে গ্রামগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, যে-সব বাড়ী-ঘর তারা ধূলিসাৎ করেছে সেখানে একখানের পর একখানা ইট বসিয়ে আবার তেমনি বাড়ী-ঘর তৈরি করাতে হবে এবং তাদেরই দিয়ে। খবরের কাগজে যে কথা লিখেছে সে কথা মনে রেখো—একখানা ইটের উপর আর একখানা ইট বসিয়ে গোটা বাড়ী তৈরি করাব।"

"তাদের আবার এখানে দেখার চেয়ে কাজটা নিজেরা করাই কি ভাল নয়!" চেচোরিখা মন্তব্য করল।

য়েভদোকিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগল:

"আমাদের লোকেরা ভয়ানক কোমল, হাঁ, ভয়ানক কোমল।...আজ তারা ক্রোধোন্মত্ত হয়েছে, কিন্তু কালই তারা একেবারে ভুলে যাবে।... কেমন করে বিষ বহন করতে হয়, তারা তা জানে না।"

"ঠাকুর্দা, এইটেই তোমার ভুল। তারা নম্র হতে পারে, কিন্তু যখন একবার তাদের হৃদপিণ্ডে গিয়ে ছোরা বসে তখন তারা হয়ে দাঁড়ায় সাংঘাতিক! এখন তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এখন ভুলবে কেমন করে? না, এমন সব ঘটনা আছে যার কথা তারা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভুলতে পারবে না। কখনই না।"

মালাশা এককোণে বসে বসে এদের কথাবার্তা শুনছিল। গ্রখাচের কোন কোন কথায় তার নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। হাঁ, শেষ জার্মানটিকে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে বা কাজ করতে করতে তাদের ঘাম যেন নদীর জলের সঙ্গে মিশে যায়—এ সবই তার দেখবার আগ্রহ। কিন্তু তাতেও ত তার মনে সান্ত্বনা আসবে না। এদের প্রত্যেকেই প্রতিশোধ নিয়ে মনটাকে হালকা করতে পারবে, কিন্তু ওর মনের শান্তি ত কোন মতেই ফিরে আসবে না। যত রক্তপাতই হোক না, সময় যতই এগিয়ে যাক না, কোন প্রতিশোধই ওর স্মৃতিকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না। একটু একটু করে স্মৃতি ওর অন্তরকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে।

গ্রখাচের শেষ কথাটি তখনও যেন সেখানকার বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে, যেন সিলিং-এর বুকে কড়িকাঠের মধ্যে আগুনের আখর জ্বল জ্বল করছে:

"এ এমন একটা জিনিস যা লোকেরা মৃত্যুদিন পর্যন্ত কখনও ভুলবে না!"

মালাশাও প্রতিধ্বনি করে উঠল:

"না, কখনও না!"

"আমার তেষ্টা পেয়েছে," অলগা চুপি চুপি বলল।

"তেষ্টার কথা মনেও এনো না," গ্রখাচ বললে। "তারা আমাদের এক-ফোঁটা জলও দেবে না। তিন তিনটে দিন তুমি এক ফোঁটা জলও পাবে না! এখানে ত তেমন গরম নয়, কিছু না করে বসে বসে তোমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই বন্ধ করে রাখতে হবে! জলের কথা না ভাবলেই জল পানের ইচ্ছে হবে না।"

"ওঃ।..."

"তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত বাছা," চেচোরিখা বলে উঠল। "এরকম হা-হুতাশ করার কোন মানে হয় না।... তুমি কি মনে কর যে এরকম অবস্থায়-একমাত্র তুমিই পড়েছ? গ্রামে কে এর চেয়ে আরামে আছে বলতে পার?"

"কিন্তু আমরা ত জামিনদার ..."

"জামিনদার, তাতে কি? তিন দিন পর তারা আমাদের গুলি করে মারবে বলেছে। বেশ ত, তাতে কি? তুমি নিজের কানে কি সেকথা শোন নি? হুকুম দিয়েছে আমাদের খাদ্যশস্য সব তাদের ধরে দিতে হবে, গুলি করার ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি মনে কর যে কেউ তাদের কিছু দেবে? আজ প্রত্যেকের মাথার উপরই যমদণ্ড ঝুলছে। ..."

নীরব। অলগা নিবিষ্টচিত্তে শুনছিল, পল্লীর পথে পথে মৃত্যু বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে চায়।

গ্রামখানি বরফে ঢাকা পড়ে আছে, যেন বাইরের তুষারবাত্যার আর্তনাদ সত্ত্বেও গ্রামখানি ঘুমিয়ে আছে। কুঁড়েগুলি যেন মাটীর সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে হেলে পড়েছে। বাতাসের চেঁচানির সঙ্গে ওলেনার কাৎরানি মিশে গেছে। কাজেই মনে হচ্ছে, এখনও তার প্রসব হয় নি। কাৎরানি ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। সারা গ্রামটাই যেন গভীর ঘুমে অচেতন।

কিন্তু কুটীরে তারা কেউ ঘুমোয় নি। য়েভদোকিম বলেছে, গ্রামের পথে মৃত্যু হেঁটে বেড়াচ্ছে—তারাও প্রত্যেকেই তার পায়ের শব্দ কান পেতে শুনছে। মৃত্যু যেন তার বিরাট ডানা মেলে গ্রামখানিকে ছেয়ে রেখেছে। পথের ওই পুঞ্জীভূত বরফের উপর দিয়ে চলেছে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য, ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে লুটোপুটি করছে প্রতিটি গৃহের ছাদে ছাদে, দেয়ালের ফাটলে ফাটলে মৃত্যুর

প্রেতায়িত রূপ যেন ওৎ পেতে আছে। খড়ো ঘরের চালাগুলোকে নাড়া দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। যে সব গাছ জার্মানদের কুঠার এড়িয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তারাও লুটিয়ে পড়ছে মৃত্যুর সেই ঝাপটায়।

নালার নীচে খাদের মধ্যে মৃত দেহগুলো পড়ে আছে। মহাকাল যেন সেই সব দেহের ধ্বংসাবশেষগুলিকে ধীরে ধীরে বরফ দিয়ে ঢেকে ফেলতে চায়। ভাসিয়া ক্রাবচুকের কালো মুখখানাকে সে বার বার আবৃত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভাসিয়ার মা প্রতিদিন এসে সযত্নে সরিয়ে দেয় সেই আবরণ। এক মাস আগে লাল পল্টনের যে সব যোদ্ধা এই গ্রামের প্রান্তে জীবন দিয়েছে, মৃত্যু তাদের উপর প্রতিনিয়ত বরফের আস্তরণ ছড়িয়ে দেয়। এইখানে এই নালার মধ্যেই যেন মৃত্যুর রাজত্ব, স্তূপীকৃত শবদেহ বরফে জমাট বেঁধে আছে।

গ্যেরিলা দলের কর্মী লেভান্যুকের যে মৃতদেহটা ফাঁসী কাঠে ঝোলান ছিল সেটাকে মৃত্যু যেন বার বার এসে দোলা দিয়ে যায়, তার স্পর্শে সে দেহটাও কালো হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। দড়িটায় কড় কড় শব্দ হয়। বাতাস যখন খুব জোরে এসে দেহটাকে দুলিয়ে দেয়, ছেলেটার পা দুখানা খট্ খট্ করে ফাঁসী কাঠের খুঁটিতে লাগে।

মৃত্যু যেন ভৈরব মূর্তিতে গর্জন করে ফিরছে। ওই চালাঘরখানিতে— যেখানে তৃণশয্যায় শুয়ে ওলেনা সন্তান প্রসব করছে তার দ্বারেও করাঘাত করছে মৃত্যু।

মহাকাল তার সময়ের অপেক্ষায় আছে। অট্টহাসির বিকৃত কণ্ঠস্বর গ্রামখানির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। লোকে সে শব্দ শুনতে পায়। ওই সব কুটীরে যারা বাস করে তাদের কারো চোখে ঘুম নেই; নিশ্চল বিছানায় পড়ে স্থির দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে, অন্ধকারে কান পেতে মৃত্যুর শব্দ শোনে—সেই ভৈরব-গর্জন, জার্মান-মৃত্যু! সে মৃত্যু থাবা উঁচিয়ে বসে শাণিত নখগুলোকে আরও ধারালো করে তুলছে। প্রচুর ফসল পাবে এই আশাই সে করছে। এ আর নালার ধারে পাশচুকের গুলি খাওয়া নয়। সর্বত্রই জার্মানের

ফাঁসী কাঠ খাড়া হয়ে আছে, রাইফেলের নল আজ সকলের বুকই লক্ষ্য করে আছে।

*

আটক-ঘরে তারা এমন সব বিষয়েই আলোচনা করছে যা সকলের মনকেই আলোড়িত করছিল। এই আলোচনার ফলেই এত ঝড়জলেও তাদের কারু চোখে ঘুম ছিল না। বুড়ো য়েভদোকিম নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল :

"ওরা আমাদের প্রত্যেককে গুলি করে মারতে পারবে না। ... কেমন করে পারবে? একটা গ্রামকে গ্রাম উজাড় করা সম্ভব নয়। কেউ তাদের এতটুকু খাদ্যশস্য দেবে না ..."

"তাতে ওদের কি এসে যাবে?" গ্রখাচ অভদ্রভাবে হেসে উঠল। "এই কি প্রথম? ওরা লেভানেক্কায় কি করেছে জান ত? সাহ্‌দিতে কি হয়েছে? কস্তিন্‌কায়?"

যে সকল গ্রামের আজ অস্তিত্ব নেই, তাদেরই প্রেতায়িত মূর্তি ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। লেভানেক্কা মাটীর সঙ্গে মিশে গেছে। জার্মানরা সেখানে চার দিক থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়, লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে বাঁচবার আশায় চাষীরা যখন গ্রাম থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে তখন জার্মানরা তাদের গুলি করে। মায়েদের চোখের সামনে শিশুদের ধরে সেই বহ্ন্যুৎসবে আহুতি দিয়েছে। আর এ সবই ঘটেছে মাত্র একটি কারণে: কে একজন কোন্ জার্মান সৈনিককে গুলি করেছিল। তারই প্রতিশোধ! তারপর সাহ্‌দি। ইটের জন্য মাটী সংগ্রহ করতে যে গর্ত হয়েছিল—তারই মধ্যে গ্রামের দেড় শ লোককে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে হাত-বোমা ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। তারপর কস্তিন্‌কা—যেখানে তারা সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে শিশু ও স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ অবস্থায় তাড়িয়ে দিয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি শীতের মধ্যে। সেই অবস্থায়

দূরবর্তী পাশের গ্রামে আশ্রয় নিতে গিয়ে তাদের সব কটিই পথের মাঝে মারা যায়।

"সাহ্‌দি, লেভানেস্কা, কস্তিন্‌কা—এ ত শুধু আমাদের জেলাতেই, আরও কত আছে। কীয়েভে তারা কী করেছে—কি করেছে ওদেশায়? এ রকম আরও কত শহরে শহরে? আমাদের মফঃস্বল শহরগুলি আর গ্রামগুলি আছে কিছু আর? তারপর ১৯১৮ সাল। ইস্‌, ঠাকুর্দা, লোকে ভাববে—এই বুঝি তুমি প্রথম শুনলে বা দেখলে। ..."

অলগা নিঃশব্দে হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকল। তার মনে হল, মুহূর্তেই সব যেন চুকে যাবে। যেন এক্ষুনি শুনতে পাবে গুলির আওয়াজ, তারপর সেই পরিচিত জয়ধ্বনি।—এক্ষুনি হয় ত যাবে দরজা ছুটো খুলে। মুক্তি ... জীবন! ... ওরা যা বলে, সে শুধু মৃত্যুর কথা—শুধু মৃত্যু। মৃত্যু যেন অবধারিত। যেন কিছুই নয়—স্থির ভাবে ওরা যা আলোচনা করছিল, তাতে ওর সমস্ত মন আতঙ্কে ভরে যায়। ক্ষুব্ধ মনেই সে ভাবে, "ওদের কি! য়েভদোকিম অনেক দিন বেঁচেছে—ওর বয়স আশী বছর, এটা মরবারই বয়স। তারপর, গ্রখাচ ... গ্রখাচ ১৯১৮ সালের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। ওর স্ত্রী আর বয়স্কা মেয়েগুলি যেন এক-একটি খেঁকী কুকুর। তারই বা কি আসে যায়! তারপর চেচোরিখা ..." থমকে যায় অলগা—আবার ভাবে : চেচোরিখার তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বামীও আছে—যুদ্ধে গেছে। যাই হোক, ছেলেমেয়ে আছে তার, স্বামী আছে। আমার কি আছে! জীবনের কতটুকু উপভোগ করেছি আমি! ওদেরই ওই সব বলা চলে ..."

"কিন্তু সে যাই হোক, কেউ ওদের খাদ্যশস্য দেবে না।" য়েভদোকিম বলল।

"নিশ্চয়ই দেবে না," চেচোরিখা সমর্থন করে। সারা গ্রাম—নালার ধারে গ্রামের শেষ কুটীরটি পর্যন্ত সবাই সেই কথাটাই ভাবছিল। খাদ্যশস্য যা-কিছু ছিল সবই মাটীর নীচে সযত্নে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। দূরে মাঠের মাঝখানে তুষার জমাট মাটীর তলায় গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। বিগত শরৎ কালে পর্যাপ্ত গম পেয়েছিল তারা—যতটা পেরেছে লাল পল্টনকে দিয়েছে—বাকীটা

রেখেছে মাটীতে লুকিয়ে। তাদের লুকানো সোনালী ফসলের উপর জমেছে পুরু বরফের স্তর, তারও পরে জমে উঠছে বায়ুতাড়িত তুষারপিণ্ড। কেউ তা খুঁজে বার করতে পারবে না, কেউ আন্দাজও করতে পারবে না—কোথায় আছে। জার্মানরা এসে যদি খোঁড়েই, তা হলে পাঁচ-ছ হাত গভীর করে খুঁড়তে হবে, তা হলে বিঘের পর বিঘে—কত হাজার বিঘে তারা খুঁড়বে?

মাটীর তলায় লুকানো ওই সোনার ফসল—সারা গ্রামের রুটি তৈরী হয় তা দিয়ে। জীবনের জন্যে ওরা রুটিও অস্বীকার করতে পেরেছে। সে ত শুধু ফসল নয়—সে তাদের হৃদয়। প্রলুব্ধ, অতৃপ্ত জার্মান দৃষ্টির কাছ থেকে মাটীর তলায় লুকিয়ে-রেখেছে। চাষীদের পরিশ্রমলব্ধ পুরস্কার—মাটীর দান এই সোনার ফসল। সেই ফসল জার্মানদের কাছে সমর্পণ করা মানে তাদের বাঁচানো। ক্ষুধিত জঠর পূর্ণ করা, শীতার্ত মৃতকল্প জার্মানদের বাঁচানো। সেই সমর্পণের অর্থ একটা প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া তাদের বুকে—যারা তুষারঝড়ের মধ্যে নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠতা নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেই সমর্পণের অর্থ দেশদ্রোহিতা করা, স্বজাতিকে প্রবঞ্চনা করা, এই কথা জগতের সমক্ষে স্বীকার করে নেওয়াঃ জার্মানরা এই রত্নপ্রসবা য়ুক্রেনের প্রভু। সেই সমর্পণের অর্থ নিজেকে বঞ্চনা করা। তার অর্থ, সেই আদেশকে লঙ্ঘন করা যা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিব্যাপ্ত, যার ডাক গিয়ে পৌছেছে প্রত্যেকের কাছে, যার গভীর দাগ আঁকা আছে হৃদয়ে হৃদয়ে। না—শত্রুকে এতটুকুও খাদ্যকণা নয়! এই সমর্পণের অর্থ আত্মদ্রোহিতা, শত্রুর কাছে নিজেকে বিক্রয় করা। এর অর্থ—এই যুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে, ১৯১৮ সালের যুদ্ধে—তারও আগে যারা স্বদেশের জন্যে যুদ্ধ করে মরেছে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা—বিশ্বাসঘাতকতা করা তাদের প্রতি যারা মানবের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করেছে, যারা মৃত্যু দিয়ে অর্জন করেছে মুক্তিকে।

গ্রামে এক দিন যেখানে চাষী-শ্রমিকেরা নিজেদের জমির সীমানায় যে খামারে কাজ করে দিন যাপন করত তাদের একটি হৃদয়ও বিচলিত হল না। মেয়েরা জল্পনা কল্পনা করেঃ তারা চলে যাওয়ার পর কি হবে।

প্রৌঢ়া কোভালচুক অন্ধকারে তার ঘুমন্ত আটটি শিশু সন্তানের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল। কেউ তার বিছানায় শুয়েছে, কেউ উনুনের উপরকার তাকে। আপন মনে নীরবে কুশলী গিন্নীর মত সে ভাবতে থাকে : লেনা দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে—সে আর একজনের খুঁটিনাটি কাজকর্ম বেশ দেখতে পারবে। লাল পল্টন যখন ফিরে আসবে—তখন মাটির তলায় লুকানো খাদ্যশস্য দিয়ে সকলকে ভালকরে পরিতুষ্ট করা চলবে। ততদিন আর সকলের মত কোন রকমে টেনে চলতে পারলেই হল।

ভিশ্চেঙ্কভা অন্ধকারে ছেলের দোলনায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—আর ভাবছিল বাচ্চাটাকে খাওয়াবে কে, কে করবে লালন পালন? মনে মনে তার দৃঢ় ধারণা ছিল, বাচ্চাটাকে নিশ্চয়ই তারা মেরে ফেলবে না। এমন কোন মাকে তারা জোগাড় করে আনবেই যে বুকের দুধ দিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচাবে।

গ্রোখাচিখা অন্ধকারে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—আর ভাবতে লাগল : গ্রখাচ বন্দী, ফসল না দেওয়ার জন্যে অপরাধী সাব্যস্ত হবে কে? গ্রখাচ, না, সে? ওর কিন্তু মনে হয়, ও-ই দোষী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তাতে ওর কিছু যায়-আসে না। ওর ছেলেমেয়েরা আর ছোট নেই। মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, তারা চালিয়ে নিতে পারবে।

ভান্‌যুক—বয়স তার অল্প। স্বামীর সঙ্গে কোন দিন তার আর দেখা হবে না হয় ত—এই ভেবে দুঃখে হৃদয় তার বিদীর্ণ হয়ে যায়। আহত হয়ে হাসপাতালে থাকার সময় মাস খানেক আগে তার স্বামী লিখেছিল : হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বেরুলে কয়েক দিনের জন্যে হয় ত ছুটি পাব বাড়ী যাওয়ার। এক মাস কেটে গেছে, জার্মানরা এসে ঢুকেছে গ্রামে। যখন তাদের নিজেদের সৈনিকরা আসবে, তখন হয় ত সে থাকবেনা এখানে। নিজের জন্যে তার দুঃখ হয় না—দুঃখ হয় স্বামীর জন্যে। বেচারী ভারী শান্ত আর অসহায়—একা থাকবে সে কেমন করে?

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে লোকগুলি ভাবে। আপন আপন চিন্তায় সকলে মগ্ন, যে-যার প্রিয়জনের কথা ভাবে, আর ভাবে ফসলের কথা। মৃত্তিকার স্বর্ণাভ রক্ত

এসেছিল স্বর্ণপ্রবাহের মত, শৈলস্খলিত তুষারস্তূপের মত নেমে এসেছিল উচ্ছ্বসিত বন্যায়। নিজেদের সেনানীরা যখন ফিরে আসবে, আবার যখন সুদিন আসবে, তখনকার জন্যে সব আছে মাটীর তলায় লুকানো। যে-যার বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেদের কথাই ভাবে—বিভিন্ন চিন্তা, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। কিন্তু সেই রাত্রে একটা জিনিস সকলেই জানত এবং সকলেই ভাবছিল সেটা নিয়ে—যদিও তা নিয়ে কেউ কিছু বলাবলি করছিল না, আলোচনাও করছিল না: ফসল মাটীর তলাতেই লুকানো থাকবে, সে তাদের জীবনের চেয়েও দামী—যেখানে লুকানো আছে সেখান থেকে জার্মানদের থাবা চেষ্টা করেও খুঁড়ে বার করতে পারবে না। এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ।

এবং মূর্তিমান জার্মান-মৃত্যু গোঙিয়ে, আর্তনাদ করে ঝড়ের বেগে গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ভয়াবহ; প্রত্যেকে শুনতে পেল ঘরের ভেতর থেকে।

সেই রাত্রে যে সমস্ত জার্মান সৈনিক পাহারায় ছিল তারা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল যে-যার জায়গায়, ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিল চারদিকে, বরফের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তারাও শুনতে পাচ্ছিল মৃত্যুর ডাক। তাদের মুখের উপর মৃত্যু তার নিঃশব্দ হিমেল নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাচ্ছিল একান্ত সন্নিকট দিয়ে—গোপনে আর অজ্ঞাতসারে। খাদের ভিতর গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে, ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকে, খড়ের চালের উপর নিঃশব্দে চলমান মৃত্যুকে অনুভব করছিল তারা। হাজার হাজার চোখ মেলে দিয়ে মৃত্যু তাকিয়েছিল তাদের দিকে হিমদৃষ্টিতে, দৃঢ়নিবদ্ধ ঠোঁট, অনুচ্চারিত কণ্ঠে দিচ্ছিল তাদের দণ্ডাজ্ঞা, গ্রামের পাঁচিলগুলির পাশ দিয়ে নিঃশব্দে অতিক্রম করে যাচ্ছিল সে, দাঁড়াচ্ছিল বেড়ার কাছে গিয়ে, ঝুঁকে পড়েছিল কুয়োগুলোর উপর। সে সর্বব্যাপী—জার্মান সৈনিকরা তার অস্তিত্ব অনুভব করছিল সর্বত্রই। গ্রামের পথে মৃত্যু গোপনে অগ্রসর হয়ে চলেছিল তাদের একান্ত পাশে পাশে, ঘরের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে এবং গৃহকোণ পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছিল পিছনে পিছনে। তাদের চোখের উপর সেই মৃত্যুই টেনে দিচ্ছিল সুগভীর ঘুমের কালো পর্দা। তার সে হিমেল দৃষ্টি তারা নিজেদের দেহে

অনুভব করছিল, তার সেই অলক্ষ্য দৃষ্টিতে বিদ্ধ করছিল তাদের, নিস্পন্দ করে দিচ্ছিল তার নিঃশ্বাস। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে বার বার করে সে তাদের গোণে আর নিঃশব্দ নির্মম য়ুক্রেনের মৃত্যু গভীর ভাবে প্রবেশ করে তাদের অস্থির মজ্জায় মজ্জায়।

৫

ঝড়ের আর্তনাদ আর গোঙানি। চালাটা কাঁপছিল—যেন উড়ে যাবে যে-কোন মুহূর্তে, হুড়মুড় করে ভেঙে গিয়ে পড়বে নালায়। কড়িকাঠগুলো কড়্ কড়্ করে শব্দ করে, খড়ের চালায় খস্ খস্ করে শব্দ হয়। আঁটি আঁটি খড় বাতাসের মুখে উড়ে গিয়ে পড়ে গ্রামসীমান্তের উন্মুক্ত তুষারাবৃত মাঠে—হারিয়ে যায় তুষারঘূর্ণির অন্ধকারে।

ওলেনা চীৎকার করছিল—প্রাণপণে চীৎকার করছিল। অসহ্য যন্ত্রণার উৎকট পীড়ন চলছিল তার দেহের উপর দিয়ে। এ শুধু প্রসব-যন্ত্রণা নয়! রাত্রিতে সৈনিকেরা যখন পথে পথে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, সে তখন বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো আর সঙীনের খোঁচাগুলোর যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি এতক্ষণে ফিরে আসে। এ যন্ত্রণা ক্ষুধার—তৃষ্ণার, শীতের। একযোগে সমস্তগুলো যেন একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপরে। লুব্ধ তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়াচ্ছে তাকে—চিবোচ্ছে। সমস্ত দেহ যেন তার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—দগ্ধীভূত হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত আগুনে, যেন হাজার বিষাক্ত ছুরি প্রবেশ করেছে তার সর্বাঙ্গে।

চীৎকার করেছিল ওলেনা। এখন সে চীৎকার করতে পারে। এখন সে একটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এতদিন স্তব্ধতা তার সহ্যসীমার শেষ প্রান্তে তাকে কোন রকমে ধরে রেখেছিল—আজ সেই অবরোধ সে ভাঙতে পারে। জার্মানরা যখন তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তখন থেকে তার ধারণা হয়েছিল, যাই হোক—একটি সন্তানের জন্ম দেবে সে—সে দিন থেকে

নিস্তব্ধ হয়ে ছিল ওলেনা। কুঁদোর গুঁতো, বরফের উপর পড়ে যাওয়া, প্রচণ্ড শীত—কিছুতেই মরল না তার গর্ভের সন্তান। সে বেঁচে আছে, সে এই পৃথিবীতে আসতে চায়। তার আসার রুদ্ধ পথ নির্দয় ভাবে বিদীর্ণ করে আলোর দিকে আসছে সে।

ওলেনা পশুর মত চীৎকার করছিল। চীৎকারে যেন তাঁর স্বস্তি বোধ হল। যন্ত্রণা, শীত আর বাইরেকার ঝড়ের আর্তনাদ—সব ডুবে গেল সেই চীৎকারের মধ্যে। শো শো শব্দ ও গর্জানি তখনও চলছে। দরজাটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হল। ফিরে একবার সে দেখলও না। যন্ত্রণাটা ক্রমশ ঘন ঘন হচ্ছে—ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে, মনের সাধে চীৎকার করছে সে। এ তার অত্যাচারক্লিষ্ট দেহের অপরিহার্য দাবি।

সৈনিকটা ধমকাতে গিয়ে দরজার কাছে থেমে গেল। বুঝতে পারল, মেয়েটি প্রসব করছে। একটু পরে আর একটা সৈনিক এল। তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল, মন্তব্য করছিল। খড়ের উপর সে যে শুয়ে আছে সম্পূর্ণ নগ্নকায়, দুটি অপরিচিত পুরুষের নির্লজ্জ দৃষ্টি যে তার ওপর নিবদ্ধ, তারা যে ওকে নিয়ে রসিকতা করছে—এ সবের কোন খেয়াল ছিল না ওর। একটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে ও। এখন ও জার্মান-শাসিত রাজ্যের বাইরে। ওর আসন্ন মাতৃত্ব ওদের নির্লজ্জ দৃষ্টি থেকে আড়াল করছে ওকে, রক্ষা করছে ওকে বর্মের মত ওদের নির্বোধ অট্টহাস্য থেকে। একটি সন্তান প্রসব করছে ও এবং তারাও বাধা দিচ্ছে না। ভিতরে না এসে দরজার বাইরে তারা অপেক্ষা করছিল।

ওর চিৎকার ক্রমশ বেড়ে চলল। প্রতিবেশী কুটিরের মেয়েরা ভগবানের নাম স্মরণ করে আর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সেই কুজ্ঝটিকার মধ্যে ভয়ে ভয়ে তাকায় বাইরে। ওলেনা কস্টিয়ুক নিঃসঙ্গ আর অসহায়—প্রসব করছে উন্মুক্ত একটা চালার ভিতর। তারা ভেবেছিল, ওলেনা মরে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তুষারের মধ্যে, তার গর্ভস্থ সন্তানও মরে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে মরে নি, বরং সন্তানটি প্রসব করছে। কেউ নেই তার পাশে, কেউ নেই তাকে একটু জল এগিয়ে দেওয়ার, কেউ নেই তার শুকনো ঠোঁট দুটো একটু গরম করে

দিতে। মাথার বালিশটা গুঁজে দেওয়া বা সাহায্য করতে বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এমন কেউ নেই পাশে। সে এমন অবস্থায় প্রসব করছে যা এই গ্রামে কেউ কখনও করেনি—সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তুষারের মধ্যে, একটা চালা ঘরের মাটীর মেঝেতে। প্রতিবেশী মেয়েরা ভগবানের নাম স্মরণ করে, কান ঢাকা দেয় আর মুখ বুজে বসে থাকে। কিন্তু অদম্য কৌতূহলে কান পেতে আবার শোনবার চেষ্টা করে। আবার কাঁদছে—তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার—কানে তালা লাগে। পীড়িত দলিত ভেঙে-পড়া একটা দেহে অত চীৎকার আসে কোথা থেকে?

শেষ পর্যন্ত তার চীৎকার আর্তনাদে পরিণত হল—তারপর হঠাৎ থেমে গেল।

"ছেলে নেমেছে," মাল্যুচিখা ফিস্ ফিস্ করে বলল। একেবারে পাশেই ঘর তার। একটা বেঞ্চির উপর নিঃশব্দে বসে পড়ল সে।

"ছেলে হয়ে গিয়েছে," জিনাও বলল।

মুহূর্তকাল ওলেনা যেন সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রইল। ছেলেটা পড়ে আছে দূরে। সব কিছু প্রতিবন্ধক সত্বেও এই পৃথিবী স্পর্শ করেছে সে। যার বাপ ইতিমধ্যে মৃত, যার মায়ের ইতিমধ্যে মরা উচিত ছিল দশ বার। একটি ছেলে—ছোট্ট লাল টুকটুকে একটি ছেলে।

বাহুতে তুলে নিল সে তাকে। কোন দাই নেই, আবশ্যক কাজগুলি করবার জন্যে কেউ নেই পাশে। কুকুরের মত দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল সে নাড়ীটা! শাল থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে নাড়ীর মুখটা বেঁধে দিল। হিমশীতল হাত দিয়ে ছেলেটার গা মুছে দিল আর ভাবতে লাগল একটু জলের কথা—কয়েক ফোঁটা জল—যাতে ছেলেটার মুখখানি ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বাচ্চাটা কাঁদে—যেমন করে একটি সুস্থ পরিপুষ্ট ছেলে কাঁদে। ওলেনার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটি ছেলে—প্রথম ছেলে তার, তার দেহের প্রথম অবদান—যা চল্লিশ বছর বন্ধ্যা হয়ে ছিল। ছেলে হয়েছে তার—হয়েছে অনেক কিছুর পরেও।

"মিকোলা, ছেলে হয়েছে," বলতে চায় সে তার স্বামীকে খুশি করতে, তার -সমস্ত সহৃদয়তার প্রতিদান দিতে। একটি ছেলের কামনা দীর্ঘ দিন ছিল তার স্বামীর। কিন্তু একদিনের জন্যেও সে সম্বন্ধে কোন আঘাত দেয় নি সে ওলেনাকে —অনুযোগ করে নি, গালাগালি করে নি ; অন্যান্য মেয়েদের ছেলেপুলে হয়, কিন্তু সে নিজে এমন একটা বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে—যার সবল স্বাস্থ্যের অন্তরালে আছে শুধু বন্ধ্যাত্ব।

যে দিন প্রথম সে আবিষ্কার করে ফেলেছিল তার মাতৃত্ব—সেদিন সে নিজেও বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি। বার্ধক্যের প্রান্তে এসেছে, চল্লিশ তার বয়স। কিন্তু তবু তার মাতৃত্ব সত্য।

এরই কিছু দিন পরে মিকোলা সৈন্যদলে যোগ দিয়ে চলে গেল। যাত্রার মুখে ওকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল, কিন্তু ও জানে যে যে-ছেলে তখনও জন্মগ্রহণ করে নি তার কাছে বিদায় নেওয়া মিকোলার পক্ষে কত কঠিন। তবু তাকে যেতে হল।

তারপর মিকোলা যুদ্ধে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলেছিল, তবে, যাই।—কিন্তু তার এই যাওয়া, তাদের ভাবী জাতকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়া মিকোলার পক্ষে কতখানি যে কষ্টকর—ওলেনা তা জানে।

কিন্তু এখন মিকোলা আর নেই, যুদ্ধে মারা গেছে। ছেলে হল ওলেনার—যে ছেলে মিকোলা কামনা করেছিল। ছেলে হল জার্মান কারাগারে, ছেলে হল সেই জার্মানদের নির্লজ্জ দৃষ্টির সুমুখে—যারা প্রসবরত একটি নারীর প্রতিও সম্মান দেখায় নি এতটুকু।

ছেলেটা শুয়ে আছে খড়ের উপর—ভেজা আর ঠাণ্ডা খড়ের উপর। সেই নগ্ন কচি দেহটা বুকে চেপে ধরল সে, তাকে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগল ওলেনা নিজের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে। হঠাৎ কেমন ভয় হল তার—একটা অনুচ্চারিত ভয় : বহু দুঃখকষ্টের পরও যে শিশুটা জন্মাল, সে হয় ত মরে যাবে একটা পাখীর বাচ্চার মত, অন্ধ একটা বেরাল-বাচ্চার মত। তার নিজের দেহের উত্তাপে, তার নিঃশ্বাসের উত্তাপে গরম করতে চাইল সে শিশুটাকে, কিন্তু তার নিজেরই

হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বরফের মত, তীব্র শীত তার শিরায় শিরায় রক্ত জমাট করে আনছে যেন ধীরে ধীরে। দরজার কাছে দণ্ডায়মান সৈনিক দুটো নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে—তারপর একজন চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে আসে।

"এই যে—" নিতান্ত হেলাফেলাভাবে সৈনিকটা বলে।

একটি শার্ট, একটা ব্লাউজ এবং স্কার্ট এসে খড়ের উপর পড়ল। এ সব ওর নিজেরই। রাস্তায় বের করে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে এসব কেড়ে নিয়েছিল তারা। ওলেনা অত্যন্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে সৈনিকটার দিকে তাকাল। সৈনিকটা বোকার মত হাসল। কম্পিত হস্তে কচি ছেলেটার সর্বাঙ্গ শার্টটা দিয়ে জড়িয়ে দিল ভাল করে। কাপড়ের ভিতর থেকে তার কচি মুখটা কেমন অদ্ভুত দেখায় —যেন একটা পুতুল—দুর্বোধ্য নীল চোখ দুটি, যেন সবে চোখ ফোটা কুকুর বাচ্চার মত। আনন্দে তার বুকটা তোলপাড় করে ওঠে। কিছু একটা দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢাকতে পেরেছে এই শীতে—এইটেই তার কাছে মস্ত বড় হয়ে ওঠে—কিছুক্ষণের জন্যে আর সব কিছু সে ভুলে যায়। এবারে সব কিছু সহজ ভাবেই চলবে—মনে হয় তার; দুঃস্বপ্নের দিন যেন কেটে গিয়েছে। কাপড়-জামা পরতে গিয়ে তার হাত কাঁপে। একটুও গরম বোধ করে না— তবু এই মনে করে একটু ভাল বোধ করে যে, তার অত্যাচারক্লিষ্ট নগ্ন দেহের উপর ওই ছেঁড়া ফুটো কাপড়গুলোও সে জড়াতে পেরেছে। তার কোট আর শাল—যেগুলো ফেলে এসেছে সে জার্মান কমাণ্ডেণ্টের ঘরে—সেই দুটো যদি পেত সে!—মুখ বুজে থাকে সে কোন রকমে। যা আছে তার, তাইতেই চালিয়ে নেবে সে কোন রকমে। সামান্য একটু কাপড় দিয়ে বাচ্চাটাকে শীত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে—এই যথেষ্ট। ছেলেটাকে সে কোলে তুলে নিল—স্কার্টের কিয়দংশ দিয়ে ঢেকে দিল তাকে। শিশুটা সেই স্বল্প উত্তাপে নিঃশব্দে পড়ে রইল। এর বেশি আর ওলেনা কি চাইতে পারে? তার জামা কাপড় কিছুটা ফেরত পাওয়া—এটা কেমন রহস্যজনক লাগে তার কাছে, কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়। সে ঠিক বুঝতে পারে না। জার্মান সৈনিকটা কাপড়-জামাগুলো তার দিকে ছুঁড়ে

দিয়েছিল—সে দেখেছে, তবু যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল—ওগুলো যেন ছাদের তল থেকেই পড়ল, যেন তুষারাচ্ছন্ন মাঠ থেকে বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলেছে।

দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। ওলেনা দেয়ালে মাথা দিয়ে বসল—একটা জরতপ্ত তন্দ্রায় যেন সে আচ্ছন্ন হয়ে এল। পিঠে সে শীতের কাঁপুনি অনুভব করে—আবার গরম মনে হয়। তন্দ্রার মাঝখানে ওলেনা স্বপ্ন দেখে। মিকোলা যেন চলে যাচ্ছে পথ দিয়ে আর সামরিক কর্মচারীর সেই মেয়েমানুষটা—বেঁটে কালো মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে উল্টো দিকে। মিকোলা যেন কি বলল—সঙ্গে সঙ্গে ওলেনার বুকে একটা অসহ্য বর্বর ঈর্ষা যেন ছুরিকাঘাত করল। কেঁপে উঠল ওলেনা, সচকিত হয়ে জেগে উঠল—আর স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখল। না, মিকোলাও নেই—আর সামরিক কর্মচারীর সেই মেয়েমানুষটাও নেই। সেই চালাটা, এক আঁটি খড় আর কোলের উপর ছেলেটা—শাদা কাপড়ের আড়ালে কচি টুকটুকে লাল মুখটি। হঠাৎ তার ভয় হয়—ঘুমের ঘোরে ছেলেটা যদি পড়ে যেত তার হাত থেকে। তখুনি দেয়ালের দিকে আরও খানিকটা সরে গিয়ে বসে। তারপর আবার সে ঢুলতে থাকে।

অসংখ্য স্মৃতি অশ্রান্ত ধারায় তার মস্তিষ্কে তোলপাড় শুরু করে। বেলিফ চীৎকার করছে।... কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! টাঙির নিষ্ঠুর আঘাতে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে, তবু সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে আর লাল ফৌজের দল চলে যাচ্ছে তার পাশ দিয়ে। কিন্তু মিকোলা তাদের মধ্যে নেই। কুর্লি আছে—হাত নাড়ছে। তার হাতে কাপড়ের একটা মস্ত বাণ্ডিল। সে যাচ্ছে আর খুলে খুলে যাচ্ছে সেই কাপড় সীমাহীন পথে। আর সেই সংকীর্ণ শ্বেতশুভ্র পথ দিয়ে ওলেনার নবজাত সন্তান আসছে।

"দেখ—এরই মধ্যে সে দৌড়চ্ছে," ফেডোসিয়া ক্রাবচুক সবিস্ময়ে বলল। ওলেনা নিজেও ভয়ানক বিস্মিত হয়, তার তন্দ্রা ভেঙে যায়!

গলার ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে তার। ভয়ানক তৃষ্ণা পাচ্ছে। জিভটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে—আর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, যেন ওর নিজের নয় ওটা।

ঠোঁট ফেটেছে, আঙুল বুলোতে গিয়ে আঙুলে রক্ত লেগে গেল। কানের কাছে ঝিঁঝিঁর শব্দ, হাড়গুলোও যেন ব্যথায় টন্ টন্ করছে। একটা অসীম ক্লান্তির মাঝখানে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ও। ছেলের দিকে একবার তাকাল—ছোট্ট কপালখানিতে হাত দিল। মনে হল বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কপালটুকু—যদিও জানে জ্বরের উত্তাপে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। আবার তন্দ্রা নামে। এবার জলের স্বপ্ন দেখে—জল, জল, সীমাহীন অশ্রান্ত জলধারার—হ্রদমুখী এক প্রবাহিনীর। কিন্তু ওর সবগুলো বালতিই ফুটো—একটুও জল ধরে রাখা যায় না। হাঁটু গেড়ে ওলেনা বসে পড়ল। বরফের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় একটা গর্ত; ধারগুলো সবুজ। তরঙ্গসঙ্কুল গভীর কালো জল জীবন্ত সচল মূর্তির মত গর্তের বাইরে উথলে উথলে উঠছে, আবার বরফের তলায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার নিঃশব্দ সুদূর যাত্রাপথে। বরফের উপর পুরু স্তর পড়েছে তুষারের। কল থেকে যেমন ময়দার গুঁড়ো ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে তেমনি এক জায়গায় তুষারকণাগুলি জলের উপর ঝরে পড়ছে। জলে পড়েই সেগুলির রং হয়ে যাচ্ছে সবুজ—ঘূর্ণ্যমান জলপ্রবাহে কুণ্ডলায়িত হয়ে তাল পাকিয়ে যাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট দুখানি ভিজিয়ে নেবে বলে ওলেনা সেই ঘূর্ণ্যমান তুষারের একটি তাল ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু জলপ্রবাহে সেগুলো দেখতে দেখতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ওলেনা ধরতে পারে না।

তারপর হঠাৎ সেই গর্তটার চার পাশে ফাটল ধরে বরফে ভাঙন শুরু হয়। ওলেনার সমস্ত শরীর টলছে—পায়ের তলায় জলরাশির গভীরতা অনুভব করে। সমস্ত শক্তি দিয়েও মাথাটা সে খাড়া রাখতে পারে না। কচি ছেলেটার শান্ত স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পায়। ওর নিজের তখন জল খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ছেলেটা যখন দুধ খেতে চাইবে তখন বুকে ওর দুধ থাকবে ত? সে যে কত যুগ হয়ে গেল, একটু জল পেয়েছিল! দু-এক টুকরো বরফ মুখে পুরে দিয়েছিল কোন রকমে জার্মানগুলোর দৃষ্টির সম্মুখে। উঃ—কি তৃষ্ণাই না পেয়েছিল ওর—তৃষ্ণা মেটাবার কি অদম্য চেষ্টাই না করেছিল! ঠোঁট, জিভ, আর মুখে কি যন্ত্রণা—গলাটা কে যেন টেনে চেপে ধরেছিল। ভয়ানক হিক্কায় সমস্ত

শরীর যেন বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ধীরে ধীরে আবার সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। একটি শুভ্র বালুকাভূমি জেগে উঠল তার সুমুখে, গ্রীষ্মতপ্ত নদীতটের শুভ্র বালুকণাগুলি ধূলোর মত উড়ছে তার চার দিকে, যেন ময়দার গুঁড়ো উড়ছে ময়দা-কল থেকে। সেই শুভ্র কণিকাগুলির মেঘজালে সমস্ত পৃথিবী যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত মুখ চোখ ভরতি হয়ে যায়। এরই মধ্যে দিয়ে তাকে ছুটে যেতে হবে—যেমন করেই হোক। যেতে হবেই তাকে—এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব; একটি মুহূর্ত ও সে বৃথা যেতে দেবে না। কিন্তু বালিতে তার পা বসে যায়, আর উপরে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ। কুটীরগুলিতে আগুন লেগেছে—সমস্ত গ্রামটা জলছে দাউ দাউ করে। অগ্নিশিখা থেকে ছেলেটাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো প্রচণ্ড বাতাসে চার দিকে উড়ছে। তার শালে আর জামাকাপড়ে ইতিমধ্যেই আগুন ধরে গিয়েছে। এই গরমে সে কোট আর শাল পরেছে কেন? নিজেকে জিজ্ঞেস করল সে; এখন আর সেগুলো খুলে ফেলার সময় নেই। ছুটতে হবে তাকে—তার যত জোর আছে তত জোরেই ছুটবে সে—যাতে আগুনের শিখা স্পর্শ করতে না পারে তার শিশুকে। যাঃ, পুলটায় আগুন ধরে গিয়েছে—অগ্নিশিখা আকাশে দীর্ঘ বাহু মেলে দিয়েছে। হুড়মুড় করে সমস্তটা নীচে ভেঙে পড়ল। বড্ড দেরী করে ফেলেছে সে—যথাসময়ে ছুটে পালাতে পারে নি। এখন সমস্তটা যেন তার উপর ভেঙে পড়ল। হতাশ ভাবে ছেলেটাকে খুঁজতে লাগল। ছেলেটা পড়ে গিয়েছে তার হাত থেকে আর পুলের দগ্ধমান স্তূপীকৃত কাঠগুলো দাউ দাউ করে জলছে তার উপর। সে দেখতে পাচ্ছে বনের ভিতর থেকে—প্রজ্জলিত পুলটার চারদিকে জার্মানরা হাত নেড়ে নেড়ে কি বলছে আর চীৎকার করছে। তাদের চীৎকারে সে জেগে উঠল। একটা জার্মান সৈনিক পাশে দাঁড়িয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে ওকে ডাকছে।

সঙ্গে সঙ্গে ও আত্মস্থ হল। সৈনিকটা ইশারা করে উঠে দাঁড়াতে বলল। বহু কষ্টে সে উঠে দাঁড়াল—ছেলেটাকে চেপে ধরল বুকের কাছে। সৈনিকটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠেলে তাকে দরজার দিকে নিয়ে গেল। শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তার যেন ধাঁধাঁ লাগল। মাতালের মত টলতে টলতে সে সৈনিকটার আগে আগে চলতে লাগল একান্ত বাধ্যতায়। বুঝতে পারল—জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যেই আবার তার ডাক পড়েছে।

ভের্নের ঘৃণাভরে তার দিকে তাকাল। কি কুৎসিতই না ওলেনাকে দেখতে হয়েছে। মুখটা বিশ্রী ভাবে হলদে হয়ে গেছে। ফাটা ঠোঁট থেকে ক্ষীণ রক্তের ধারা চিবুক পর্যন্ত এসে শুকিয়ে গেছে। চোখের নীচেই মস্ত একটা আঘাত লাগার দাগ—কালো লাল আর বেগুনে হয়ে রয়েছে। বিশীর্ণ গালের দুই পাশে বিস্রস্ত জট ধরা চুলের গোছা। ফোলা নগ্ন দুটো পা রক্ত জমে কালো হতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপর আঙুলের টোকা দিয়ে ভের্নের মাথা নেড়ে সৈনিকটাকে একটা চেয়ার ওলেনার দিকে এগিয়ে দিতে ইঙ্গিত করল। ওলেনা বিস্মিত হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোন আদেশের অপেক্ষা না রেখে বসে পড়ল, তারপর স্থির-দৃষ্টিতে ভের্নেরের ফ্যাকাশে চোখের দিকে চেয়ে রইল।

"ছেলে; না, মেয়ে?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে ছেলেটার দিকে চেয়ে।

"ছেলে," দুর্বল কম্পিত কণ্ঠে ওলেনা জবাব দিল। ক্যাপ্টেন সৈনিকটাকে এক মগ জল আনতে আদেশ করল, সে জল নিয়ে হাজির করল। ওলেনার মনে হল, যেন আবার বিভ্রম হচ্ছে। মগটা চেপে ধরল ওলেনা—তারপর লোভীর মত তাড়াতাড়ি সেই ঠাণ্ডা জল ঢক্ ঢক্ করে গিলতে লাগল। তার যন্ত্রণাকাতর ঠোঁট, শুষ্ক জিহ্বা আর দগ্ধ কণ্ঠ অনুভব করতে লাগল জলের স্পর্শ।

"ব্যস্," ভের্নের বলল। সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকটা তার হাত থেকে জলের মগটা ছিনিয়ে নিল।

ওলেনা দুরন্ত হতাশায় পাত্রটার দিকে চেয়ে রইল। তার নাগালের বাইরে টেবিলের এক পাশে মগটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। মগটার ভিতরে জল তখনও কাঁপছে, একেবারে কাছে—ঠাণ্ডা আর সুন্দর জল। ঠোঁট দুটোতে যেন বেশি করে যন্ত্রণা হয়। তার শুষ্ক কণ্ঠ ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে যেন আরও বেশি তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে—এমন তৃষ্ণা যেন আগে ছিল না।

"ছেলেই হয়েছে তা হলে ! ..." টেনে টেনে বলল ক্যাপ্টেন। মতলবটা কি বুঝবার জন্যে ওলেনা নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন করে রাখল।

এই ঘরটার মধ্যে একটা যেন আতঙ্ক মিশে আছে—একটা বিপত্তির ভয় দেখাচ্ছে তাকে—যার রূপ সে কল্পনাও করতে পারে না। এই জল খেতে দেওয়া, বসতে চেয়ার দেওয়া, তারপর সামাজিক জিজ্ঞাসাবাদ—এগুলো এমন একটা ভীতির সৃষ্টি করে, সে কেঁপে ওঠে। সমস্ত দেহে সমস্ত পেশীতে সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে। স্থির দৃষ্টিতে সে ক্যাপ্টেনের মুখের পানে চেয়ে থাকে।

"যাক্—তোমার একটি ছেলেই হয়েছে তা হলে," আবার বলল সে। "ছেলেটি ত দিব্যি মোটাসোটা ! ..."

এর পর কি আসছে ওলেনা তারই জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

"সে যাই হোক, আশা করি এবারে তুমি বুদ্ধিমানের মত কাজ করবে। এখন আর তোমার নিজের কথাই ত শুধু নয়। তোমার ছেলের মরণ-বাঁচন এবারে অপেক্ষা করছে তোমারই উপর। তাই নয় কি ? হয় তাকে বাঁচাও, না হয় মারো।" আস্তে আস্তে বেশ স্পষ্ট করেই বলল কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গই ওলেনা ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরল। ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তার প্রত্যেকটি গতি, প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি।

"কাল রাত্রে কে একজন তোমাকে রুটি দিতে চেষ্টা করেছিল। সে কে ?" খুব হাল্কা কথার ছলে ক্যাপ্টেন শুধাল—যেন এ জিজ্ঞাসার কোন গুরুত্ব নেই।

"আমি জানি না ত !"

"তার মানে—তুমি জান না মানে ?"

"আমি জানি না।" সে তার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল। এমন ভাবে বলল যে তাতে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। এমন নিশ্চয়ই হতে পারে যে, সত্যি সে জানে না কিছু।

"তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে কার কার ছেলেপিলে আছে ?"

"ছেলেপিলে !" বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, "ছেলেপিলে সকলেরই আছে। থাকবে না কেন ?"

হ্যাঁ—সকলেরই ছেলেমেয়ে আছে, শুধু তারই ছিল না। এখন তারও আছে—একটি শিশু, একটি ছেলে, ছোট্ট একটি ছেলে। তার মায়ের জামায় সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে দু বাহুর অন্তরালে সে জার্মান কমাণ্ডাণ্টরের ভিতর গভীর ঘুমে অচেতন। জার্মানরা কি রকম—তার কিছুই জানে না সে। এখনও সে তা জানে না।

"কে তোমাকে রুটি দিতে আসতে পারে বলে তোমার ধারণা হয়? দশ-এগার বছরের ছেলেকে কে পাঠাতে পারে বলে মনে হয়?"

মনে মনে ওলেনা প্রতিবেশীদের সকলকেই ভাবতে লাগল। এ যে শুধু একটা তথ্য সরবরাহ করার জন্যে—তাই নয়। সে ভাবছিল তার অসহায় নিষ্ঠুর প্রয়োজনের সময়ে কে এসেছিল তাকে সাহায্য করতে, জার্মান বন্দুকের মুখে জীবন বিপন্ন করে কে এসেছিল তার জন্যে রুটি নিয়ে? তাদের সকলেরই ছেলেমেয়ে আছে, দশ-এগার বছরের কত ছেলেই ত আছে। তাদের মধ্যে কে হতে পারে?—সে ভেবে পায় না।

"আমি জানি না। গ্রামের মধ্যে কত ছেলে আছে। ছেলে প্রত্যেক ঘরেই আছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করল ভের্নের—বুঝতে পারল, সত্যিই সে কিছু জানে না।

"আচ্ছা, যাক সে কথা।... কুর্লি এখন কোথায় আছে—এটা নিশ্চয় বলতে পার।"

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওলেনা। আবার তা হলে সেই সবের পুনরাবৃত্তি। তার দু বাহুতে সে অনুভব করল তার ছেলের উত্তপ্ত দেহ—সাহস পায়, জোর পায়। জার্মানদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রজ্জলিত বেড়াজালে এখন সে একা নয়। এবারে ছেলে আছে তার সঙ্গে—সেই ছেলে, যার জন্ম হয়েছে একটা চালার ভিতর, ঠাণ্ডা মাটিতে, মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে; সেই ছেলে—যার জন্যে সে দীর্ঘ বিশ বছর অপেক্ষা করে ছিল।

সেই ছেলে তার সঙ্গে আছে—নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। ওলেনার বাহুবেষ্টনের অন্তরালে তার বুকের দ্রুত অস্পষ্ট স্পন্দন ধুক্ ধুক্ করছে পাখীর ছানার মত।

তার কচি গোলগাল লাল টুকটুকে মুখখানি, ক্ষীণ ভ্রূরেখা, ছোট্ট নাকটুকু—সব চেয়ে সুন্দর সে, জীবনে এত সুন্দর ও দেখেনি কখনও। একটা সীমাহীন প্রশান্তি, আর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মাঝখানে আত্মহারা ওলেনা। ওর ধারণা হল—ছেলে আছে, আর কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

"এখন কুর্লি কোথায় থাকতে পারে?" আবার জিজ্ঞেস করলে ভের্নের শান্ত ভীতিপ্রদ কণ্ঠে।

ওলেনা মাথা নাড়ল।

"আমি জানি না। ..."

"তুমি জান না ... কিন্তু তুমি যখন গ্রামে ফিরে এলে, তখন তারা কোথায় ছিল?"

"আমি জানি না। ... বনের ভিতর।"

"কোন্ বনের ভিতর?"

ওলেনা ভয়ে চমকে উঠল।

"বনের ভিতর ..."

জিজ্ঞাসাবাদে ওলেনার কাছ থেকে কিছুই বেরুল না। গ্রামের চারিদিকে সর্বত্রই প্রসারিত শুভ্র সমতল ভূমি। তার প্রান্তসীমা বনরেখায় বেষ্টিত—উত্তরে দক্ষিণে—পূর্বে পশ্চিমে। জেলার এই দিকটাতেই শুধু বনজঙ্গল নেই। এবং সেই জন্যেই ভের্নেরের সৈন্যদল নির্বিবাদে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে এই গ্রামে। কিন্তু ওদের অন্যান্য সৈন্যদলগুলি ক্রমাগত ঘটনাবিপর্যয়ের মধ্যে বিপর্যস্ত। যার ফলে সদর দফ্তর অনুসন্ধিৎসু হয়ে আছে সামান্য একটু খবরের জন্যে, কুর্লি আর তার গ্যেরিলা বাহিনীকে খুঁজে বের করবার জন্যে!

"এখানে ত অনেক জায়গাতেই বন-জঙ্গল ... তুমি গ্রামে ঢুকেছ কোন্ দিক দিয়ে?"

"আমার মনে নেই। ... আমি জানি না। তখন চার দিকেই বরফ পড়ছিল। তারা আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এনেছিল—এই যা আমি জানি।"

"বেশ। সেই রাস্তাটা কোন্‌টা?"

"আমি মনে করতে পারছি নে।"

"এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? গ্রামে ত মাত্র দিন চারেক হল এসেছ!"

ওলেনা বিস্মিত হল। গ্রামে সে এসেছে সত্যিই আজ ছ দিন। ভের্নের তা হলে আগের দু দিনের কিছুই জানে না! মাত্র ছদিন সে এসেছে জঙ্গলের সেই গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে, তবু মনে হয় সে যেন এক যুগ।

ভের্নের ধীরে ধীরে সিগারেট পাকিয়ে ওলেনার পাণ্ডুর বিক্ষত মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

"গ্যাখো, তুমি এখন মা ..."

আবার সেই কথা। কিন্তু এ কথা এখন সত্য, দু বাহুর আবেষ্টনীতে ঘুমন্ত একরত্তি টুকটুকে ছেলেটি, মায়ের জামায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া।

"তোমার এখন ছেলে আছে।"

ওর পাণ্ডুর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঈষৎ একটু হাসিতে—এ হাসি অন্তরের গভীর হাঁসি। ছেলে—হ্যাঁ, ওর ছেলে আছে।

"ছেলে তোমার বেঁচে থাকুক, ভাল থাকুক, বড় হোক—এ চাও তুমি?"

চায় বই-কি সে—গভীর ভাবে চায়, ছেলে বেঁচে থাকুক, সুস্থ থাকুক, বড় হয়ে উঠুক। দাঁড়াতে শিখবে—হাঁটতে শিখবে। সারা ঘরময় ছুটোছুটি করবে, ঘরের বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচিকচি আঙুলগুলি দিয়ে টেবিলের উপর থেকে চামচ তুলে নেবে। পিছু পিছু ধাওয়া করবে যত বেরাল, কুকুর আর বাছুরের। সব্জির বাগান থেকে গাজর তুলে নিয়ে আসবে। তারপর সে আরও বড় হয়ে উঠবে, ইস্কুলে যাবে। বগলে তার বই-খাতা আর মুখে গাম্ভীর্য। তারপর আর সে ভাবতে পারে না—কি হবে। ভাবতে পারে না—তার দু বাহুর আবেষ্টনীতে ঘুমন্ত একরত্তি ছেলেটা একদিন বড় হয়ে উঠবে, বিয়ে-থা করবে—তারও আবার ছেলেপিলে হবে।

"ওকে বাঁচাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে তোমার, নিজেও বাঁচবে—ছেলেটাকেও বাঁচাতে পারবে। উপায় আমি করে দিচ্ছি। নির্বোধের মত সে সুযোগ হারিও না।"

ওলেনা কোন উত্তর দিল না। ঠিক বুঝতেও পারছিল না—জার্মানটা ওকে কোন্ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। সারা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। কি চায় জার্মানটা? এত আস্তে আস্তে গুছিয়ে গুছিয়ে আকৃষ্ট করবার মত করে কথা বলে কেন? যেন লোকটা ওলেনার সুখদুঃখ—সবই বুঝে ফেলে মানুষের মত দরদ দিয়ে তাই কথা বলে। কিন্তু কেন?

"যেমন করেই হোক, আমরা তাদের খুঁজে বার করবই। দু-এক দিন আগেই হোক আর পরেই হোক—তাতে কিছু যায় আসে না। মনে রেখো আমাদের হাতে সবই আছে। লাল ফৌজ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে, চুকে গেছে সব কিছু। বোকার মত একরোখামি করে আর লাভ কি? তোমাদের দলের লোকেরা আছে জঙ্গলে, কি হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই জানে না তারা। চার দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, কোন দিক দিয়েই আর পালাবার উপায় নেই, বাঁচবারও পথ নেই। আজ না হোক, কাল তারা হাতে এসে পঁড়বেই। তখন তারা কঠোর শাস্তি পাবে। যাই হোক্, তাদের সঙ্গে পড়ে যে অপরাধ তুমি করেছ—তা ক্ষমা করব আমি। তারা তোমাকে প্ররোচিত করেছে, ঠকিয়েছে। তখন তোমার ছেলে ছিল না। ... তুমিই যে পুলটা একদিন উড়িয়ে দিয়েছ—এ সমস্তই চাপা দিয়ে দেব আমরা। এই গ্রামেই তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে। ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে পারবে। ..."

ওলেনা এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

"মনে করো না—আমি একটা পশু বা শয়তান। এ আমার কর্তব্য, এ ছাড়া আর কি-ই বা আমি করতে পারি! ... সৈনিক হিসাবে আমার যা কর্তব্য ... আমি তা করে যাই। তা ছাড়া আমার দেশের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে। ... তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। দুঃখ হয় তোমার শিশুটির জন্যে। তোমার জন্যে বলছি নে, অন্তত তোমার ছেলেটার দিকে চেয়েও তোমার বিবেচনা করা উচিত। তুমি তাকে জীবন দিয়েছে, সুতরাং সে জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার তোমারও নেই।"

"জীবন থেকে বঞ্চিত করা?" ওলেনা যন্ত্রচালিতের মত আপন মনে আওড়াল, যেন সে অন্য কিছুর কথা তখন ভাবছিল।

ভের্নের অধীরভাবে সিগারেটটা টেবিলের উপর ঠুকতে লাগল।

"কি বলতে চাইছি, বেশ ভাল করেই তুমি জান। আমার কথার জবাব না দিয়ে তোমার ছেলের মৃত্যুদণ্ডই কায়েম করছ। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, আমি অপেক্ষা করছি, ভেবে চিন্তে দেখো। কিছু বলবে, না, বলবে না আমার মনে হয়, এ বিষয়ে তুমি অবুঝ হবে না। তা ছাড়া, কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অথচ তুমি নিজেকে আর তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে।"

ভের্নের দেরাজ থেকে সিগারেটের তামাক ও কাগজ নিয়ে ধীরে ধীরে আর একটি সিগারেট পাকাতে লাগল। ওলেনা তার আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে রইল—মোটা মোটা আঙুলে লাল লোম। সিগারেট পাকাতে গিয়ে তামাকের কনিকাগুলি পড়ছিল, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ওর দৃষ্টি সে দিকে আবদ্ধ হল। দিয়াশলাই জ্বলল, খানিকটা নীল ধোঁয়া বৃত্তাকারে শূন্যে উড়তে লাগল।

"তারপর?"

ওলেনা তার কাঁধ ঝাঁকল।

"কথার জবাব দেবে না?"

"আমি কিছুই জানি নে।"

টেবিলের উপর দু হাতের ভর দিয়ে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়ে ওলেনার দিকে ঝুঁকল। তার চোখে মুখে রাগের ভাব ফুটে উঠেছে।

"তা হলে তুমি কথার জবাব দেবে না, তাই কি? আমি তোমার সঙ্গে মানুষের মত আচরণ করছি, আর তুমি ··· বেশ, তাই হোক। একটু অপেক্ষা কর, দেখাচ্ছি! ···হান্স!"

দরজায় একটি সৈনিক এসে দাঁড়াল।

"তোমরা দুজনেই এসো।"

দুজন সশস্ত্র সৈনিক এসে হাজির হল। ওলেনা তাদের চিনল, দুজনেই চালাঘরের সামনে সান্ত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিল, আর তার প্রসবের সময় নির্লজ্জের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

"তুমি একে ধরো। বাচ্চাটাকে আমি নিই।"

কি হচ্ছে বুঝবার আগেই একটা সৈনিক ছোঁ মেরে মায়ের কোল থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের ছিলার মত ওলেনা তার দিকে উঠে দাঁড়াল; কিন্তু দু দিক থেকেই লৌহহস্ত তাকে ধরে ফেলল। ওলেনা তার ক্ষিপ্ত দৃষ্টি ছেলের দিকে নিবদ্ধ রাখল। সৈনিকটা ছেলেটিকে এমনিভাবে হাতে তুলে ধরেছিল যে, ওর ভয় হল, হয় ত হাত থেকে বাচ্চাটা মাটিতে পড়ে যাবে।

"বাচ্চাটাকে টেবিলে শুইয়ে দাও!"

বাচ্চাটা টেবিলে শুয়ে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা পুরু সূতী কাপড়ের শার্ট দিয়ে ঢাকা—যেন একটি ছোট্ট বুচকি, টুকটুকে লাল মুখখানি ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। ভের্নের নিদ্রিত শিশুর দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকাল। হঠাৎ অতিক্ষুদ্র চোখের পাতা দুটি খুলে গেল, দুটি নীল সজল আঁখি দেখা গেল। গলাটি কেঁপে উঠল। ওলেনার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সদ্যোজাত শিশুটি অসহায় করুণ ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিল। এক একবার ছোট মুখখানি মেলছে, কপাল আরও রক্তিম হয়ে উঠছে, চোখের পাতলা পল্লব শাদা রেখার মত দেখাচ্ছে। ওলেনা ছেলেকে কোলে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সৈনিকের বজ্রমুষ্টির কবল থেকে সে নড়তে পারল না।

"আমাকে যদি তোমার ছেলে-রাখা-ঝি মনে করে থাক ত জবর ভুল করেছ," ভের্নের তার কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বললে। "এখন শোন, আমার প্রশ্নের জবাব দেবে?"

ওলেনা তার দিকে চেয়েও দেখল না। তার দৃষ্টি তখন ছেলের দিকে নিবদ্ধ। ছেলেটা তখনও কুকুরছানার মত কাঁদছে। একবার যদি ওলেনা ছেলেটাকে বুকে তুলে নিতে পারত, নাচিয়ে, দুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠাণ্ডা করত, সে ঘুমিয়ে পড়ত।...

"শুনতে পাচ্ছ কি বলছি আমি? আমার প্রশ্নের জবাব দেবে? এই শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি!"

ওলেনা জোর করে ছেলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে স্পষ্ট করে বলল: "না, আমার কিছু বলবার নেই। ..."

ক্যাপ্টেন ছেলেটার গা থেকে শার্টটা টান মেরে খুলে নিল। উলঙ্গ শিশুর পেটটা ফুলে উঠেছে, হাত মুঠো করা, পা দুটি উপরে ছুঁড়ছে, টেবিলের উপর পড়ে কাঁদছে। কুকুরছানার মত ছেলেটাকে ঘাড়ে ধরে দু আঙুলে শূন্যে তুলল। পা দুটি শূন্যে ঝুলছে। ওলেনা দেখতে পেল, ছেলের পায়ের ছোট্ট আঙুলগুলি, তাতে গোলাপী নখ—যেন ফুলের পাপড়ি।

"তা হলে?"

ভের্নের ধীরে ধীরে তার রিভলভারটি তুলে ধরল।

ওলেনা পাথর হয়ে গেল। তার হাত-পা যেন বরফের তালে পরিণত হল। ঘরটা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানটাও তার চোখের সামনেই একটা বিরাটাকার রাক্ষসে পরিণত হল। টেবিলের ওপাশে যে লোকটা এখন দাঁড়িয়ে আছে, দু মিনিট আগেও যার সঙ্গে কথা বলেছে, এ লোকটা যেন সে লোক নয়, ও যেন একটা বিরাটাকার দানব—যার মাথা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে। আর ওর ছেলে সেই অসীম শূন্যতার মাঝে একাকী ঝুলছে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সেই ছোট উলঙ্গ শিশুটি। চামড়ায় টান লেগে তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। কান্না থেমে গেছে, আর একটি শব্দও বেরুচ্ছে না তার গলা দিয়ে, শুধু পা দুটি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর কচি হাত দুখানি বাতাসে থাবা মেরে একবার মুঠো করছে, আবার খুলে ফেলছে।

"দেখব এবার তুমি কি—মড়া-খেকো বলশেভিক, না মা-ই!"

ওলেনা নিজেকে সম্বরণ করল। ক্যাপ্টেনকে আর বিরাট বলে মনে হল না, ঘরটার সমস্ত স্বাভাবিকতাও যেন ফিরে এল।

"বল, উত্তর দাও।"

"আমি মা।" ওলেনা বলল। এই নামেই জঙ্গলে তারা ওকে সম্বোধন করত। তাদের রেঁধে খাওয়ানো, তাদের জামা-কাপড় কেচে দেওয়ার জন্যে এই সুন্দর নামে তারা ডাকত ওকে। সে নামই সে বলল।

"তারা কোথায় আছে, তুমি বলবে তা হলে?"

ওলেনা তখন আর ছেলের দিকে তাকাচ্ছিল না। সে শুধু তাকিয়ে ছিল সোজা বর্ণহীন চোখের সীমান্তে ফিকে নীল চোখের দিকে।

"আমি কিছুই বলব না—কিচ্ছু না। কিছুই বলব না। ..."

রিভলভারের নলটা ওর ছেলের মুখের কাছাকাছি এগিয়ে এল। সে দিকে না তাকিয়েও ওলেনা যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল।

"এ তোমার একমাত্র ছেলে, তাই না?" ভের্নের জিজ্ঞাসা করল।

ওলেনা মাথা নেড়ে অস্বীকার করল।

"না। ..."

রিভলভার-ধরা হাতখানি শূন্যে কঠিন হয়ে গেল।

"কি, কি বললে? তোমার আরও ছেলেমেয়ে আছে? ছেলে—মেয়ে—গ্রামের মধ্যে—আছে?"

হঠাৎ একটি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর স্ফীত বিক্ষত পাংশু ঠোঁট দুটি।

"হাঁ, শুধু ছেলে ... অনেকগুলি ছেলে—অনেক, অনেক—ওই বনের মধ্যে ... কুলি—তাদের সকলে ... সেই বনের ভিতর ..."

গুলির শব্দ হল। সেই কচি মুখখানির উপর এসে গুলি লাগল। বারুদ আর ধোঁয়ার গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্তম্ভিত ওলেনাকে সৈনিক দুটো ধরে রইল।

ক্যাপ্টেন সেই কচি মৃত দেহটা নাড়তে লাগল।

"এই যে মা! ..."

ছোট্ট দুখানি পা, দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ কচি হাত দুখানি ঝুলছে। মুখখানা উড়ে গেছে, শুধু রক্তাক্ত একটা ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান।

"তোমার জন্যেই শেষকালে তোমার ছেলের এই হল," ভের্নের বলল।

এখন কি করছে তারা সেখানে? তারা কি আগুনের চার পাশে ঘিরে বসেছে? অথবা, সেই বনের পথ দিয়ে জার্মান বাহিনীর দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে? জার্মানদের হেড কোয়ার্টারটা যেখানে সেই বাড়ীর চার পাশ তারা কি ঘিরে ফেলেছে? না, তারা আবার ফিরে যাচ্ছে বনের মধ্যে, বহন করে নিয়ে চলেছে তাদের আহত সঙ্গীদের। তার দিকে সৈনিক দুটো চেয়ে রইল—সংস্কারসঞ্জাত ভয়ে বিস্ময়ে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করছিল মৃত শিশুর গা বেয়ে রক্তের ফোঁটা মেঝেতে ঝরে পড়ছে। বিতৃষ্ণায় সে আঁতকে উঠল।

"এটাকে নিয়ে যা এখান থেকে!"

সৈনিক দুটো ইতস্তত করতে লাগল।

"তোদের আবার কি হল?"

ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিক দুটো মৃত দেহটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

"শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দেবে, কি, দেবে না?"

ওলেনা জবাব দিল না, সে শুনতেও পায় নি। তার দৃষ্টি তখন জানলা দিয়ে গিয়ে পড়েছে মাঠের উপর—সেখানে তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।

"জবাব না দিলে তোমাকেও শেষ করে দেব, বুঝলে!"

ওলেনা ওর কথা শুনতে পেল না, জবাবও দিল না। সব কিছুই ত শেষ হয়ে গেছে। ওর ছেলে আর বেঁচে নেই, যে ছেলের জন্যে ও বিশ বছর ধরে তপস্যা করে এসেছিল, সে আর নেই। ওর অন্তরের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে এসেছে, সেখানে আর কিছুই নেই, কেবল একটা মৃত শূন্যতা, ভয় নেই, আতঙ্ক নেই, স্পন্দনও নেই হয় ত।

ওলেনা রিক্ত দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। তার সে দৃষ্টি একেবারে উদাসীন। সে যেন একটা নির্জীব বস্তুর দিকে—একটা গাছের গুড়ি অথবা পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে।

"একেও নিয়ে গিয়ে শেষ করে ফেল্ !" ক্যাপ্টেন হুকুন দিল। "এ বাড়ীর সামনাসামনি নয়, কাছাকাছি সর্বত্রই ত ওর মত মড়া-খেকো ছড়িয়ে আছে। নদীই সব চেয়ে উপযুক্ত জায়গা !"

সৈনিকেরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওকে যে দিকে ধাক্কা দিল, ও একান্ত বশংবদের মত সেই দিকেই এগিয়ে চলল। হাঁ, এই গ্রামেই ও জন্মগ্রহণ করেছে, এখানেই ও বেড়ে উঠেছে, এখানেই ওর বিয়ে হয়েছে এবং সন্তান-কামনায় দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর সন্তান হল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা মাত্র মায়ের কোল আলো করে চলে গেল। ও নিজেই তার মৃত্যু ঘটিয়েছে ; ও নিজের চোখেই দেখেছে রিভলভারের নলটা কেমন আস্তে আস্তে বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে গেছে, রিভলভারটার গতিপথ ওর মুখের কথায় পরিবর্তন করবার কোন চেষ্টাই ও করে নি। না, ও একটি কথাও বলে নি।

"না, বাছা, আমি পারি নি," চুপি চুপি ও বললে, যেন মৃতপুত্র ওর কথা শুনতে পাবে।

চারিদিকে একবার তাকাল। দেখল একটা সৈনিক ছোট্ট মৃত দেহটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আনাড়ির মত, তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে। ওলেনা তার দু-বাহু প্রসারিত করল। সৈনিকটা মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল, তারপর, মৃত শিশুর দেহ বহন করাটা অপ্রীতিকর মনে করে নিজের দায়িত্বে মায়ের হাতেই তার সন্তানের দেহটা তুলে দিল। ওলেনা মৃতদেহটা বুকে চেপে ধরল। তখনও দেহটায় তাপ আছে, হাত-পা তখনও শক্ত হয়ে যায় নি। যেখানে মুখখানি ছিল সেখানে একটা ক্ষত না থাকলে যে-কেউ মনে করত যে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে।

সামনে ও পিছনে সৈনিক দুজন, মাঝে ওলেনা হেঁটে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে এ প্রশ্নটা একবারও তার মনে জাগে নি। হুকুমটা জার্মান ভাষায় দেওয়া হয়েছে, ও তার অর্থ বুঝতে পারে নি, তবে এটা বুঝেছে যে হয় ত এইখানেই তার জীবনের শেষ হবে। কিন্তু তবুও তার মনে কোন চাঞ্চল্য আসে নি। ছেলের মৃত্যুর সঙ্গেই তার সব কিছুরও শেষ হয়েছে।

বাতাসের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বরফকণা শূন্যে উড়ছে। ঘরগুলোর তুষারাচ্ছন্ন জানলার দিকে ওলেনা একবার তাকাল। জনপ্রাণীকেও দেখা গেল না। ও একাকীই হেঁটে চলেছে ওর শেষপথে, মৃত্যুর পথে। কোন দরজা থেকেই কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না, কোথাও কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরগুলো যেন মরে আছে। এখানে সেখানে জার্মানরা এটা ওটা করে বেড়াচ্ছে, তারা কেউ কয়েদীর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

ওলেনাকে পিছন থেকে বন্দুকের কুঁদার গুঁতো মেরে রাস্তা থেকে পায়ে-হাঁটা-পথে ঠেলে নিয়ে গেল। ও একটু বিস্মিত হল বটে, কিন্তু ওরা যেদিকে নিয়ে যেতে চায় সেই দিকেই ও চলল। যে সকল লোক জার্মান-প্রভুত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছে জার্মানরা তাদের গির্জার সামনেকার ময়দানে ফাঁসীতে লটকিয়ে দিয়েছে। ওর মনে হয়েছিল যে ওকেও তারা সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। যে পথে তারা চলেছে সে পথে ঘরবাড়ী কিছু নেই, ওটা নালার দিকের পথ। এখানে হাওয়া বাতাস বলতে গেলে একদম নেই, জায়গাটা ঢাকা।

ওলেনা জমে-যাওয়া পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, যেন মনে হচ্ছে ভাঙা কাচের উপর দিয়ে যাচ্ছে। এ চার দিনে তার পায়ের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি চরম, কেটে ফেঁটে ছড়ে একাকার। এখানে সেখানে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। এই পথেই গ্রামের মেয়েরা জল নিয়ে যায়। পথের উপর বরফের আস্তরণ পড়েছে। তার ক্ষতবিক্ষত পা দুটো বরফে পিছ্‌লে যায়, বরফের ধারালো টুক্‌রা-গুলো বিক্ষত পায়ে কেটে ঢুকে পড়ে। ওলেনা হঠাৎ পড়ে যায়। তারপর প্রত্যেক পদক্ষেপেই সে আছাড় খেয়ে পড়ে। তল পেটের কাছে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। হাঁটুর উপরে গরম রক্তের ধারা ঝরে পড়ে।

নীচে নদীটা বয়ে যাচ্ছে। বরফের পুরু আস্তরণে নদীটা আর দেখা যায় না। শুধু কয়েকটা গর্ত দেখা যায় যেখান থেকে গ্রামের লোকেরা জল নেয়। এই গর্তগুলোই নদীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ওলেনা দেখতে পেল, দূরে একটা অন্ধকার গর্ত, এখানে প্রত্যেক দিনের নতুন করে ভাঙার চিহ্ন বর্তমান। ও বুঝতে পারছিল না, কোথায় ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নালার ধারে অসংখ্য

মৃতদেহ পড়ে আছে, জার্মানরা এগুলিকে সৎকার করবার অনুমতি গ্রামবাসী-দের দেয় নি। সেখানে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে না। ওলেনা ত একটা সামান্য গেঁয়ো মেয়েমানুষ, তাকে কি গুলি করা হবে লাল ফৌজদের পাশে—যারা যুদ্ধ করে মরেছে?

"এই, কোথায় যাচ্ছ?"

ওলেনা তাদের ভাষা বুঝতে পারল না। কিন্তু বন্দুকের কুঁদোর আর একটা গুঁতোয় সমস্ত প্রাঞ্জল হয়ে গেল; এবং নির্দেশমত সে আবার হাঁটতে শুরু করল। সৈন্য দুটোর একটা সুমুখে, আর একটা পিছনে—তাকে নিয়ে চলল বরফের সেই কালো গহ্বরটার দিকে।

"বাচ্চাটাকে আমায় দাও," একটা সৈনিক চীৎকার করে বলল এবং ছেলেটার জন্যে হাত বাড়াল। ভীতার্ত ওলেনা সেই মৃতদেহটাকে বুকের উপর চেপে ধরল—যেন ওরা এখনও কোন অমঙ্গল নিয়ে আসতে পারে ওর দেহের উপরে। যেন এখনও কোন মহাবিপদ ডেকে আনতে পারে।

"দে, ওটা আমায় দে!" সঙ্গের সৈনিকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল এবং ওলেনার হাত থেকে কেড়ে নিল। কচি দেহটা বরফের উপর গেল পড়ে। ওলেনা হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে, তার ছেলের কচি দুটি হাত, পা দুটি তখন নীল হয়ে গেছে, দেহের সমস্ত গোলাপী লাবণ্য নিশ্চিহ্ন! ঘণ্টা খানেক আগের কচি রক্তাক্ত মুখখানি কালো হয়ে যেন জমাট বেঁধে গেছে।

কচি দেহটা ওলেনার তুলে নেওয়ার পূর্বেই একটা সৈনিক তার উপর সঙ্গীনের খোঁচা মেরে শূন্যে ছুঁড়ে দিল! বরফের সেই গহ্বরটার কাছেই গিয়ে পড়ল দেহটা, আর একটা সৈনিক ছুটে গেল সেই দিকে। সঙ্গীনের আগায় তুলে ধরল উপরে এবং আবার ছুঁড়ে দিল। এবার লক্ষ্য স্থির হল—জল ছিটকে উঠল, কতকগুলো বুদ্বুদ উঠল সেই গভীর কালো জলের উপর। দেহটা বরফের স্রোতে ভেসে গেল।

ওলেনা হাঁটু গেড়ে বসে রইল নিঃশব্দে। এখন সে তার স্বপ্নের কথা বুঝতে পারছে। চিনতে পারছে সেই জায়গাটা, বরফের উপরকার সেই অন্ধকার গহ্বর,

বরফের ধারগুলো সবুজ, আর অন্ধকার গহ্বরের ভিতর তরঙ্গিত জীবন্ত জলপ্রবাহ। নদীটার তীরে, বরফাবৃত নদীর উপর তুষারের পুরু আস্তরণ পড়েছে। গর্তটার কাছে যেখানে দেহটা গিয়ে পড়েছিল সেখানে রক্তের একটা চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

প্রাণহীন দৃষ্টিতে ওলেনা তাকিয়ে রইল সেই অন্ধকার জলস্রোতের দিকে। ওই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই কচি দেহটা; তার ছেলে আর নেই। শুধু ওই একটু চিহ্ন, বরফের উপরে শুধু একটু রক্তিম আভাস, শুভ্র তুষারাচ্ছাদনের উপর একটু ইঙ্গিত আঁকা আছে—সে বেঁচে ছিল। বরফের তলা দিয়ে স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোন্ দূরে অজানা গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! কখনও প্রবল বেগে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা পাথরের উপর আছাড় দিয়ে ফেলছে, কখনও উপরে ভাসিয়ে তুলছে, বরফের আঘাতে দেহটাকে থেতো করে ফেলছে! না, না, ওলেনা জানে, সে খুব ভাল করেই জানে, তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে যে, তাদের নিতান্ত আপনার ওই প্রিয় নদী ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলায় ছোট দেহটিকে সযত্নে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—ঠিক মায়ের মত সস্নেহে বুকের ভিতর ঢেকে নিয়ে চলেছে, সস্নেহে ধুয়ে দিচ্ছে তার রক্তের দাগ, বন্দুকের গুলির জ্বালা আর জার্মান-স্পর্শের কালিমা। তাদেরই মাতৃভূমির নির্মল জল! দু হাত বাড়িয়ে ওই জল বুকে তুলে নিয়েছে সেই ছোট্ট দেহটি —যা পুরো একটি দিনও বাঁচবার সুযোগ পায় নি। ওদের আপনার, ওদের দেশের নদী!

সৈনিক দুটো পরস্পরের মধ্যে কি আলোচনা করছে, যেন কি একটা ফন্দি আঁটছে, আর সেই জলের গর্তটাকে ভাল করে নজর করছে, মাপ-জোখ করছে। ওলেনা একটুও নড়ল না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে—যেগুলি বার বার বরফের তলা থেকে উছলে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়।... তার ছেলের মৃত দেহটি এখন কোথায় ভেসে গেছে, কেউ তাকে আর খুঁজে বার করতে পারবে না। বরফ জমেছে পুরু হয়ে, তার উপরে

তুষারের আচ্ছাদন। যত দূর দৃষ্টি যায়—শুধু তুষার আর তুষার। গভীর সেই তুষারের তলা দিয়ে বরফের তলা দিয়ে জার্মান দৃষ্টির অন্তরালে বয়ে চলেছে অদৃশ্য জলপ্রবাহ। "কোথায় বয়ে চলেছে?" ক্ষুব্ধ মনে ওলেনা ভাবে, আর মনে পড়ে জলপ্রবাহ বয়ে চলেছে পূর্ব দিকে। তার প্রাণে আনন্দের বান ডেকে যায়। ছেলে তার ভেসে চলেছে তার নিজেদেরই জনগণের দিকে, ভেসে চলেছে জার্মান-শৃঙ্খলমুক্ত একটা দেশের দিকে। যেখানে গিয়ে সে পৌঁছবে নিশ্চয় সেখানেও এই রকম জলের গর্ত আছে—সেখানে লোকেরা দেখতে পাবে। কি হয়েছে না হয়েছে সবই বুঝতে পারবে। গুলিতে ছিন্নভিন্ন মুখখানির দিকে চাইবে তারা, আর বুঝতে পারবে সব। হয় ত তারা ওই ছোট্ট দেহটিকে যথাযোগ্য ভাবে কবর দেবে তাদের দেশের মাটীতে। কিন্তু যদি সে জলের উপরে ভেসে না ওঠে! তা হলে বসন্ত কাল যখন আসবে, যখন বরফ গলতে থাকবে, নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি তীরপ্রান্তর প্লাবিত করে দেবে তখন হয় ত দেখতে পাবে তারা সেই ছোট্ট দেহটি। ...

সৈনিক দুটো পরস্পরের মধ্যে কি যেন বোঝাপড়া করে। কয়েক পা এগিয়ে যায়, আবার কি মাপ-জোখ করে, তারপর তাদের একজন জলের গর্তটার দিকে এগিয়ে যায় এবং বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে বরফের একটা বিরাট চাপ ভেঙে ফেলে। তুষারের মধ্যে একটা দীর্ঘ কালো ফাটলের দাগ পড়ে। বরফগুলো জলের উপর পড়ে আন্দোলিত হয়। এবং গর্তের সবুজ পাশগুলো একটু দূরে ঝক্ ঝক্ করতে থাকে।

রাস্তায় কার পদশব্দ শোনা যায়। সৈনিকেরা সে দিকে চেয়ে দেখল—ক্যাপ্টেন ভের্নের আসছে। ওলেনা মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলে না পর্যন্ত। তখনও সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, যেন ওকে ভূতে পেয়েছে। চোখ দুটি জলের দিকে, ছোট ছোট চক্চকে ঢেউগুলির দিকে নিবদ্ধ।

ক্যাপ্টেন বুট দিয়ে ওকে গুঁতো মারতেই ও তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোন মনোভাবেরই ছাপ পড়ে নি।

"এই যে, এখানে! তোমার বাড়াবাড়ি এখুনিই চিরদিনের মত শেষ করে দিচ্ছি। এখনও বল, গ্যেরিলারা কোথায়?"

রুদ্ধ ক্রোধে ভের্নের কাঁপতে লাগল। সৈনিকদের হাতে ওলেনাকে জিম্মা করে দেওয়ার পরক্ষণেই সদর দফ্তর থেকে ভের্নেরকে টেলিফোনে ডাকে। হুকুম হয়েছে যেমন করে হোক, যে মূল্যেই হোক, গ্যেরিলাদের পাত্তা সম্বন্ধে সামান্য খবরও সংগ্রহ করতে হবে। সদর দফ্তর জানতে পেরেছে যে, ভের্নের তার বাহিনী নিয়ে যে গ্রামে ঘাঁটি করেছে, গ্যেরিলারা বেশির ভাগই সেই গ্রামের বাসিন্দা। ভের্নেরকে খবর সংগ্রহ করতেই হবে—কেমন করে করবে তা সে-ই বুঝবে। এই পাপিষ্ঠা সদর দফ্তরের কাম্য সকল খবরই জানাতে পারে, তারাও খুশি হয়, কিন্তু ও ত কিছুই বলবে না, এমন নির্বাক হয়ে আছে—যেন ওকে ভূতে ভর করেছে। এই দারুণ বাতাস ও তুষারের মধ্যেও ভের্নেরকে তাই দিশেহারা হয়ে নদীর ধারে ছুটে আসতে হয়েছে। সে ত তার শেষ হুকুম দিয়েছিলই, কিন্তু সদর দফ্তরের হুকুম পেয়ে তাকে আবার সেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হবে, আবার সেই ক্ষতবিক্ষত বিবর্ণ কুৎসিত ফোলা মুখটা দেখতে হবে। নিরুপায় হয়ে ভের্নের এই একগুঁয়ে অসভ্য স্ত্রীলোকটার কাছে প্রশ্নের একটা জবাবের জন্যে আবেদন করতে, প্রার্থনা জানাতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সে জানে যে, কোন ফলই হবে না তাতে। সদর দফ্তরের লোকদের পক্ষে বলা সহজ যে, 'আমরা সুনিশ্চিতভাবে দাবী করছি!' অন্যথা না করে খবর জানাবার দাবী করাও সহজ! তারা বলে দিয়েছে, 'সকল রকম উপায় প্রয়োগ কর।' ওর মনে হল যে, যত রকম উপায় থাকা সম্ভব সবই সে প্রয়োগ করে দেখেছে। অদৃষ্টক্রমে সব চেয়ে উত্তম উপায়ই তার হস্তগত হয়েছিল—সদ্যোজাত শিশু! কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না।…

"বাচ্চাটা কোথায়?" ভের্নের সৈনিকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছি," ছোট সৈনিকটা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল। কি আবার হল, ক্যাপ্টেন কেন এখানে আবার ছুটে এল, ছেলেটার কথাই-বা

আবার কেন শুধোচ্ছে, মাত্র মিনিট পনর আগেই না সে মৃতদেহটা নিয়ে আসতে হুকুম দিয়েছিল? সৈনিকটা ভয় পেয়ে গেল। এমনও ত হতে পারে, তারা হুকুমটা ঠিক বুঝতে পারে নি, হয় ত ভের্নের যা চেয়েছিল তা করা হয় নি।

ভের্নের হাত নেড়ে ইশারা করল।

"এই, শুনছ! গ্যেরিলারা কোথায়?"

ওলেনা উত্তর দিল না। যেমন এই একটু আগেও জলের দিকে তাকিয়ে ছিল একান্তভাবে, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই ক্যাপ্টেনের মুখের পানে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ও সবই দেখেছে; সব কিছুই—এতটুকু বাদ না দিয়ে। ভ্রূর চুলগুলা ফিকে রঙের, সেগুলিকে এমনি ভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে কপালের দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে যে, দেখলেই হাসি পায়। সিগারেটের এককণা কাগজ একপাশের কশে জড়িয়ে আছে। গাল দুটি রক্তিম শিরায় ভরা। সাদা পক্ষ্মগুলো ক্রমাগত মিট মিট করছে। একটা কান তুষারে ফেটে ফুলে উঠেছে, কাজেই অপরটার চেয়ে এটা খানিকটা বড় দেখায়।

"কি দেখছ তুমি? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, গ্যেরিলারা এখন কোথায় আছে?"

ভের্নের বুঝতে পারল যে কথাটা ওর মনে ঢোকে নি-ও শুনতে পায় নি, সুতরাং বার বার প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। একটা উৎকট ক্রোধে ক্যাপ্টেনকে পেয়ে বসল। ছেলেটাকে আর হাতে পাবে না, অত তাড়াতাড়ি তাকে শেষ করে ফেলেছে বলে এখন দুঃখ হচ্ছে। ছেলেটার গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া ওর উচিত ছিল, তারপর কান কেটে নেওয়া এবং চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলা। হয় ত তখন ওলেনা বিচলিত হত এবং হয় ত সম্মত হত। কিন্তু কাজটা সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে; আবার কাল সেই সদর দফ্‌তর থেকে তাগিদ আসবে। কি বোকা সে! কেন যে তাদের জানিয়েছিল—একটা গ্যেরিলা মেয়েমানুষকে সে গ্রেফ্‌তার করেছে। সদর দফ্‌তরের লোকেরা জানে না যে, এই স্ত্রীলোকটার কাছ থেকে কোন রকম কথা বার করা কত শক্ত! আর শুভার্থী বন্ধুরা এই রিপোর্ট দেবে যে, ক্যাপ্টেন ভের্নের বন্দীদের

কাছ থেকে কি করে কথা আদায় করতে হয় তার কিছুই জানে না; অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত দয়াশীল তার ব্যবহার এই সব স্থানীয় বোম্বেটে লোকগুলোর উপরে। ...

সে তার নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল এবং মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে হঠাৎ একটা সৈনিকের হাত থেকে এমনভাবে বন্দুকটা কেড়ে নিল যে, ভয়ে সে লাফ দিয়ে উঠল। ওলেনার দৃষ্টি আর ক্যাপ্টেনের দিকে ছিল না, তার দৃষ্টি ছিল সেই স্বচ্ছ জলরাশির দিকে তার নিরবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহের দিকে।

ভের্নের এক পা পিছিয়ে এল, তারপর তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওলেনার পিঠে বেয়নেট চালিয়ে দিল। ওলেনা তখন হাঁটু গেড়ে বসেছিল। ধাক্কা খেয়ে ওলেনা জলের গহ্বরটার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারকণাগুলি জলে গিয়ে ছিটকে পড়ল: যেন কল থেকে কিছুটা ময়দার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল। ওলেনা দেখল সেটুকু, তার মুখটা কালো জলের অত্যন্ত কাছাকাছি। তুষার-কণাগুলো যখন জলের উপর গিয়ে পড়ল তখন একটা সবুজ আভা ধরা পড়ল তার চোখে, তারপর সেই তুষার-কণাগুলি বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে তালের মত হয়ে জলের উপর নাচতে লাগল।

ক্যাপ্টেন বেয়নেটটা খুলে নিয়ে আবার দ্বিতীয় বার খোঁচা মারল। এবার ওলেনা কেঁপে উঠল এবং সেই তুষারাবৃত বরফের উপর ছটফট করতে লাগল, তার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল। চূর্ণ কুন্তলের কয়েকটি গোছা গিয়ে পড়েছে জলের উপর। জল-প্রবাহ সেই চুলগুলি নিয়ে দোল দিতে লাগল—যেন জীবন্ত জীব কতকগুলি।

"ওকে জলে ঠেলে ফেলে দাও," ক্যাপ্টেন হুকুম দিল।

সৈনিক দুটো লাফ দিয়ে এগিয়ে এল এবং কুঁদো দিয়ে ঠেলতে লাগল। কিন্তু গর্তটা ছোট, ওলেনার মাথাটা ঢুকে গেছে জলের মধ্যে, কিন্তু হাত দুটো তার তখনও বাইরে—যেন এখনও সে আত্মরক্ষা করতে চায়।

"ব্যাপার কি তোমাদের? একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে তোমরা পারছ না?" ক্যাপ্টেন সগর্জনে ফেটে পড়ল।

সৈনিক দুটো তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা ওলেনার হাত দুটো ভেঙে ফেলল, তারপর বরফের তলায় জলের মধ্যে জোর করে তাকে ঢুকিয়ে দিল। প্রথমে ডুবল তার বুক পর্যন্ত, তারপর তার কোমর অবধি। সৈনিক দুটো তারপর অত্যন্ত তৎপর হয়ে ক্যাপ্টেনের সুমুখে আরম্ভ করল পা দিয়ে আর কুঁদো দিয়ে ঠেলতে। ওলেনার গোটা শরীরটা যখন ঢুকে গেল তখন উপরে একবার জল উছলে উঠল। তখনও গর্তের বাইরে ফোলা পা দুটো বেরিয়ে আছে। মানুষের পা বলে চেনা যায় না। সৈনিক দুটো কুঁদো দিয়ে সেই স্ফীত বিক্ষত পা দুটোর উপরে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবার জল উছলে উঠল, আর সেই সঙ্গে উঠল কতকগুলি বুদ্বুদ। ওলেনার দেহটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বুদ্বুদ আর তরঙ্গ বরফের তলা থেকে উছলে উঠে আবার তার সুদূর যাত্রাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভের্নের বিড়বিড় করে গালাগালি দিতে দিতে বরফের পিচ্ছিল পথে টলতে টলতে ফিরে চলল। সৈনিক দুটোও রাইফেলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে তার অনুসরণ করল।

গর্তের ভিতর অন্ধকার জলরাশি ছল ছল করে উঠছে; বরফের ঝকঝকে ধারগুলোর কাছে সবুজ রঙের আভা। তুষারের উপর সৈনিকদের পায়ের চিহ্ন গভীর হয়ে পড়েছে। শুভ্র তুষারের উপর একপাশে শুধু একটু রক্তিম চিহ্ন তখনও দেখা যাচ্ছে—ওলেনার ছেলের মৃত দেহটা ওইখানেই ছিটকে এসে পড়েছিল। শুভ্র আস্তরণের উপর রক্তিম দাগটুকু তখনও সুস্পষ্ট ও গভীর হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন কোন দিনই ওটা মুছবে না। যত দিন না বসন্ত আসে তত দিন ওই দাগটুকু ওখানে থাকবেই। তারপর বরফ গলবে, তুষার গলে গলে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হবে, বন্ধনমুক্ত নদী তার উচ্ছ্বসিত জলরাশি সুদূর দিকদিগন্তর প্রবাহিত করে অসীম সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। তার স্বদেশের সেই প্রিয় সমুদ্র। …

পুসিয়া স্নান করছে। ফেডোসিয়া ক্রাবচুক বিষণ্ণ নীরবতার সঙ্গে জল বয়ে আনছে, আর আগে করে গরম জল ঢেলে দিচ্ছে টবে। পুসিয়া সেই টবে বসে তার কৃশ দেহে সাবান মাখছে। জার্মানটার সামনে ওর এতটুকু লজ্জা, এতটুকু শরম নেই। জার্মানটা পাশেই বসে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। ও যেন রান্নাঘরে স্নান করতে পারে না! ওর মত একজন স্বরুচিসম্পন্না মহিলার পক্ষে রান্নাঘর—অসম্ভব! ওর মত মেয়েদের তা সত্যি পছন্দ হওয়ার কথাও নয়। তা ছাড়া, জার্মানটাকে ওর বর অঙ্গের হাড়গুলো দেখাতে হবে, মেঝেয় যে জল ছলকে পড়বে তা আর একজনকে দিয়ে মুছিয়ে ফেলাতে হবে ত!

পুসিয়া গরম জল পেয়ে আহ্লাদে গদগদ। থেকে থেকে কুর্টের পানে চোরা-চাউনি নিক্ষেপ করছে। সারাটা সন্ধ্যা কুর্ট ছিল নীরব এবং বিষণ্ণ।

"কুর্ট! ..."

চিন্তা থেকে সে জেগে উঠল।

"কি বলছ?"

"চুপ করে আছ যে! তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি যে এখানে আছি, এটা তোমার নজরেই পড়ে নি। ..."

"বড় শ্রান্ত আমি," নীরসভাবে সে জবাব দিল।

"সারাটা দিন তোমার পথ চেয়ে ছিলাম, তুমি একবারটিও আসো নি আজ।"

পুসিয়া স্পঞ্জটা নিংড়াল। আর দেখতে লাগল, সাবানের সফেন জলধারা তার বুকের উপর দিয়ে নেমে আসছে।

"সারাটা দিন আজ কি দুর্ভোগই না ভুগতে হল," কুর্ট বিড় বিড় করে বলে। এতক্ষণ সে সদর থেকে পাওয়া টেলিফোন খবরের কথাই ভাবছিল। সেই স্ত্রীলোকটার কাছ থেকে যে সে কোন খবরই বার করতে পারে নি—এ খবর কালকেই সদরে জানাতে হবে। মেজর ক্ষেপে যাবে। তার ধারণা ছিল,

স্ত্রীলোকটার কাছ থেকে খবর আদায় করতে পারবে। সব সময়েই তার মনে হয়েছে, সব কিছুই সহজ, সরল। … দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভের্নের যখন পদোন্নতি আশা করছিল, ঠিক সেই সময় গ্যেরিলাদের ব্যাপারটা তার সে উন্নতির মুখে একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল, হয় ত সব কিছু ভেস্তে দেবে। গ্যেরিলাদের জন্যে নিজের মনে কোন দুর্ভাবনা না থাকলেও উপরওয়ালাদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এক দিকে ওরা তাদের খুঁজে বেড়াক, আর এক দিকে তারা পালিয়ে বেড়াক। … তারা অবশ্য এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, এ ব্যাপারটার যত কিছু দায়িত্ব কুর্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। সে নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এই কসিস্টক-ঘরণীর কাছ থেকে কতটা খবর আদায় করতে পারবে, তা আগে না জেনে কেন ওর গ্রেফ্‌তারের খবর সদরে জানাতে গিয়েছিল?

কুর্ট যেন কি ভাবছিল। পুসিয়ার মনে হল, কুর্ট যেন তারই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

"কি হল তোমার?"

ভের্নের আস্তে আস্তে সিগারেটে একটা টান দিল।

"দ্যাখো," সে বলতে শুরু করল, কিন্তু কতকটা যেন ইতস্ততের ভাব।

পুসিয়া তার কামানো ভুরু কুঁচকে সাগ্রহে শোনবার অপেক্ষা করতে লাগল।

"তোমার সেই বোনটির সঙ্গে একবার কথা বলতে পার না—য়্যা?"

পুসিয়া হঠাৎ এমনভাবে ঘুরে বসল যে, টবের সব জল ছলকে মেঝেয় পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় ফেডোসিয়াও একটা বালতি হাতে সেখানে উপস্থিত হল।

"এখানে এমন দাঁড়িয়ে কেন?" ভের্নের হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল।

ফেডোসিয়া কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভের্নের উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"আমার বোনের সঙ্গে কথা কইব?"

"হ্যাঁ, কি বললাম ত শুনতেই পেলে!" কণ্ঠে তার উষ্ণ গাম্ভীর্য।

"কিন্তু আমি কেন তার সঙ্গে কথা কইতে যাব?" বড় বড় গোল চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইল এবং রুগ্ন বানরের মত নিজের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে ওর মাথাটা কাঁধের দিকে নোয়াল।

"আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। হাঁ, আমায় সাহায্য করতে হবে। এতে কৌতুকের কিছু নেই। আছে বলতে চাও? তোমাকে একবার সেই মাস্টারণীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি যা জানতে চাই সে তার অনেক কিছুই জানে। বুঝলে?"

যন্ত্রচালিতের মত পুসিয়া স্পঞ্জটাকে একবার জলে ডুবিয়ে তখুনি আবার তুলে নিংড়ে ফেলল।

"সে আমাকে কিছু বলবে না।..."

"ছাখো, তোমাকে এমনভাবে কথা পাড়তে হবে যাতে সে কিছু বলবেই।... তাকে খুলেই বলো যে, তারা যা করছে, তার ফল শেষ পর্যন্ত খুবই খারাপ হবে; এত দিন আমি কিছু বলি নি, কিন্তু আমার ধৈর্য হারিয়ে ফেললে কি হবে তা সহজেই বুঝতে পারছ।..."

"কি করছে তারা?"

"তুমি একটি আস্ত গাধা!", সে রেগে উঠল।

পুসিয়া অভিমানে ঠোঁট ঝুলালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ে সাবান মাখতে লেগে গেল।

"তাকে খুলেই বলো যে, যদি আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে, তা হলে তার পক্ষে ভালই হবে। আমার বিশ্বাস, তারা ফিরে আসবে এ রকম বোকার মত প্রত্যাশা নিয়ে নিশ্চয় সে বসে নেই, আছে কি?"

পুসিয়া প্রশ্নের জবাব দিল না এবং সঙ্গে সঙ্গেই কুর্ট লক্ষ্য করল যে পুসিয়া ব্যথিত হয়েছে।

"কি হল আবার তোমার?"

"আমি গাধা, আমি কেমন করে তার কাছে সব কিছু খুলে বলতে পারি?"

"অভিমান? থাক—শোন, সত্যি আজ আমি বড় হয়রান হয়েছি। দিনটা যে কি বিশ্রীভাবে কাটল—বলতে পারি নে। অভিমান করো না, অভিমান করাটা বোকামি। তার সঙ্গে তুমি একবার কথা বলো, কেমন, বলবে ত?"

"সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে না।"

"কেন?"

পুসিয়া ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে কাঁধ দুটো একবার ঝাঁকাল।

"তুমি নিজে কি দেখতে পাও না যে, এখানে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না? আমি যেন একটা অস্পৃশ্য কুষ্ঠ-রোগী। ... দিনের পর দিন আমাকে একা ফেলে থাক, তোমার ত কোন অসুবিধা নেই। ..."

"এখনও সেই একই কথা ... বাদ দাও ওসব, আমি এখন যা বলতে চাইছি আসলে তা গুরুতর ব্যাপার।"

ভ্রূকুঞ্চিত করায় কপালে যে বলিরেখা পড়ল তা দেখে পুসিয়া ভয় পেয়ে গেল।

"তা হলে, বেশ। কিন্তু তার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা কইব?"

কুর্ট দরজার দিকে তাকাল।

"আমরা খবর পেয়েছি, গ্যেরিলাদের সঙ্গে ওর যোগ আছে। গ্যেরিলারা কোথায় লুকিয়ে আছে, সে খবরটা ওর কাছ থেকে চাই, বুঝলে?"

"আমাকে বলবে না।"

"আগে থেকে কেন স্থির করে বসছ যে, তোমাকে কিছু বলবে না? বুদ্ধি খরচ করে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সে বলবে।"

জলটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। পুসিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আস্তে আস্তে গা মুছে ফেলল। তারপর হাত বাড়িয়ে চেয়ার থেকে নৈশ পোশাকটি তুলে নিল। নরম সিল্কের স্পর্শে পুসিয়া খুশি হয়ে উঠল। এ পোশাকটির রং অস্পষ্ট নীল এবং হাতে ফুল তোলা। ভের্নের ফ্রান্স থেকে এনেছিল, কিন্তু আসবার পথে স্ত্রীকে দিয়ে আসার সুযোগ হয় নি বলে পুসিয়া সেটা এখন পরছে। সিল্কের জামার ভাঁজগুলো ওর গায়ে এমন মোলায়েমভাবে গিয়ে লাগলো

যে, ওর মনে হল সিল্কের সেই স্পর্শ যেন ওকে আদর করছে। স্নান করতে গিয়ে ভারী পরিশ্রম হয়েছে, তাই পুসিয়া এখন ঘুমোতে চায়।

"জামা-কাপড় ছাড়ছ না কেন?" রাগতস্বরে ভের্নেরকে বলে উঠল।

"ঘুমোবার সময় আমার নেই। গ্যেরিলাদের খবর আমাকে যেমন করে হোক জানতেই হবে। ..."

পুসিয়া তাঁর পাশে বসে নিজের গালটা নিয়ে ভের্নেরের জামার উপর চাপ দিতে লাগল।

"কুর্ট! ..."

বিরক্তির সঙ্গে সে সরে বসল।

"সত্যি, তোমার সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব।"

"রাত্রে লোকে কথা বলে কাটায় না," ঠোঁট ফুলিয়ে পুসিয়া বলল এবং কানের পাশ থেকে চুলের গোছা পিঠে গুছিয়ে রাখল। কিন্তু যেই লক্ষ্য করল যে, ভের্নের রেগে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই ও বলে উঠল, "বেশ ত, যাব। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে ও তাদের কথা জানে?"

"আমি জানি স্রী, তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না, বুঝলে? তুমি তাকে শুধু বলবে যে, আমি সব কিছু জানি। যদি সে বলতে রাজী না হয় ত তাকে আমি গ্রেফ্‌তার করব।"

"ও-ও-ওঃ!"

"কেন, তুমি কি মনে কর যে, সে এখানে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে, আর তোমার বোন বলেই আমরা নীরবে তা মেনে নেব?"

পুসিয়া হঠাৎ মাথা তুলল।

"আমার পক্ষে সবই সমান। তাকে গ্রেফ্‌তার করতে চাও—কর। তাতে আমার কি? তার সঙ্গে কথাও আমি বলব, কিন্তু জেনে রাখো যে, সে আমাকে ঘরে ঢুকতেই দেবে না। দেখতে পাবে তখন।"

"সে যাই হোক, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।"

"কে ওখানে?" চাপা গলায় সে শুধালো। যদিও সে আগে থেকেই সবটা বুঝতে পেরেছে। হাঁটু গেড়ে বসে সে ফোঁপাতে লাগল, হাত দুটো বাড়িয়ে তার জামার খস্‌খসে কাপড়টায় আর চামড়ার কোমর-বন্ধটার উপরে হাত বুলোতে লাগল। তার পাঁশুটে রং-এর টুপিতে লাল তারকার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা কান্নার বেগ আসে তার। লাল পল্টনটি একটু যেন ভয় খেয়ে গেল।

"হল কি তোমার, ব্যাপার কি?"

"তুমি—তুমি—তুমি!" চাপা গলায় ফেডোসিয়া বলল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যেন স্বপ্ন দেখছে; আনন্দে তার বুক তোলপাড় করে উঠছে।

"তুমি—তুমি …"

লাল পল্টনটি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধ ধরে একটু নাড়া দিল। স্বচ্ছ তুষারের ম্লান আলোয় দেখল, তার অশ্রুসিক্ত মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"কি হয়েছে তোমার?"

"কিছুই না, কিছু হয় নি। …" ফেডোসিয়া প্রাণপণে তার ভাবাবেগকে চাপা দিয়ে বলল কোনরকমে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সান্ত্রীর কথা। লাল পল্টনটির জামার হাত সে চেপে ধরল।

"আমার ঘরে জার্মানরা আছে। গ্রামের ভিতরেও আছে!"

"আমি জানি। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই মা। তুমি কি এই গাঁয়েই থাক?"

"নিশ্চয়ই। আমি ত এই গ্রামেরই। …"

"আমি জানতে চাই কখন এবং কেমন করে …"

"শোন বাবা, আমার ঘরের সামনেই একটা সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। বেশি ক্ষণ বাইরে থাকলে সে হয় ত আমাকে খুঁজতে শুরু করবে। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘর থেকে ঘুরে আসি। আর এক দিক দিয়ে

"নিশ্চয় চেষ্টা করব," স্নিগ্ধ কণ্ঠে ও বললে এই ভেবে যে, কালকের আগে ত আর কথা বলতে যেতে হবে না, স্মুতরাং এখন তা নিয়ে কুর্টের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই।

"চল, শুতে চল।"

সে উঠে দাঁড়াল এবং পা বাড়াতেই পড়ল গিয়ে জলের টবটার উপরে।

"ওটা গেল কোথায়? আর তুমিও ত রান্নাঘরে গিয়ে গা ধুতে পার।"

"রান্নাঘরে! সেই তার ঘরে গিয়ে!" পুসিয়া ঘৃণায় শিউরে উঠল।

ভের্নের হাত দিয়ে ইশারা করল। ফেডোসিয়া নিঃশব্দে এসে একটা হেঁচকা টান মেরে জলের টবটা আর বালতিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং পরক্ষণেই এসে আবার ভেজা মেঝেটা মুছতে লাগল। পুসিয়া ইতিমধ্যে শয্যা গ্রহণ করেছে; সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ফেডোসিয়ার দিকে চেয়ে রইল। ওর কি এখন ভাসিয়ার কথা কুর্টকে বলা উচিত? না, বুড়ী মাগীটা আরও কিছুটা উদ্বেগ ভোগ করুক। পুসিয়া অপেক্ষা করবে, স্মুযোগ একটা আসবেই। ...

ঘরের দরজা বন্ধ। ভের্নের জামা-কাপড় ছাড়ল। বুট খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলার শব্দ হল। আলো নিবে গেল। ফেডোসিয়া টবটার জল বালতিতে ভরে বাইরে ফেলে দেওয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস মুখেচোখে লাগল এসে। সান্ত্রীটা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল এবং ওর হাতে বালতি দেখে কিছুই বলল না আর। ফেডোসিয়া আগে ঘরটার চারিদিকে ঘুরল, তারপর সোজা খামার-বাড়ীর পিছনের সারগাদার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সে যখন বালতির জল ঢেলে ফেলেছিল তখন একটা তীক্ষ্ণ ফিস্ ফিস শব্দ শুনতে পেল হঠাৎ।

"মা, ও মা!"

চমকে উঠল ফেডোসিয়া, বালতিটা পড়ে গেল। তুষারোজ্জ্বল রাত্রি। খামার বাড়ীর পিছন থেকে সে দেখতে পেল ওই বায়ুতাড়িত শুভ্র তুষারকণার পটভূমিকায় একটি কালো ছায়ামূর্তি, আর স্মুপরিচিত টুপি। ভয়ে দম যেন তার বন্ধ হয়ে এল।

এখানে ফিরে আসব। তুমি এখান থেকে একটু সরে খামারের চালার পিছনে গিয়ে দাঁড়াও! খড় আছে সেখানে, আর আজ ত বিশেষ হাওয়াও নেই।"

লাল পল্টনটি তাকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল, হঠাৎ তার কেমন যেন সন্দেহ হল। ফেডোসিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

"কি হল বাবা? তুমি ভেবো না, আমি গাঁয়েরই, আমি যৌথখামারের লোক। ওই নালায় আমার ছেলেটি পড়ে আছে, সেও ছিল লাল পল্টন। ... একমাস পড়ে আছে সেখানে। শূয়োরের বাচ্চারা তাকে কবর দিতে দেয় নি, ন্যাংটো করে ফেলে রেখেছে। ..."

তার কণ্ঠস্বরেই লাল পল্টন বুঝতে পারল সব এবং লজ্জিত হল।

"তুমি ত নিজেই জান মা, কত রকমেরই না লোক আছে। ..."

"তুমি যাও ওখানে, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

কম্পিত হাতে বালতিটা তুলে নিয়ে সে ঘরে ফিরে এল। সান্ত্রীটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার হাসি পেল। ওই রকমই থাকো—এগোও আর পেছোও। কিন্তু আমাদের লোকেরা গ্রামের ভিতরে এসে পড়েছে। খামার-বাড়ীর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে একজন, অথচ তুমি কিছুই জান না তার। এখানে পাহারা দিচ্ছ তোমাদের কর্তার একটা বিলাসিনী স্ত্রীলোককে, তোমাদের কর্তার বিছানাকে ... ভাল করে পাহারা দাও। তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ...

ফেডোসিয়া দালানের বাইরের দরজাটা খুব ভাল করে বন্ধ করে দিল এবং রান্নাঘরের বেঞ্চখানা সরিয়ে যেন শোয়ার আয়োজন করল। শোয়ার-ঘর থেকে জার্মানটার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ফেডোসিয়া নিঃশব্দে দালানে ঢুকে পড়ল। উপরে ঘুলঘুলির ধারে একখানা আলগা ছোট তক্তা ছিল। তক্তাখানি সরিয়ে ফেলল এবং হামাগুড়ি দিয়ে সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে সাবধানে চালের উপর এসে পড়ল। এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে কাপড়-জামার দরুন কিছু অসুবিধা হচ্ছিল বটে; কিন্তু একথা ভেবে ওর মনে

কৌতুক বোধ হল যে, ওর বয়সের একজন বৃদ্ধা ওঠা-নামা করছে মেনি বেরালের মত। কথাটা মনে হতেই আপন মনে ও একবার হাসল।

বাতাসে খড়ো ঘরের চালে একটা খস্ খস্ শব্দ হচ্ছিল, তাই সান্ত্রীটা ওপাশ থেকে কিছুই শুনতে পেল না। মাটীতে নামতেই ওর বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল এবং কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। না, লোকটার মনে এ সন্দেহ কখনই হবে না যে, ঘরের ওপাশে ঘটছে কিছু। ঘরের পেছনে একটা খোলা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই এবং ঘরের সুমুখের দরজায় সান্ত্রীটা আগু-পিছু করে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ফেডোসিয়ার পক্ষে এখান থেকে ঘরে আসা সহজ, হঠাৎ আনন্দের সঙ্গে মনে হল তার।

বেরাল যেমন হামাগুড়ি দেয় তেমনিভাবে ও খামারবাড়ীতে পৌছল, কিন্তু সেখানে যেতেই ওর সর্বাঙ্গ হিমশীতল হয়ে গেল—কই, সেখানে ত কেউ নেই! চালাটা খালি পড়ে আছে। এ সবই কি তা হলে স্বপ্ন, অতি-প্রত্যাশা বা দুঃখ ভোগের উন্মাদ মরীচিকা? না, তা হতেই পারে না, কিছুতেই না। ...

"তুমি কোথায়?" সতর্কতার সঙ্গে চাপা-গলায় ও জিজ্ঞাসা করল।

খড়ের গাদার মধ্যে নড়াচড়ার দরুন একটা খসখসানি শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ফেডোসিয়ার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওখানেই তা হলে আছে। এবার আর সে একা নয়। তারা তিন জন—তিন! আরও দুজনকে দেখতে পেয়েই খুশির সঙ্গে ও ভাবল। চালার দরজার সামনে তারা নিঃশব্দে বসে বসেই এগিয়ে এল, এবং ফেডোসিয়া গিয়ে তাদের পাশে বসে পড়ল।

"কি আগ্রহ নিয়েই না আমরা তোমাদের প্রতীক্ষা করছি। দিন-রাত্রি কেবলই তোমাদের আসার পথ চেয়ে থাকতাম!" চুপি চুপি স্বর করে ও বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের জামার হাতায় আস্তে আস্তে চাপড় দিতে লাগল। আর আমার কি সৌভাগ্য যে, এ দেখবার জন্যে আমি বেঁচে আছি, বেঁচে আছি দেখবার জন্যে। ..."

"ঠিক আছে মা, ঠিক আছে সব; কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমাদের অনেক কথা আছে। ..."

সোভিয়েটের দফ্তর, এখন হয়েছে সেখানে ওদের দফ্তর। ... ওই খানেই গারদখানা, আমাদের পাঁচ জনকে সেখানে এখন জামিনদার-হিসেবে বন্দী করে রেখেছে।”

“আর আর সব জার্মানরা ?”

“ওই ময়দানের পাশে, প্রত্যেক ঘরে তাদের দেখতে পাবে। গ্রামের এই প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, সেখানে ওদের বেশি লোকজন নেই, তবে কিছু কিছু আছে। লিণ্ডেন গাছগুলির তলায় ওদের অনেক কামান আছে। কিন্তু সেগুলি অন্য রকম। ছোট ছোট। ...”

“বিমানধ্বংসী কামান ?”

“হতে পারে, কে জানে। ... সোজা তারা উপরের দিকে লক্ষ্য করে, সরু সরু ছোট নালীগুলো। ...”

“বুঝেছি। ওখানে কোন সাঁজোয়া গাড়ী আছে দেখেছ ?”

“নিশ্চয়ই, সাঁজোয়া গাড়ী আছে বই কি। ... সেগুলো সব আছে গ্রামের আর এক প্রান্তে। এখান থেকে ঠিক সোজা গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকলেই। এখানকার প্রত্যেকটি ঘরের দেয়ালে ওরা গর্ত করেছে, আর সেই প্রত্যেকটি গর্তের পিছনে আছে সাঁজোয়া গাড়ী।”

লাল পল্টনেরা ঝুঁকে পড়ল মানচিত্রের উপর। তারপর কতকগুলি চিকে আর বৃত্তের দাগ দিতে লাগল।

“ওরা ঘর থেকে সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা আছে। থাম, হিসেব করি কতগুলো আছে। এক ... দুই, তিন ... হ্যাঁ পাঁচটা ঘর। তারপর এখান থেকে ময়দানের দিকে যাওয়ার পথে একটা ঘর। ...”

“সেখানে অনেক জার্মান আছে না কি ?”

“ঠিক বলা যায় না। ... তারা অনবরত আসছে আর যাচ্ছে, শুধু তাদের ক্যাপ্টেন কোথাও যাওয়া-আসা করে না। সে-ই থাকে। ... ওরা বলে, ওদের প্রায় দু-শ লোক এখানে আছে। ...”

“সান্ত্রী কি অনেক আছে না কি ?”

"বেশ ত, বল শুনি। ··· কিন্তু—কিন্তু তোমাদের ত নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?" হঠাৎ ও বলে উঠল।

লাল পল্টনেরা হাসল।

"না, দরকার নেই, আমরা এখানে খেতে আসি নি।"

"বেশ, তা হলে কি জিজ্ঞাসা করতে চাও কর।"

"এই গাঁয়েই তোমার ঘর?"

"নিশ্চয়ই, আর কোথায় হবে?" ফেডোসিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বল্লল, "এই খানেই আমার ঘর, এই খানেই আমি জন্মেছি, এই খানেই এত দিন্ন কাল কাটিয়েছি।"

"কয়েকটা জিনিস আমরা জানতে চাই! ··· জার্মানরা থাকে কোথায়? ওদের কি কি আছে এখানে?"

ফেডোসিয়া যেন কৃতার্থ হয়ে হাততালি দিল।

"আমাদের পল্টনেরা কি গ্রামে আসছে?"

"তারা ঠিকই আসছে। ··· আগে আমরা অবস্থাটা সব জানতে চাই।"

"তা বেশ।" ... হাঁটুর উপর হাত দুটো রেখে ফেডোসিয়া বলতে লাগল, "আমাদের গ্রামটা বেশ বড়, ঘর আছে তিন শ। এই খানে দুটো রাস্তা দু দিক থেকে এসে মিশেছে, চৌমাথার কাছে একটা ময়দান আছে। এক সময় ওরই পাশে একটা গির্জা ছিল। এখন তার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।"

"একটু দাঁড়াও।"

একখানা মানচিত্র বার করে তার উপর তারা ঝুঁকে পড়ল। তাদের একটা জামা আড়াল ক'রে দেখতে লাগল টর্চের আলোয়।

"পেয়েছি, এই যে, চৌমাথা। মাঝখানে ময়দানটা। ..."

"গির্জার ধারের ময়দানে তারা কামান বসিয়েছে।"

"সেখানে কি অনেক কামান আছে?"

ফেডোসিয়া কয়েক মুহূর্ত ধরে ভাবতে লাগল।

"একটু থাম। ··· এক, দুই ··· তিন ··· চার। ··· হ্যাঁ, ঠিক চারটে। গির্জাটার ডান দিকেই একটা মস্ত বড় বাড়ী, এক সময় ওখানে ছিল গ্রাম্য

"না, ওরা আছে এখানে-সেখানে। যেমন আমার ঘরের সামনেই একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো কিছুই নয়—রাত্রে ত ওরা প্রায় মরেই থাকে, বলতে গেলে একপাও দূরে যেতে চায় না, আর তা ছাড়া, সব সময়ে ওরা জোড়েই থাকে। দিনের বেলায় ওরা খুব সাহসী, কিন্তু রাত্রিতে—ভয়ানক ভয় পায়, যদিও হুকুম-জারি করা আছে যে, সন্ধ্যার পর আমরা কেউ ঘরের বার হতে পারব না। কাউকে দেখতে পেলে তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সোজা গুলি চালায়। ..."

"রাস্তাটার মধ্যে কোথাও পুল আছে?"

"পুল? না, এ একটা সাধারণ রাস্তা মাত্র। ..."

"জঙ্গল আছে?"

"না, জঙ্গলও ধারে কাছে নেই। এখানে সেখানে দু-একটা গাছ ছিল। তারও বেশির ভাগই এই শূয়োরের বাচ্চারা জ্বালানির জন্যে কেটে সাফ করেছে। ওরা গরমটা ভালবাসে। ময়দানটার ওদিকে এখনও গোটা কয়েক লিণ্ডেন গাছ আছে রাস্তাটার উপরে। কিন্তু জঙ্গল কোথাও নেই, ক্রোশের পর ক্রোশ কেবলই খোলা মাঠ। নালার ধারে ঝোপঝাড় আছে বটে কোথাও কোথাও, আর কিছু নেই। আমাদের জ্বালানি কাঠের বড় অভাব, আমরা ঘুঁটে পোড়াই।"

অস্বস্তির সঙ্গে ফেডোসিয়া একবার তাকাল চারদিকে।

"ব্যাপার কি?"

"আমি একবার চার দিক দেখে আসি, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখবার জন্যে যদি সান্ত্রীটা এসে পড়ে।" ফেডোসিয়া নীরবে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করল। বাতাস ভয়ানক ভাবে গোঙাচ্ছে, নালার মধ্যে গিয়ে প্রবল ঝাপটা মারছে, খড়ো ঘরের চালা মচ্‌ মচ্‌ করে উঠছে। বাতাসটা একটু কমে যেতেই ফেডোসিয়া তার ঘরের সামনে সান্ত্রীটার ভারী পায়ের ওজন করা পদক্ষেপ শুনতে পেল। আরও শুনতে পেল তার পায়ের চাপে বরফ মস্‌ মস্‌ করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ফেডোসিয়া আবার চালায় ফিরে এল।

“সব ঠিক আছে, লোকটা এখনও আগু-পিছু হেঁটে বেড়াচ্ছে।”

লাল পল্টনেরা মানচিত্রখানাকে ভাঁজ করে ফেলল।

“আচ্ছা, আমরা তা হলে আসি এখন। ধন্যবাদ, মা।”

“ধন্যবাদের আবার কি হল? আমার ভাসিয়াও ছিল লাল পল্টনে। এখানেই তারা তাকে খুন করেছে, ঠিক গ্রামের প্রান্তে। ...”

টর্চের আলো তখন নিবে গেছে।

“কবে নাগাদ তোমাদের এখানে পাব?”

“সে কথা এখনই বলতে পারি নে। ... সেনাপতির আদেশের উপর তা নির্ভর করে। আর তা ছাড়া, সোজা এখানে আসার কোন অসুবিধা আছে কি-না তাও ত দেখতে হবে। ...”

“কেন, সোজা আসতে পারবে না কেন? তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করো, আর ত অপেক্ষা করা যায় না বাবা। একটা গোটা মাস আমরা তোমাদের আসার অপেক্ষায় আছি ... তোমাদের আসার পথ চেয়ে চেয়ে আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। ...”

“আসাটা ত সহজ নয়, মা।”

“জানি সহজ নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষেও ত অসহ হয়ে পড়েছে। ... তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা কর, বাছারা, যতটা পার ততটাই কর। ...”

সহসা ওর মনে কি ভাবের উদয় হল।

“একটু অপেক্ষা কর! আর একটা কথা। ...”

“কি ব্যাপার?”

“তাদের দলপতি, বলতে গেলে সেনাপতিই সে, আমার ঘরে আছে। ... কাছাকাছি কেউ নেই, কেবল মাত্র সান্ত্রীটা ঘরের সামনে আছে। লোকটা গাছের গুঁড়ির মত ঘুমোচ্ছে, সঙ্গে তার উপপত্নী। সান্ত্রীটাকে তোমরা সহজেই মেরে ফেলতে পারবে। হ্যাঁ, চালের উপর দিয়ে তোমাদের আমি নিঃশব্দে ভিতরে নিয়ে যেতে পারি। তোমরা অনায়াসেই তাকে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত ধরতে পার।”

লাল পল্টনদের মধ্যে সব চেয়ে যে ছোট, এ-কথায় তার চোখ দুটো আনন্দে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল।

"কি ভাবছ বাছারা ?"

"একটু সবুর কর, ভেবে দেখি। ..."

"এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে ? ঘাড় ধরে শূয়োরটাকে টেনে বার করে আনবে। এ ত অত্যন্ত সোজা কাজ !"

"ও, তাই কি ? এ সব কাজ গোড়ায় সহজই হয়। তাঁকে শেষ করলে, কিন্তু তারপর ? প্রাতে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে, সদর দফ্‌তরকে তারা খবর দেবে, সেখান থেকে প্রচুর সৈন্য এসে পড়বে, তখন ? ..."

"তবু তাতে কিছুটা লাভ আছে নিশ্চয়। ..."

"আমাদের চেষ্টার পথ তাতে সুন্দর ভাবে বন্ধ হবে—এ ছাড়া ত কোন লাভ দেখছি নে। এখানে তারা পরম আরামে নিঃশব্দে নিরাপদে প্রভু যীশুর স্নেহচ্ছায়ায় দিন কাটাচ্ছে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ, ক্যপ্টেনের বাসস্থানের সামনে একটি সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। আজ তাদের চমকে দিলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমার যে ওই শূয়োরের ঘাড় ধরে ঘরের বার করে দিতে সাধ যায়।"

"একটু সবুর কর মা। সময় আসবেই। এখনকার মত বাড়ী ফিরে যাই !"

"কিন্তু কোথায় তোমাদের বাড়ী ?" আগ্রহভরে ফেডোসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"এ আমাদের কথা বলার একটা ধরন, বুঝলে মা ? আমাদের বাড়ী অনেক দূরে। কিন্তু লড়াইয়ের সময় যেখানে আমাদের সৈন্যদল থাকে সে-ই আমাদের বাড়ী ! এখানে আসবার সময় আমরা বরফে ডুবছিলাম।..."

"পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে সোজা নীচে ওই নালার দিকে নেমে গিয়ে নদীর ধার দিয়ে চলে যাও। দেখতে পাবে, আমাদের ছেলেরা সেখানে মরে পড়ে আছে, কবর দিতে পারি নি, কাজেই সাবধানে যেয়ো। নদীই

তোমাদের সমতল ভূমিতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে, সেখানে তোমরা দেখতে পাবে ওখাবি ও জেলেন্তসি। সেখানেও কিন্তু জার্মান আছে।”

“তা আমরা জানি; কিন্তু এখান থেকে যেন ছুটতে না হয়।”

“ভেবো না তোমরা। এখানে যে একজন মাত্র সান্ত্রী আছে, সে আমার ঘরের সামনে আছে, এ ছাড়া আর কেউ নেই। চুপ করে চলে যাও। তবে একটা কথা মনে রেখো, যখনই বাতাস থামবে, তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলা বন্ধ করো, নইলে তোমাদের পায়ের চাপে যে মড় মড় করে বরফ গুঁড়ো হবে, সান্ত্রীটা সে শব্দ শুনতে পাবে।”

তিন মূর্তি ফেডোসিয়ার পিছন পিছন হামা দিয়ে চলল। ফেডোসিয়া যেখানে থামে, ওরাও থামে।

“এই নালা, সোজা নীচে নেমে যাও, কিন্তু খবরদার, রাস্তা কিন্তু বড় পিছল।”

“চললাম মা। সব কিছুর জন্যই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।”

“তোমাদের কল্যাণ হোক, বাছারা। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, ফিরে এসো কিন্তু। ...”

“প্রাণপণ চেষ্টা করবো—নিশ্চিত থেকো। কিন্তু তুমি এখনই ঘরে ফিরে যাও খুব শীত পড়েছে।”

“আমার তো কিছু হবে না, আমার সয়ে গেছে ”

ফেডোসিয়া নালার ধারে দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে রইল। তারা খুব দ্রুত নেমে চলেছে, এবং ক্রমেই বরফের পটভূমিকায় তাদের শুভ্র পোশাক-পরা ছায়া মূর্তিগুলিকে চিনে বার করা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। শেষটায় তারা তিমিরে ডুবে গেল, রাত্রির আঁধারে অন্তর্ধান করল, ধরা থেকে তুষারঝঞ্ঝার আর্তনাদ উঠে তাদের যেন গিলে ফেলল। এমনি নিঃশেষে তারা মিলিয়ে গেল যে, তারা যেন সেখানে কখনও আসে নি। ফেডোসিয়াও বাড়ীর পথ ধরল। ধীর মন্থর গতিতে ও হেঁটে চলল, যেন চলতে আর পারছে না। ওর মনে হল, মুহূর্ত কয়েকের জন্যে ও যেন কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছে, যেন এক মিনিটের জন্যে ও স্বাধীন হাওয়া আকণ্ঠ

পান করে এবার চলেছে স্বেচ্ছায় পরাধীনতার শিকল বইতে। দূরে ওর বাড়ীটার দিকে তাকাতেই ওর মনে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জাগল। ওখানেই ত জার্মানটা তার রক্ষিতাকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে, সেখানে গিয়ে ওকে বিরক্তিকর নাক ডাকার শব্দ শুনতে হবে।

হাঁ, ক্যাপ্টেন তখনও নাক ডাকাচ্ছে, তার নাক দিয়ে যেন কে শিস দিচ্ছে, আর ওই মাগীটা ঘুমোতে ঘুমোতে বিড় বিড় করে কি বলছে। ফেডোসিয়া ভয়ংকর ভাবে হাসল—প্রতিহিংসার আনন্দ ঃ শীঘ্রই তোমার পালা শেষ হচ্ছে। লাল পল্টনের দল আসছে, তারা এসে সোজা শয়নঘরে ঢুকে তোমাকে পালংকের শয্যা থেকে বার করবে টেনে।

আচ্ছা, তারা যখন গুড়ি মেরে এসে উপস্থিত হয়—ও শুনতে পেয়েছিল, না, ওরা যখন বাড়ী এসে পৌছয় ঠিক তখনই ও জেগে উঠেছিল ? না, তারা না আসা পর্যন্ত ও ঘুমোবে না, ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, ও ঘুমিয়ে পড়বে না, যত দিন না ওদের গ্রাম স্বাধীন হয়, তত দিন ওর চোখে ঘুম আসবে না।

সান্ত্রীর পায়ের চাপে বরফ মস্ মস্ করে গুঁড়ো হচ্ছে এবং ভের্নেরের নাকে রীতিমত ঐকতান চলেছে। সব কিছুই যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। কিন্তু তবু যেন সম্পূর্ণ বদল গেছে। ভাসিয়ার মৃত্যুর পর এক মাস কেটে গেছে, কিন্তু এমন আনন্দ ফেডোসিয়া একটি দিনের জন্যও পায় নি। আনন্দে তার বুক ভরে গেছে, সারা মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে আশার আলো দেখে জীবনের উৎসাহ যেন আবার ফিরে আসে। ফেডোসিয়া দু হাত্ দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরে, পাছে এই আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে ওঠে। এটা শুধু ও একাই জানে, গ্রামের আর কেউ জানে না। একমাত্র ফেডোসিয়াই জানে যে তাদের আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এত দিন সকলকে এতটা ধৈর্য আর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে ; কত দিন ওই ভাবে অপেক্ষা করতে হবে, কেউ তা জানে না। কিন্তু ও আজ জেনেছে যে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এখানে সে গুণে গুণে বলে দিতে পারে আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে। আজ, কাল, পরশু ? ওই তিনটি লোকের দলে ফিরে যেতে ক-দিন

সময় লাগবে? এক দিন, দু দিন, বড়জোর, তিন দিন? ও জানে, ও বেশ বুঝতে পারছে যে, তিন দিনের বেশি সময় কিছুতেই লাগতে পারে না। কমাণ্ডাণ্টুরের গারদে যে পাঁচ জন জামিনদার আটক আছে তাদের অমন নির্দয় মৃত্যু কখনই ঘটতে পারে না।

ভের্নের ওদের তিন দিন সময় দিয়েছে। কথাটা ভাবতেই হঠাৎ ফেডোসিয়ার মনে হল, এখন ওই তিন দিনের মেয়াদে জামিনদারদের কিছু আসে যায় না; বরং জার্মানদের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার মেয়াদই মাত্র আর তিন দিন আছে। লাল পল্টনের নির্মম মুখের দিকে চেয়ে এবার জার্মানরা দেখবে মৃত্যুর ছায়া।

গ্রামে তিন শ ঘর লোকের বাস। যে কয়েকটি বাড়ী থেকে জার্মানরা অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়েছে, মাত্র সেই কয়টি বাড়ী ছাড়া প্রত্যেকটি বাড়ীর লোক নিপীড়িত হয়েছে, চোখের জলের সঙ্গে ধৈর্য ধরেছে আর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই একটি মাত্র আশার পথ চেয়ে যে, লাল পল্টন নিশ্চয়ই আসবে। এ কথা মনে হতে যেন তারা যাদুমন্ত্রে বুকে বল পেয়েছে। গ্রামের মধ্যে আজ ফেডোসিয়াই একমাত্র জানে যে, তারা আসবে নয়—আসছে। এ বিষয়ে ওর আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, এখন তারা পথে। ও জানে, এখানে যে-জার্মান দলটি আছে তাদের শিয়রে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে, কোন আবেদনই সেখানে চলবে না। ওলেনা দেখবার জন্যে আজ বেঁচে নেই, কিন্তু যে পাঁচ জন জামিনদার কমাণ্ডাণ্টুরে আছে তারা যে দেখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেদিন রাত্রিতে মোড়ল গভীর রাত্রি পর্যন্ত কমাণ্ডাণ্টুর-এর দফ্‌তরে বসে ছিল। যৌথখামারের কাগজ-পত্রের সাহায্যে সে হিসাব করে দেখছিল—চাষীদের প্রত্যেককে কতটা করে খাদ্যশস্য দিতে হবে। আর তা ঠিক করতে সে একেবারে গলদঘর্ম হচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারা কপালটা ভরে গেছে। বার বারই হিসেবে ভুল থেকে যাচ্ছে। তেলের প্রদীপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘুম-জড়িত চোখে সৈনিকেরা পাহারা দিচ্ছে। গাপলিক হিসাব ঠিক করে,

অবশেষে হিসাব শেষ হল। বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। বাতাস মর্মান্তিক গর্জন করছে। মোড়ল আস্তে আস্তে তার ভেড়ার লোমের জামাটার বোতাম আঁটল।

"বাড়ী যেতে পথে আমাকে যদি কেউ দেখতে পায়", আপন মনেই সে বিড় বিড় করে বলল। তার বাড়ীর সামনে একটা সান্ত্রী মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু সান্ত্রীর রাইফেলের আশ্রয়ে পৌঁছতে হলেও তাকে এই ঘোর অন্ধকার ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে অনেকটা দূর যেতে হবে। সার্জেণ্ট তার কাঁধ দুটো ঝাঁকাল।

"তোমার কি হয়েছে? একা বাড়ী যেতে পারবে না? ক্যাপ্টেনের হুকুম না পেলে তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমি সৈন্য দিতে পারি নে।"

"কিন্তু আপনি—আপনি কি যেতে পারবেন না," ভয়ে ভয়ে গাপলিক ইঙ্গিত করল।

সার্জেণ্ট টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল।

"তুমি কি ভেবেছ? সদর থেকে যে-কোন মুহূর্তে ফোন আসতে পারে, আর তুমি কি না আমাকে আমার কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, আমি কি তোমার চাকর? অত ভয় পাচ্ছ কেন, বলতে পার? রাত্রি বেলা কেউ ত এখানে বাইরে বেরুতে সাহস পায় না।"

গাপলিক কোন জবাব দিল না, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বার হয়ে গেল। দেহলীতে সে একটু থামল। আলো থেকে বেরিয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ল—অন্ধকারও আবার সূচীভেদ্য। তাই চোখটাকে অন্ধকার সইয়ে নেওয়ার জন্যে মোড়ল মিনিটখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, নইলে রাস্তা ঠিক করতে, রাস্তার উপর গাছের অবস্থান ও ছাদের ছায়া-আকৃতি চিনতে পারবে না। জামার কলারটা উপর দিকে উল্টে দিয়ে সে বাড়ীর পথে এগিয়ে চলল। তিক্ততার সঙ্গে ওর মনে হল, হাঁ, তারা ওর সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে। ওকে ধমকাতে, মেজাজ দেখাতে, গালাগালি দিতে ওদের সকলকারই অধিকার আছে। ক্যাপ্টেন, সার্জেণ্ট, যে-কোন সৈনিক—সকলেই নিজেকে মনে করে ওর উপরআলা, ওকে

আবার যোগ করে, গুণ করে, প্রতিবারই ভুল হয়। ফলে সার্জেণ্ট খেঁকিয়ে ওঠে।

গাপলিক মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনই ফল হয় না। এ ধারণা থেকে সে কোন মতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছিল না যে, এ সবেরই হয় ত কোন প্রয়োজন হবে না। এর যে কোন প্রয়োজন হবে না, এর চেয়ে খাঁটি কথা আজকে আর কিছু হতে নেই। কাগজে কলমে হিসাব ঠিক করা সহজ, হিসাব করাও সহজ; জার্মান সরকারকে কার কতটা খাদ্যশস্য দিতে হবে তার যথাযথ হিসাব দেওয়াও সহজ। কিন্তু তাতেই ত আর হল না। ক্যাপ্টেন বা সদর দফ্তর শুধু কাগজেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তারা খাদ্যশস্য দাখিল করতে বলছে। তারা যেমন কাগজ চায় তেমনি খাদ্যশস্যও চায়, অথচ এরা যে জার্মানদের খাদ্যশস্য দেবে—এ বিষয়ে গাপলিকের মনে যথেষ্ট সন্দেহই আছে। যখন সব কিছু বলা এবং করা হয়ে যাবে, তখন তাকে—গাপলিককেই, সব কিছুর জন্যে দায়ী করা হবে। ক্যাপ্টেন তাকে চূড়ান্ত ভাবে শাসিয়েছে এবং মোড়লও জানে যে, জার্মানটা যে-কোন মুহূর্তে সেই শাসানিকে কাজে লাগাতে পারে।

গাপলিকের পরামর্শে জামিনদারদের আটক করেও এখন পর্যন্ত বাস্তবিক কোন ফল পাওয়া যায় নি। ওই ত ওখানে তারা আটক আছে, কিন্তু এখনও ত কেউ এসে খুদে ছেলেটার কোন খবরই দিয়ে গেল না। হয় ত ওকেই দায়ী করা হবে। অপরাধীকে খুঁজে বার করতেই হবে ক্যাপ্টেনকে; শুধু তাই নয়, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে অপরাধীকে সদর দফ্তরে হাজির করতে হবে; এবং সেই অপরাধী গাপলিকও ত হতে পারে।

"কি মাথামুণ্ডু লিখছ?" সার্জেণ্ট গর্জন করে ওঠে। "অঙ্কগুলি, দেখছি, গুলিয়ে ফেলেছ। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ভাবছ কি অত, বলতে পার?"

গাপলিক তোষামোদের হাসি হাসল। কি ভাবছে? যা ভাবছে তা সার্জেণ্টকে বলতে পারে না। মাথা গুঁজে লিখে চলেছে, একমনে, এবার যেন আরও বেশি পরিশ্রম হচ্ছে।

দিন-রাত্তির খেটে মরতে হবে, আর সর্বক্ষণই জীবনের আশঙ্কা নিয়ে চলতে হবে। একবার ভয়ে ভয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখল।

সান্ধ্য-আইন জারি হয়েছে, কিন্তু এই হতভাগা গ্রামে যে-কোন দুর্ঘটনা যখন-তখনই ঘটতে পারে। স্বয়ং সার্জেণ্ট বাইরে বেরুতে ভয় পায়। এ আর টেলিফোনের ব্যাপার নয়, তাই সে একেবারে হলদে মেরে গেল। তবুও কিন্তু সে গাপলিককে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বাইরে বের করে দিল—যেখানে প্রতিপদে বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে।

গাপলিক সহজ ভাবে চলতে চেষ্টা করল, নীরবে আত্মগোপন করে গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল, কিন্তু পায়ের চাপে বরফ মস মস করে গুঁড়ো হতে লাগল। তার উপর আবার মিনিট কয়েক বাতাসটা একদম পড়ে গেল, ফলে সারা গ্রামের লোকই তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। হঠাৎ তার মনে হল, সে যেন রাস্তার একটা বাঁকে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মেড়ল একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। ছায়াটা নড়ে না। কি হবে এই আশঙ্কায় গাপলিক ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে হল, সে ত অনায়াসেই ফিরে গিয়ে দফ্‌তরেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারে। অন্তত ভোর পর্যন্ত সেখানে বসে বসেও ত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ফিরে যেতেও তার ভয় হল—ওখানে যে রয়েছে সে অনায়াসেই পিছন দিক থেকে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।...

যা হবার হবে—এই সংকল্প নিয়ে সে এগিয়েই চলল। বাঁকের কাছে যেতেই দেখতে পেল একটা ঝোপ! অথচ দিনের বেলা এ পথ দিয়ে কত বার চলাফেরা করেছে, ঝোপটাকে দেখেছে, তবু সেটার অস্তিত্ব ভুলে গেল!

কিন্তু সেই মুহূর্তেই গাপলিক পা-হড়কে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল যে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সে হাঁপাতে লাগল। একটা কিছু দিয়ে তার চোখ দুটো বেঁধে দেওয়া হল, সারা মাথাটায় একটা পটি, ফলে মুখটাও ঢাকা পড়ে গেছে। সে চীৎকার করে উঠতে চাইছিল, কিন্তু বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা আঘাত পেয়ে সে মাটীতে পড়ে গেল। তারপরই সে

অনুভব করল যে, তাকে যেন চ্যাংদোলা করে নেওয়া হল এবং তাদের চলার সঙ্গে ওর দেহটা দুলতে লাগল। পায়ের চাপে বরফ গুঁড়ো হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে। তারপর একটা দরজা কড়্ কড়্ করে ওঠে, ওকে মেঝের উপর ধুপ্ করে ফেলল। ওর দেহে কার হাতের ছোঁয়া পেল, সঙ্গে সঙ্গেই ওকে বেঁধে ফেলা হল। শেষটায় ওর মাথায় মুখে যে কাপড়-চাপা ছিল সেটা সরিয়ে নেওয়া হল। গাপলিক মিট মিট করে তাকাল। ঘরের ভিতর একটা ছোট কেরোসিনের ডিবা টিম টিম করে জ্বলছে, তার অপ্রচুর আলোয় ঘরের ভিতরকার লোকগুলিকে দেখা গেল। আলেকজান্দ্র ও ফ্রসিয়া গ্রোখাচের কালো রঙের মুখ চিনতে পারল। গাপলিক কাঁপতে লাগল, মাথায় টাকটাও দুলতে লাগল—ওর কাঁপুনি আর থামেই না।

"আলেকজান্দ্র, বসে পড়," ছোটখাটো একটা বুড়ী হুকুম করল। তার সর্বাঙ্গে বলিরেখা। গাপলিক তাকে এর পূর্বে আর কখনও দেখেনি। "তোমাকে সব কিছুই লিখে নিতে হবে, আইনেও তাই বলে।"

তারা সকলে টেবিলের সামনে বসল। দেয়ালে হেলান দিয়ে গাপলিক ভয়ে ভয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। কেরোসিনের ডিবার অল্প আলোয় তাদের ছায়া পড়ল। ডিবাটা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে।

"ঠিক হয়ে দাঁড়াও, দেখছ না তোমার বিচারের আয়োজন হয়েছে," একটি খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক পরমোৎসাহে সশব্দে নিজের নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

দারুণ কষ্টে ও উঠে দাঁড়াল।

"এখানে দাঁড়া, উল্লুক! অত অস্থির কেন? মানুষের মত দাঁড়া!"

"ওর কাছে তুমি অনেকটা প্রত্যাশা করছ দেখছি, তের্পিলিখা," ফ্রসিয়া মন্তব্য করল।

তের্পিলিখা কথার মানে বুঝতে পারল না।

"ওকে ভাল করে দাঁড়াতে হবে। আদলত—আদালত। রাস্তায়ই ওকে শেষ করা চলত, কিন্তু ওর অপরাধের যথাযোগ্য বিচার হয়, আমরা তাই চাই। কাজেই, ওকেও ভদ্র ভাবে চলতে হবে।"

ভয়ে গাপলিকের গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। এই ঘরটার অস্তিত্ব ওর কাছে ছিল অজানা, আজ সেইখানে ও দাঁড়িয়ে। ঘরটা জার্মান কনাণ্ডাণ্টুরের গায়েই, এই গ্রামটা মাসখানেক আগে জার্মানরা অধিকার করেছে। টেবিলের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো তার বাঁধা। টেবিলের সামনে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও খোঁড়া আস্তাবলরক্ষক বসেছে। তারা ঘোষণা করলে যে, এটা আদালত আর তারা জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত মোড়ল গাপলিকের বিচার করে যথা-যথ দণ্ড দিতে সমবেত হয়েছে। এটা রাত্রির দুঃস্বপ্ন নয়, নির্মম বাস্তব।

"ওহে শুনছ, তোমার নাম?" তের্পিলিখা জিজ্ঞাসা করল।

গাপলিক জবাব দিতে চাইল। কিন্তু কথাগুলি তার গলায় আটকে গেল। সে অস্পষ্ট একটা শব্দ করল মাত্র।

"বিড় বিড় করছ কেন? ছেলেমানুষীর ভান করে কোন লাভ নেই। ওর দিকে সোজা তাকাও। বোকার মত কাজ করো না, যা জিজ্ঞাসা করব—জবাব দাও! তোমার মত একটা পাজীকে নিয়ে আমরা বেশি সময় নষ্ট করতে পারি নে। আলেকজান্দ্র, তুমি সব লিখে নাও। হাঁ, তারপর, তোমার নাম কি বল।"

"কিন্তু আমার নাম ত তোমরা জান," গাপলিক শুষ্ক কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলল।

"আমরা জানি, কি, জানি নে, সে তোমার দেখবার কথা নয়, তুমি আসলে একটা হিংস্র সাপ! আদালত—আদালত এবং যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে! কি নাম তোমার?"

"পিটর গাপলিক।"

"ভাব,—পিটর! আমার বাবার নামও ছিল পিটর। ... খাঁটি লোকের নামের কিছুটা বিশেষত্বও ত তোমার মধ্যে থাকতে হয়! ..."

"ঠাক্‌মা, একটু সবুর কর। লিখে নিতে দাও। ..."

"লেখো, লেখো, ঠিক ঠিক মত সব লিখে নাও। ... তারপর কি? ও হাঁ, মনে পড়েছে। তোমার বয়স কত?"

"আটচল্লিশ বছর।"

"আটচল্লিশ। ··· আটচল্লিশ বছর ধরে বসুমতী কেমন করে এ রকম একটা নোংরা জীবকে বুকে ধরে রেখেছেন, বুঝতে পারি নে! লিখে নাও, লিখে নাও আলেকজান্দ্র।"

"অনেকক্ষণ লিখে রেখেছি। তুমি প্রশ্ন করে যাও।"

"হুঁ। ··· তারপর কি? হাঁ। ··· তুমিই মোড়ল, তাই না?"

"হাঁ, মোড়ল," অপ্রসন্ন কণ্ঠে সে সায় দিল।

"মোড়ল। ও আরও কিছু হতে চেয়েছিল। ··· এর আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

গ্যাপলিক চুপ করে রইল, তার দৃষ্টি মাটীতে নিবদ্ধ।

"জবাব দিচ্ছ না কেন? লজ্জা, তাই না কি? মনে হয়, তুমি মোড়লের চেয়েও খারাপ কিছু। তাই কি?"

এবারেও সে কোন জবাব দিল না, কাঠের পুতুলের মত চোখ পাকিয়ে নিজের বুটের আগার দিকে চেয়ে রইল।

"ওহে, শুনছ? একটি ঘুষি মেরে এক পাটি দাঁত তুলে দিলেই জলদি জলদি জবাব বেরুবে! তারপর বল।"

"এক মিনিট সবুর কর, ঠাকুমা, আমি জিজ্ঞাসা করছি," আলেকজান্দ্র বলল।

ঠাকুমা আপত্তি করতে চাইলেন, কিন্তু ভেবে দেখলেন ওকেই জিজ্ঞাসা করতে দেওয়া ভাল। তাই হাত নেড়ে সম্মতি দিলেন।

"কর প্রশ্ন। দেখি তুমি কেমন বাহাদুর।"

মোড়লকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে আস্তাবলরক্ষক নীচু গলায় ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল:

"তুমি কয়েদ ছিলে, তাই না?"

মোড়ল তার নত দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারল না।

"অনেক দিন কারাগারে ছিলে?"

"অনেক দিন। ···"

"তাই নাকি, রস্তভের কাছে। ··· কিন্তু জার্মানদের সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?"

"সেখানে, রস্তভের কাছেই।"

"সেখানেই তারা তোমাকে জোগাড় করেছে ?"

"হাঁ।"

"একটু দাঁড়াও, আলেকজান্দ্র, তুমিই ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও কেন গারদবাস করেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা অনমনীয় অবাধ্যতা গাপলিকের চোখে মুখে ফুটে উঠল।

"কারাগারে কেন ছিলে, এর জবাব কি তুমি আমাদের দেবে না ?"

নীরব।

"তা হলে কুলাকদের শায়েস্তা করার পূর্বেই কারাগারে ছিলে ?"

"হাঁ।"

"তাই বল। ··· তুমি তা হলে পেৎল্যুরার দলের লোক ?" আলেকজান্দ্রর হঠাৎ এই প্রশ্নে গাপলিক বিস্মিত হল।

"হাঁ, আমি সেই দলের। ···"

তের্পিলিখা হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়লে।

"ভাব একবার !"

"সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেল," আলেকজান্দ্র আবার বলতে শুরু করল। "কুলাক, ডাকাত পেৎল্যুরা ঠগের লোক। গোড়া থেকেই তুমি সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে আসছ, তাই না ?"

"হাঁ, গোড়া থেকেই," গাপলিক আস্তে সমর্থন করল।

"অবশেষে জার্মানদের অধীনে চাকরিতে যোগ দিয়েছ ?"

টেবিলের পিছন থেকে তের্পিলিখা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে ওর জন্যেই লেভান্যুকের ফাঁসী হয়েছে, ওর জন্যেই কমাণ্ডান্ট-এর দফ্‌তরে পাঁচজন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বন্দী ! জার্মানদের দলে যোগ দিয়ে আমাদের গরুগুলোকে গোয়াল থেকে টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ও-ই, আমার সর্বশেষ

"কত দিন ?"

নীরব।

"কারাগারে ছিলে কেন ?"

আবার নীরব।

"এর আগে তুমি ছিলে—চাষী, কামিন, না ভূস্বামী ?"

তেপিলিখা একটা কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় মোড়ল অপ্রত্যাশিত ভাবে জবাব দিল :

"চাষী। …"

"তাই নাকি, কুলাক ?"

"তা হলে বোঝা যাচ্ছে উনি একজন কুলাক !" বিজয়োল্লাসে তেপিলিখা চেঁচিয়ে উঠল। "ইনি তা হলে চাষীর রক্ত আরও পান করতে চেয়েছিলেন !"

"ঠাক্‌মা, একটু থাম। …"

"কেন থামব আমি ? এটা কি একটা আদালত, না, কি ? তোমার যতটা কথা বলবার অধিকার, আমারও ততটা অধিকার আছে। হয় ত বেশিই আছে। যখন ও কোন প্রশ্নেরই ভাল জবাব দিচ্ছে না, তখন একজন বার বার একই কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ কি ? আমার জিজ্ঞাসার কিছুটা ফল ফলেছে।"

"ঠিক বলছ, ঠিক ! … একটু সবুর কর, আমি ওকে অন্য একটা কথা শুধোতে চাই।"

"বেশ, চালাও, প্রশ্ন কর।"

"তা হলে, তুমি একজন কুলাক ? … কিন্তু কারাগার থেকে পালালে কখন ?"

"লড়াই শুরু হতেই।"

"তাই বল। আচ্ছা, তারপর বুঝি বাড়ী গেলে, কেমন ?"

"হাঁ।"

"বাড়ী কোথায় তোমার ?"

"রস্তভের কাছে।"

গরুটিকে নিয়ে গেছে। ছেলেরা দুধের অভাবে মারা যাক, ওর তাতে কি! ও-ই তা হলে কালসায়্যকদের, মিগরদের, কাচুরদের গৃহপালিত জন্তুগুলি সব নিঃশেষে নিয়ে গেছে।"

"শুধু তাদেরই নয়, লিসি ও স্মলিয়াঙ্কেঙ্কোরও," ক্রসিয়া যোগ দিলে।

"জার্মানদের সঙ্গে মিলে ও গ্রামটাকে লুটপাট করছে!"

"আর আলোচনার দরকার কি? সব কিছুই ত সুপরিষ্কার।"

"চুপ কর তোমরা! তোমরা মেয়েমানুষ!" তের্পিলিখা বলল। অথচ সে-ই সকলের চেয়ে বেশি গোলমাল করছিল। "যদি একে আদালত বলতে চাও, তা হলে আদালত মনে করেই চলতে হবে; প্রত্যেককেই তার বক্তব্য বলতে দিতে হবে!"

"তা ছাড়া, এখানে আর বলবার কি আছে? কে কি রকম লোক, কোন্ বিষয় কি রকম—আমরা সবই জানি; রোজই তা দেখতে পাই। ওর জন্যেই প্রতি দিনই কেউ না কেউ নিহত হয়, প্রতি দিনই যেমন চোখের জল, তেমনি রক্তপাত হচ্ছে। ..."

"বেশ, তা হলে তোমাদের এখন বক্তব্য কি?" তের্পিলিখা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"ভুঁইফোড়কে একদম শেষ করে দাও!"

"শেষ করে দেবে!"

"সাথীগণ, শোন, এই ভুঁইফোড়কে শেষ করে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। কে কে এর পক্ষে?"

সব কয়খানা হাতই শূন্যে উঠল।

"বিরুদ্ধে কেউ আছ? তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে ভোট দিতে রাজী নও?"

"না, কেউ নেই।"

"বেশ, ভাল, ভাল। আলেকজান্দ্র, বেশ ভাল করে লিখে পড়ে শুনিয়ে দাও।"

আস্তাবলরক্ষক খানিকক্ষণ ধরে কি লিখল। তারা নীরবে সকলে প্রতীক্ষা করতে লাগল। অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল।

"আলেকজান্দ্র অভসি, গোর্পিনা তের্পিলিখা, ফ্রসিয়া গ্রোখাচ—এদের নিয়ে গঠিত আদালত ..."

"ইয়ুফ্রোসিনা," সে সংশোধন করে বলল। ঝুঁকে পড়ে আলেকজান্দ্র তা টুকে নিল।

"ইউফ্রোসিনা গ্রোখাচ, নাতালিয়া ল্যেমেশ, পেলাগিয়া পুজির—এরা জার্মানদের নিযুক্ত মোড়ল, যে এক সময়ে ছিল কুলাক এবং খুনে, সেই পিটর গাপলিকের মামলায় সওয়াল-জবাব করে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন।"

গাপলিক মড়ার মত বিবর্ণ হয়ে আদালতের চার দিকে অসহায়ভাবে চাইতে লাগল।

"তা হলে সব কিছুই ঠিকমত হয়েছে," তের্পিলিখা ঘোষণা করল।

"তবুও একটু সবুর কর," ফ্রসিয়া বাধা দিয়ে বলল। "আমরা ওকে দণ্ড দিয়েছি, ঠিকই হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, কেমন করে ওকে শেষ করব ?"

কি করা উচিত স্থির করতে না পেরে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল :

"সত্যিই ত, কেমন করে দণ্ড দেব ?"

"ফাঁসী দেওয়াই ভাল," পেলাগিয়া পুজির বলল।

"কিন্তু কোথায় ফাঁসী দেব, এই ঘরে ?"

"তোমরা নির্বোধের মত কথা বলছ। কুড়ুল দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দাও, ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমরা ওকে গুলি করতে পারি নে, বন্দুক নেই আমাদের। ..."

"গুলি ? বল কি ! গুলির শব্দ পেয়ে জার্মানরা ছুটে এসে আমাদের সবাইকে ধরে ফেলবে না ?"

গাপলিক থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। তারা তারই সম্বন্ধে তারই সামনে আলোচনা করছে—কেমন করে তাকে হত্যা করা হবে। তারা এমন ভাবে আলোচনা করছে যেন ও ওখানে উপস্থিত নেই, যেন ও একটা গাছের গুঁড়ি মাত্র। আতঙ্ক যেন ওকে পেয়ে বসল, মাথাটা ওর ঘুরে গেল, ও বসে পড়ল।

"দেখো, তোমরা সকলেই ভালমানুষ, আমাকে দয়া কর! তোমাদের প্রতি অন্যায় আমি করেছি, কিন্তু আর কখনও করব না!"

হাঁটু গেড়ে বসে সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েদের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। ফুটন্ত জল পায়ে পড়লে যেমন আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায়, মেয়েরাও তেমনি পিছিয়ে গেল।

"সরে যা হারামজাদা!"

"দেখো, আমি দিব্যি করে বলছি, তোমাদের ছেলেমেয়েদের নাম করে বলছি!"

"আমাদের ছেলেপিলের নাম করে! শূয়োরের বাচ্চা, তোর জন্যেই না আমাদের ছেলেপিলেরা আজ মরতে বসেছে!"

"তারা আমাকে দিয়ে করিয়েছে, তারা জোর করে আমাকে দিয়ে এ-সব করিয়েছে," হতাশভাবে গাপলিক কাঁদতে লাগল।

"চেঁচানো বন্ধ কর্‌, নইলে আস্ত লাঠি ভাঙব তোর পিঠে। ... শোন কথার ছিরি, তারা আমাকে দিয়ে এ-সব করিয়েছে, উনি যেন কচি খোকা! ... কিন্তু তুই-ই না তাদের সঙ্গে মিলবার জন্যে রস্তভের পথে ধাওয়া করেছিলি, কেমন কি না?"

"দয়া কর, ক্ষেমাঘেন্না কর," গাপলিক প্যান প্যান করতে করতে মেঝেময় বুকে-হাঁটতে লাগল।

একটা দারুণ বিতৃষ্ণায় তারা ওর দিকে তাকাল।

"তোর দিকে তাকালে পর্যন্ত আমার গা-টা ঘিন ঘিন করে ওঠে! তুই মানুষের মত বাঁচতে চাস নি, সুতরাং মানুষের মত মৃত্যুও তুই পাবি নে!" ক্রুদ্ধ পেলাগিয়া বলে উঠল।

"শোন তোমরা, ওর মতলব ভাল নয়। এমনি করে চেঁচিয়ে ও সময় নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে জার্মানরা ওর চীৎকার শুনে যাতে এসে পড়ে—ওর সেই মতলব। কাজেই নির্বোধের মত ওকে আর সে সুযোগ দিও না।"

আলেকজান্দ্র তখন উঠে গিয়ে একটা দড়ি গাপলিকের গলায় জড়িয়ে দিল।

"এ একটা মহৎ কাজ," এই বলে সে নিজের হাতে থু থু ফেললে। ফ্রসিয়া চীৎকার করে উঠল!

"চুপ!"

গাপলিকের আঙ্গুলের নখগুলো মাটির মেঝেতে বসে গেল। পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উটল! সঙ্গে সঙ্গেই হাত-পা ছড়িয়ে দিল। মোড়লের প্রাণ বেরিয়ে গেল।

"আমাকে একটু সাহায্য কর। ··· ফ্রসিয়া, এগিয়ে এসো।"

আলেকজান্দ্র দু হাত দিয়ে দেহটা তুলে ধরল, ফ্রসিয়া ধরল পা দুটো। তের্পিলিখা আঙিনার দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, কেবল বাইরে তখনও ঝড় গোঙাচ্ছে।

"তাড়াতাড়ি এসো, এটাকে কূয়োর ভিতর ফেলে দিতে হবে।"

আঙিনায় একটা অব্যবহার্য পুরানো কূয়া ছিল। অনেক দিন থেকেই সেটা শুকিয়ে আছে। এখন বরফ জমে অর্ধেকটা ভরে গেছে। সেই কূয়োর মধ্যে তার দেহটা ফেলে দিল এবং আলেকজান্দ্র ফেওড়া দিয়ে বরফ তুলে গাপলিকের দেহটা ঢেকে দিল।

"বসন্তকাল পর্যন্ত ওখানে বেশ থাকবে। তারপর আমরা ওকে ওখান থেকে তুলব। ভোর হতে না হতেই বরফে ওকে ঢেকে দেবে, তখন আর ওর কোন চিহ্নই থাকবে না।"

"এখন আমরা বাড়ী যাব কেমন করে?"

"কোন দরকার নেই, বাইরে বেরিয়ে বিপদ ডেকে আনার কোন অর্থ হয় না। একবার সকলের দৃষ্টি এড়াতে পেরেছি বলে দ্বিতীয় বারও যে পারব

এমন কথা বলা যায় না," আলেকজান্দ্র বলল। "আমার এখানে প্রচুর জায়গা আছে, ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে তারপর নীরবে যে-যার বাড়ী ফিরে যাবে।"

তারা মেঝেয় ও বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়ল, কিন্তু কেউ ঘুমোতে পারল না।

"আলেকজান্দ্র, এই আদালতের কাগজপত্রগুলি যত্ন করে লুকিয়ে রেখো। আমাদের লোকজন যখন ফিরে আসবে তখন তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।"

"ভয় নেই, এমন জায়গায় রেখে দেবো যে কেউ খুঁজে পাবে না।"

"দেখো আলেকজান্দ্র, শেষ পর্যন্ত যেন কোন গোলমাল না হয়," তের্পিলিখা সাবধান করতে চাইল।

গোলমাল হবে না-ই বা কেন?" ঘুমজড়িত স্বরে আলেকজান্দ্র বিড় বিড় করে বলল।

৭

দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ফেডোসিয়া চমকে উঠল, ওর হাত থেকে বালতিটা পড়ে গেল। রান্নাঘরের মাটীর মেঝেতে অনেকটা জল গড়িয়ে পড়ল।

"কি হয়েছে তোমার, ননীর পুতুল?" রাগত স্বরে ভের্নের হেঁকে উঠল। তার পালিশ করা বুট জোড়াটায় নোংরা জল লাগবার আগেই সে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল।

ফেডোসিয়া কোন জবাব দিল না। একটা তীক্ষ্ণ বেদনা যেন ওর অন্তরটাকে বিদ্ধ করল। জল তখুনি মুছে ফেলল, কিন্তু ওর দুটো হাতই তখন কাঁপছে, এবং যেখানটায় জল পড়েছিল সে জায়গাটা ছেড়ে বার বার ও শুকনো জায়গাতেই ন্যাতা বুলোতে লাগল। ও আজ কিছুই করতে পারছে না। সামান্য একটা শব্দে, একটা খসখসানিতে আঁতকে উঠছে ও, যেন কেউ মারছে ওকে। ও যেন কিসের প্রত্যাশায় ছটফট করছে। তারা আসছে, যে-কোন মুহূর্তেই তারা এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে!

সারা গাঁয়ে একমাত্র ও-ই খবরটা জানে—এই সত্যটা ওর মনের উপর গুরু-ভার বোঝার মত চেপে বসে রয়েছে। অবশ্য কেউ জানে না—এটা ভালই, কিন্তু একা একা প্রতীক্ষা করা কত কঠিন! ওর যেন দম আটকে আসে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট। তারা যে-কোন মুহূর্তে এসে এখানে উপস্থিত হতে পারে, যে-কোন মুহূর্তে তারা আসতে পারে ···

"তুমি নিজেও একটু ভেবে দেখো, কি ভাবে কথাটা পাড়বে," ভের্নের মুখ ঘুরিয়ে পুসিয়াকে লক্ষ্য করে বলল। পুসিয়া তখনও বিছানায় শুয়ে। ভের্নের বেরিয়ে গেল, দরজাটা আবার সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে। ফেডোসিয়া আবার চমকে উঠল।

মাথার পিছনে হাত দুটো গুটিয়ে নিয়ে পুসিয়া সেইখানেই শুয়ে শুয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ভের্নেরের কথার সুরটা ওর ভাল লাগল না। ও যেন তার দাসী, হুকুম তামিল করবার জন্যেই যেন আছে। স্বয়ং সে গ্যেরিলাদের কোন খবরই সংগ্রহ করতে পারে নি, অথচ তার সৈন্য আছে, টেলিফোন আছে, সব-কিছুই হাতের কাছে—তবু সে চায় পুসিয়াকে দিয়ে কাজ করাতে! কিন্তু ওর সঙ্গে গ্রামের একটা লোকও কথা বলতে চায় না, সেই ওকেই কি না তাদের খুঁজে বার করতে হবে! পুসিয়া রাগে গর গর করতে লাগল। ওর বড় বাড় বেড়েছে। ও কি ভেবে রেখেছে যে, রেশমী পোশাক আর ছেঁড়া মোজা দিয়েছে বলেই ওর প্রতি তার চোখ রাঙাবার আর গালাগালি করার অধিকার বর্তেছে!

পুসিয়া বেশ ভাল করেই জানে যে, বোনের সঙ্গে কথা বলে কোন ফল হবে না, কোন আশাও নেই। লড়াইয়ের আগে থেকেই ওদের মধ্যে কথাবার্তার আদান-প্রদান পর্যন্ত নেই। পুসিয়া যে ছোট্ট মফঃস্বল শহরে বাস করত, অলগা মাঝে মাঝে সে শহরে এসেছে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে ও ট্রেনিং স্কুলে পড়া-শুনার জন্যে, কিন্তু একবারও সে কষ্ট করে পুসিয়ার সঙ্গে দেখা করে নি। কাজেই তার আচরণ থেকে এই মনে হয় যে, পুসিয়ার সঙ্গে দেখা করার কোন প্রয়োজন সে মনে করে নি। স্বভাবত তাই মনে হয়। তার মতে পুসিয়া কোন কাজ করে না—এই তার অপরাধ। পুসিয়া নিজের হাতে জামা-কাপড়

ধুয়ে হাত খারাপ করে না, মেঝে পরিষ্কার করে না, বা ট্রাক্টর চালাতে জানে না! অলগা সকলকেই তার মত হতে বলে। সে ভুলে যায় যে, তার গায়ে ষাঁড়ের মত শক্তি আছে, আর তার বোনের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বল। নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে, অলগার মনে এ প্রশ্ন কখনও জাগে না, যেমন-তেমন করে মাথার চুলগুলি একজায়গায় জড়ো করে রাখতে পারলেই হল। শীত কালে তার হাত দুটো অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় যায় ফেটে আর গ্রীষ্ম কালে সে হয়ে দাঁড়ায় হাঘরেদের মত কালো। পুসিয়া হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ঝুলানো আরশিখানা নিয়ে আপন মনেই নিজের মুখখানা ভাল করে দেখতে লাগল, তার সুবিন্যস্ত সরু ভ্রূ দুটি, তার কালো কোঁকড়ানো চুলের বেণী, গোলগাল দুটি চোখ ও তার কালো পক্ষ্ম, সরু ঠোঁট দুটির ফাঁকে সূক্ষ্ম তে-কোণা দন্তপংক্তি চক্‌চক্ করছে।

না, অলগা যে সকল কাজে অভ্যস্ত, পুসিয়া সে সব কাজের যোগ্য নয়। সেরিয়োশা তখন একজন সামরিক কর্মচারী, সে প্রচুর উপার্জন করে, ওদের ছোট্ট শহরে যা পাওয়া যায়, ওদের আয় তার চেয়ে বেশি। অলগা এসব কখনও বুঝতে চায় না। সে সব সময়ই মনে করত যে, সেরিয়োশার অবস্থা ভাল নয়! কেন মনে করে? কারণ, সেরিয়োশার স্ত্রীটি এমন যে, ছেঁড়া-জামা-কাপড়ও যথেষ্ট পরিপাটি করে ব্যবহার করে। সে হাতে-পায়ের যত্ন নেয় এবং যে-কোন মাস্টারনীর চেয়ে তাকে সুন্দর দেখায়। মাস্টারনীদের সব সময়ই যেন তাড়াহুড়া, কিছু একটা করবার জন্যে ছটফট করে। ওদের যে কোন ছেলেপিলে হয় নি, সে কি পুসিয়া ছেলেপিলে চায় নি বলেই হয় নি? তবে, হাঁ, সত্যি ও ছেলেপিলে চায় না। দেশে ছেলেপিলে অগণন, ওর না হলেও কিছু এসে যায় না। সেরিয়োশা ওকেই বিবাহ করেছে, ছেলেপিলেকে নয় এবং বিয়ের সময় ছেলেপিলের দাবীও কখনও জানায় নি। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অলগা তার বোনের সঙ্গে অনাত্মীয়ের মতই ব্যবহার করে এসেছে। এখন তা হলে সে পুসিয়ার প্রতি কিরূপ আচরণ করবে? আর সে-ই বা তার কাছে কতটা আশা করতে পারে? সেরিয়োশা যে-দিন থেকে লড়াই করতে চলে গেছে সে-দিন থেকে তার কোন খবরই পুসিয়া পায় নি—সুদীর্ঘ পাঁচ মাস

কেটে গেছে। হয় সে লড়াইয়ে নিহত হয়েছে, নয় ত বন্দী হয়েছে। নইলে এত দিনেও একটা চিঠি বা খবর এল না কেন? লড়াই কত দিন চলবে—কে জানে? সে কি করবে, কত দিন অপেক্ষা করবে—এক বছর, দু-বছর অথবা কে জানে কত বছর। কিন্তু এত দিন খাবে কি? না, সে বুদ্ধি করে একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে। কুর্ট জাতে জার্মান, কিন্তু তাতে কি? জার্মানরা এখন মালিক, এখন জার্মানরা এদেশ শাসন করছে এবং তারাই শাসন করতে থাকবে। বলশেভিকদের দিন শেষ হয়ে গেছে, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সব দিক দিয়ে সব কিছুই ভাল, একমাত্র মুশ্‌কিল হয়েছে কুর্টকে নিয়ে। তার মেজাজটা দিন দিনই সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে। কয় দিন থেকে তার বদমেজাজী বেড়ে গেছে। সে পুসিয়াকে অমন রূঢ় ভাষায় কথা বলতে পারল! এখন আবার অলগার সঙ্গে দেখা করে খোঁজ-খবর আদায়ের দাবী জানিয়েছে। পুসিয়া বেশ ভাল করেই জানে যে, বোনের সঙ্গে দেখা করার সাহস তার নেই। কিন্তু তা হলে কুর্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে কেমন করে? অলগা যে পুসিয়ার বোন, এই কথাটাই বা তাকে কে জানিয়েছে? পুসিয়া ধীরে সুস্থে কাপড়জামা পরল। তার মেজাজটা ভাল নেই। কুর্ট ওর কাছে যা চায়, এটা হচ্ছে তার শেষ অবলম্বন। অথচ কুর্টের টিক্‌টিকি আছে, আছে গোপন সংবাদ-দাতা, আছে সমগ্র জার্মান বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র।

পুসিয়া হেলাফেলাভাবে বিছানার ঢাকাটা সরিয়ে ফেলল, চেয়ারের উপর থেকে জামাটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে পকেটে কাগজের খসখসানি শুনতে পেল। পুসিয়া একবার দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ বার করল। একখানা নীলরঙের খাম, ঠিকানা লেখা জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষা না জানলেও পুসিয়া চিঠিখানা খুলে ফেলল। নীল খামখানাই তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে।

পূরো চারপৃষ্ঠাব্যাপী নীল কাগজে লেখা চিঠিখানা, ছোট ছোট অক্ষরগুলি, পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হাতের লেখা। প্রথম পৃষ্ঠার গোড়াতে একটি ফুল, চ্যাপ্‌টা

হয়ে এঁটে গেছে। পুসিয়া কাগজখানি তার নাকের ডগায় ধরল। একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধ পেল, গন্ধটা ওর কাছে অচেনা। চিঠিখানি কোন স্ত্রীলোকের লেখা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুসিয়া নিজের ঠোঁট এমনি ভাবে কামড়াল যে, রক্ত বেরিয়ে এল। একটা স্ত্রীলোক সেখান থেকে, সেই জার্মানী থেকে কুর্টকে চিঠি লিখছে। চিঠির কাগজখানি চমৎকার, অক্ষরগুলি ছোট ছোট, পরিষ্কার। চিঠিটা হয় ত ওর মায়ের লেখা, কিন্তু ফুল ?

চিঠিখানা পড়বার জন্যে, এই অজানিতা কুর্টকে চিঠিতে কি লিখেছে তা জানবার জন্যে পুসিয়া তার সব কিছু দিতে প্রস্তুত। তারিখটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চিঠির তারিখ দেখে মনে হল, চিঠিখানি নিশ্চয়ই সদ্য সদ্য এসেছে, হয় ত কালকের ডাকেই এসেছে। কুর্ট আজ আর একটা জামা পরেছে, তাই চিঠিখানা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আজ পর্যন্ত পুসিয়া কুর্টের কাছে কোন চিঠি বা ফটো কখনও দেখতে পায় নি।

কেউ নেই ? পুসিয়া আঁতিপাতি করে ভাবতে লাগল। কুর্ট তার পকেট-বুকখানা কখনও কাছছাড়া করে না, এমন কি, পুসিয়াকে তা স্পর্শ করতেও দেয় না। ওই পকেট-বুকে কি আছে ? তারপর তার ডাকের চিঠি পত্র সব কিছুই আপিসে দেওয়া হয়, বাড়ীতে নয়। চিঠিপত্র, ফটো যাই তার থাকুক না কেন, সব কিছুই ওই দেরাজটার মধ্যে রাখে। দেরাজটা ও সব সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টিতে রাখে। কুর্ট সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই ও জানে না। কুর্ট নিজের সম্বন্ধে যতটুকু বলে, ও ততটুকুই জানে মাত্র। গোড়ায় যখন ও কুর্টের সঙ্গে এসে বাস করতে রাজী হয়, তখন কুর্ট ওকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ড্রেসডেন গিয়ে ওদের বিবাহ হবে। এখানে প্রকৃত পক্ষে এমন স্থান নেই যেখানে শুভ কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে। পুসিয়া বেশ ভাল করেই বুঝেছে যে, তাকে প্রতীক্ষা করতেই হবে। কিন্তু সে সব তত গুরুতর নয়।

এর আগ পর্যন্ত ওর মনে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, কুর্ট সত্যি ওকে ভালবাসে। কিন্তু যেই মুহূর্তে কুর্ট ওকে অলগার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে হুকুমজারি করল তখন থেকেই ওর মনে নানা সন্দেহের উদয় হল। আজকাল ত আর কুর্ট

ড্রেসডেন সম্পর্কে কোন কথাই বড় একটা বলে না। শুধু তাই না, যখনই পুসিয়া সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা তুলতে চায় তখনই কুর্ট কেন অত চাপা দেবার চেষ্টা করে? সে কেন সব সময়ই অত অবসরহীন, সব সময়ই কেন অত খিটখিটে, তিরিক্ষে? ওর ত এতটুকুও পরিবর্তন হয় নি। জার্মান-অধিকৃত একটা শহরে কুর্ট যখন পুসিয়ারই ফ্লাটের একখানা ঘরে বাস করছিল তখন ওদের পরিচয় হয়, সেই দিন যেমন ছিল, আজও পুসিয়া ঠিক তেমনিই আছে। কুর্টেরই পরিবর্তন হয়েছে, সে ছিল অন্য রকম। আর সব কিছুর উপর এই চিঠি। ...

পুসিয়ার মনে হল, চিঠিখানা হাতে নিয়ে এভাবে বসে থাকায় কোন ফায়দা নেই। কোন মতেই চিঠিখানা ও পড়তে পারবে না, তা ছাড়া কুর্ট যদি এখনই এসে পড়ে তা হলে একটা হৈচৈ বাধিয়ে বসবে! তার কাগজপত্র পুসিয়া দেখে, নাড়াচাড়া করে, কুর্ট তা পছন্দ করে না।

খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে যথাস্থানে রেখে জামাটা আবার ঝুলিয়ে রাখল। পুসিয়া স্থির করল যে, এবার থেকে কুর্টের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। একদিন না একদিন ও জানতে পারবেই যে, কে ওকে চিঠি লেখে এবং ওর প্রতি কুর্টের এই কর্কশ ব্যবহারের কারণ কি তার অতি পরিশ্রমের অবসাদ ও স্নায়বিক দৌর্বল্য, না, আর কিছু?

রান্নাঘর থেকে ফেডোসিয়ার বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাতে পুসিয়ার মেজাজ আরও গরম হয়ে উঠল।

"বাসন-কোসন নাড়াচাড়া করতে আরও একটু সাবধান হতে পার না!" পুসিয়া একটা চীৎকারে ফেটে পড়ল।

খোলা দরজা দিয়ে ফেডোসিয়া একবার তাকাল। পুসিয়া তার মুখে চোখে একটা নতুনত্ব দেখতে পেল। এই চাষী স্ত্রীলোকটির চোখে মুখে সর্বদাই যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ছাপ দেখে এসেছে, এ দৃষ্টি সে দৃষ্টি নয়। তার চোখ দুটো যেন আনন্দে উদ্ভাসিত, যেন একটা তৃপ্তিতে উজ্জ্বল। এ রকমটা কখনও দেখা যায় নি। পুসিয়া রাগে ফেটে পড়তে চাইছে। ওর এত খুশির কারণ কি?

নিশ্চয়ই ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুর্টের কথাগুলি সব শুনেছে। এই স্ত্রীলোকটাও শেষ পর্যন্ত এসব লক্ষ্য করছে!

ওর মনে পড়ল যে, ও-ও ত এই স্ত্রীলোকটার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। এখনও সে কুর্টকে বলেনি যে, নালার মধ্যে যে-সব মৃতদেহ পড়ে আছে, তাদের মধ্যে ফেডোসিয়ার ছেলেও আছে। দুটো দিন সে ফেডোসিয়াকে জব্দ করবার জন্যে ইচ্ছা করেই চুপ করে ছিল, তারপর সে সোজা কথাটা ভুলে গেছে আর তখনই কুর্ট পুসিয়াকে নানা প্রকারে বিরক্ত করছিল, এবং অলগার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ওকে রাজী করিয়েছে। কিন্তু এখন তার সব কথা মনে পড়েছে।

"সবুর কর, বাড়ী আসা মাত্র ওঁকে সব কিছু বলে দেব। নিশ্চয়ই বলব," পুসিয়া ফেডোসিয়াকে শাসাল।

ফেডোসিয়া ঘৃণাভরে একটু হাসল মাত্র এবং নিজের নিতম্বে হাত দুখানি রেখে ইচ্ছা করেই আপাদমস্তক পুসিয়াকে একবার দেখে নিল।

"ভারী ত পরোয়া করি! বলো না তোমার 'ওঁকে'!" ফেডোসিয়া সাহসের সঙ্গে মুখের উপর জবাব দিল, এবং 'ওঁকে' শব্দটি উচ্চারণে এমন ভাবে জোর দিল যে সেটা শোনাল ঠিক ব্যঙ্গের মত। "বলো তাকে। তাতে যদি তোমার কোন উপকার হয় ত আমি নিজে তাকে বলব। যাও, এখনই গিয়ে তাকে বল সব, একবার কেন, একশ বার বল! এখনই জামা-কাপড় পরে তার কাছে ছুটে চলে যাও। যাও—যাও—আর দেরী করো না!"

বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে পুসিয়া তার দিকে চেয়ে রইল।

"তোমার কি হয়েছে বল ত?"

"আমার আবার কি হবে? এতে অবাক হবারই বা কি আছে? তুমি নিজে তাকে বলতে চাইছ, তাই আমি শুধু বলছি—যাও, গিয়ে তাকে সব বল! এর জন্যেই ত তুমি বেঁচে আছ, গুপ্তচরের কাজ না করলে জার্মানদের কাছে শিরোপা পাবে কেমন করে! বেশ, তবে তাই যাও, দৌড়ে গিয়ে তুমি যা জান—সব তাকে বল!"

"হাঁ, বলবই ত, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তাকে আমি বলব সব।"

"আমিও ত তোমাকে তাই বলছি। যাও, বলগে। কিন্তু যতই আমাকে শাসাও না কেন, আমাকে আর ভয় দেখাতে পারবে না।"

"তারা তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।"

"নিক। তাকে ত তারা আমার কাছ থেকে একমাস আগেই নিয়ে গেছে। আর নতুন করে নিতে পারবে না।"

"তা হলে রোজ কেন তুমি সেখানে যাও?"

"যাই, মানে—যাই। আমার খুশি। তারা যদি সেখান থেকে ভাসিয়াকে নিয়ে যায়, আর যাব না। কেমন, হল ত!"

"কুর্ট তোমাকে গ্রেফ্তার করবে। তুমি বেশ ভাল করেই জান যে, তোমার ওখানে ঘুর-ঘুর করা নিষেধ।"

"না, বড় যে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! গ্রেফ্তারকে আমি আর এতটুকু পরোয়া করি নে। দেখছ না, ভয়ে আমি কেমন কাঁপছি! ..."

ফেডোসিয়া ঘরের মধ্যে এল। তার মুখে এখন আর হাসি নেই, কালো চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

"তোমারই ভয় পাওয়া উচিত, বুঝেছ! ভয়ে তোমাকে থরথর করে কাঁপতে হবে!"

পুসিয়া একটা আসনে বসে পড়ল।

"তুমি কি বলছ? আমার ভয় পাওয়ার কি আছে?"

"সব কিছুই আছে! দেশের লোককে ভয় করতে হবে: তারা তোমাকে ক্ষমা করবে না! জলকে ভয় করতে হবে: জলে ডুবে মরবার তোমার আগ্রহ হবে, কিন্তু সেই জলই তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে উপরে ঠেলে দেবে! ডাঙাকে ভয় করতে হবে: কেন না, তুমি আত্মগোপন করতে চাইবে, এবং নিজেকে আড়াল করবার কিছু পাবে না। আমার ভাসিয়া নালায় পড়ে থেকেও তোমার চেয়েও ভাল আছে। ফাঁসী কাঠে ঝুললেও লেভান্যুক তোমার চেয়ে ভাল আছে। জার্মানের সঙীনের ডগায় বরফের মধ্যে যখন ওলেনা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় হেঁটে বেড়িয়েছে, তখন সেও তোমার চেয়ে ভাল ছিল।

তোমার যে অবস্থা আসছে, তাতে তারা সকলেই তোমার চেয়ে ভাল! এমন দিন আসবে যেদিন তুমি প্রত্যেকের অবস্থাকে ঈর্ষা করবে! তোমার চোখে সে দিন জলের বদলে থাকবে রক্ত, কারণ তোমার অবস্থা তাদের মত নয়! ফাঁসীর দড়ি গলায় দিয়ে তোমাকে কেন মারা হচ্ছে না বলে তোমার আফ-সোসের সীমা থাকবে না। তোমার মনে হবে, তোমাকে কেন সঙীনের খোঁচা মারছে না, তোমাকে কেন গুলি করছে না।''

রাগে ঘৃণায় ফেডোসিয়ার দম আটকে আসছিল, নিজেদের লোকেরা আসছে এই সত্যটা মনে হতেই একটা পৈশাচিক আনন্দ ওকে পেয়ে বসল। তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, এমন কি, এই মুহূর্তে এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামপ্রান্তে গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া বিচিত্র নয়।

"বেরিয়ে যা এখান থেকে,'' পুসিয়া হাঁপাতে লাগল। "এক্ষুনি চলে যা এখান থেকে!''

আর একবার ফেডোসিয়া অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল।

''যাচ্ছি আমি। তোমার চন্দ্রবদন দেখে আমি খুব খুশি হব, এমনটা মনে করো না! আমার ঘরে বসে আমাকেই কেমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ—এ কথাটা মনে রেখো!''

যেতে যেতে এমন জোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল যে, দেয়াল থেকে চূণবালি খসে পড়ল।

"যা না, তোর লোকটার কাছে গিয়ে নালিশ জানা যে, আমি তোকে ধমকেছি!" আপন মনেই ফেডোসিয়া চুল্লিটা উস্কে দিতে দিতে বিড় বিড় করে বলতে লাগল। "তোমার কথা আর সে বেশি দিন ভাবতে পারবে না! তাকে আরও অন্য সব কথা ভাবতে হবে। চাই কি, আজ থেকেই শুরু হবে!"

কুর্ট কিন্তু পুসিয়ার কথা আদৌ ভাবছিল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, ভুরু কুঁচকে রাগে গর্ গর্ করতে করতে সে আপিসে গিয়ে ঢুকল। তার এই মূর্তি দেখে সৈনিকেরা আগের চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল, সার্জেণ্ট বসে ছিল, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"হেড কোয়ার্টার থেকে ফোন এসেছিল ?"

"হাঁ ক্যাপ্টেন, এসেছিল।"

"আমায় জানাও নি কেন ?"

"সে রকম হুকুম ছিল না, ক্যাপ্টেন।"

"হুকুম ছিল না—তার মানে ?"

"বলল যে, আপনাকে জানাবার দরকার নেই।"

"তবে তারা ফোন করেছিন কেন ?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে বন্দীর কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া গেছে কি না।"

"তুমি তার কি জবাব দিলে ?"

"আমি জানিয়েছি যে, স্ত্রীলোকটি কোন খবরই দেয় নি।"

"তারপর কি হল ?" ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে ক্রোধের স্বর।

সার্জেন্ট বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তারপর ··· আমি আরও ··· জানিয়েছি ···"

"বেশ, আর কি জানিয়েছে ?"

"জানিয়েছি ··· যে, বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে। ···"

"এ খবর দিতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে ? খবরটা দিতে তোমায় কে বলেছে ? হুকুম তোমাকে কে দিয়েছে ? আমি দিয়েছি ?"

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভের্নের এক-পা এক-পা করে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে রইল, এক-পা পিছোবার তার সাহস হল না।

"আমি কি তোমাকে খবর দিতে বলেছিলাম ?"

"না, আপনি হুকুম দেন নি, হের ক্যাপ্টেন।"

একটা বিরাট ঘুষি গিয়ে সার্জেন্টের গালের উপর পড়ল : গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়েই ভের্নের ঘুষিটা মারল !

সার্জেণ্টটা একবার কেঁপে উঠল, কিন্তু ঠিক একই ভাবে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে সোজা ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে রইল।

"কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে, কে তোমাকে খবর দিতে বলেছে ?" ভেনের্র ভাঙা গলায় গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘুষি বসাবার জন্যে হাত তুলল।

এবারে সার্জেণ্টের গাল রক্ত জমে লাল হয়ে উঠল। গালে ভেনের্রের আঙুলের দাগগুলি প্রথমে শাদা, পরে দেখতে দেখতে রক্তিম হয়ে উঠল।

"মোড়ল কোথায় ? এখানে আজ এসেছিল ?

সার্জেণ্ট তখনও অপলক দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে সোজা তাকিয়েছিল।

"এখনও আসে নি।"

"কতটা খাদ্যশস্য দিয়ে গেছে ?"

"মোটেই দেয়নি। এ পর্যন্ত কেউ আসেওনি।"

ভেনের্র গাল দিয়ে উঠল।

"সে ছেলেটার ব্যাপার ?"

"কেউ কোন খবর দেয়নি, হের ক্যাপ্টেন।"

রাগের মাথায় ক্যাপ্টেন নিজের চেয়ারখানা পিছনে ঠেলে দিল এবং টেবিলের ব্লটিং প্যাডটাও মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। সার্জেণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই নীচু হয়ে ব্লটিং প্যাডটা তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল।

"মোড়লকে ডেকে পাঠাও! জলদি!"

"যো হুকুম, হের ক্যাপ্টেন!"

সার্জেণ্ট জুতার খট্ খট্ শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভেনের্র তার দেরাজটা খুলে তার ভিতরকার কাগজপত্র সব টেনে বার করে টেবিলের উপর রাখল। রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে। সেই পাপিষ্ঠা একটা কথাও বলল না এবং মনে হয় এক বছর ধরে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকলেও সে কিছু বলত না। কিছু না বলেও সে শত শত বার মরতে প্রস্তুত ছিল। সদর দফ্তর অবশ্য এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, কাজটায় তার হঠকারিতা হয়ে গেছে, না-ভেবেচিন্তেই কাজটা করে বসার ফলে এই হল যে, গ্যেরিলাদের ধরবার যে একটি মাত্র সূত্র ছিল তাও গেল। সদর দফ্তরের এলাকায় যে সব গ্রাম আছে গ্যেরিলারা বাতাসের মত

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে সে সব গ্রামে হানা দিচ্ছে। সদর দফ্তর এই কথাই ভাববে যে, তার মত একজন মূর্খ সার্জেণ্ট ওই স্ত্রীলোকটার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায়ই উদ্ভাবন করতে পারে নি। তবে একথাও ঠিক যে, ওকে টেলিফোনে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করে তার অধীনস্থ কর্মচারী-দের কাছে এ সব কথা বলেছে। অবশ্য ওর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র সেখানে চলছে এবং তারা ওকে ফাঁদে ফেলবার বিশেষ চেষ্টাতেই আছে। সব চেয়ে বড় কথা, আজ পর্যন্ত কোন খাদ্যশস্য সে পেল না। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু খাদ্যশস্য কোথায় লুকানো আছে সে কথা কেউ বললও না, দেখিয়েও দিল না। সে বেকুব মোড়লটা বলেছিল, ওরা ভয় পাবে! ভয় পাবে—না আরও কিছু! হেড কোয়ার্টারের সবাই মোড়ল মোড়ল করে খুব চীৎকার করছিল। কিন্তু সে মোড়ল কি করল? তার দ্বারা কোন কাজই হল না, গ্রামবাসীদের উপর তার বিন্দুমাত্রও প্রভাব নেই।

দরজার বাইরে সার্জেণ্টের জুতার খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল।

"কি খবর?"

"হের ক্যাপ্টেন, অনুমতি করেন ত বলি যে, মোড়ল এখানে নেই!"

"সে কি! এখানে নেই! কিন্তু আমি তোমাকে বলেছিলাম তাকে ডাকবার জন্যে লোক পাঠাতে?"

"আমি নিজেই গিয়েছিলাম, কিন্তু বাড়ীতে নেই।"

ভের্নের কাঁধ ঝাঁকাল।

"কোথায় গেছে সে?"

"কেউ বলতে পারল না।"

ভের্নের চটে উঠলো।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কি আশা কর যে, আমি নিজে গিয়ে তাকে খুঁজে এনে তোমায় দেব?"

"অধীনের কথা শুনুন, আমরা সর্বত্র তাকে খুঁজে দেখেছি। কাল অনেক রাত পর্যন্ত এখানে ছিল। আমরা দু'জনে হিসাব মিলিয়ে দেখছিলাম যে

আশানুরূপ খাদ্যশস্য গ্রাম থেকে পাওয়া যেতে পারে কি না। সে দুপুর রাত্রে বাড়ী গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে পৌছয় নি। তারপর থেকে তাকে আর কেউ দেখেও নি।"

"তোমরা সব জায়গায় সন্ধান নিয়ে দেখেছ?"

"হাঁ, হুজুর।"

"সে কি তা হলে পালিয়ে গেল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বোধ হয় পালিয়েই গেছে।"

"যা বলেছ! কিন্তু এখন কি করা যায়?"

ক্যাপ্টেন বিষণ্ণভাবে টেলিফোনের দিকে চেয়ে রইল।

"আমি ত জানি না হুজুর।"

"বেকুব কোথাকার!" ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠল।

"আমরা তাকে কিসের জন্যে চেয়েছিলাম—সেই মোড়লকে? কি সাহায্য সে আমাদের করেছে? কি কাজই বা করেছে সে? কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি।"

"আজ্ঞে, আপনি যা বলছেন, তা ঠিক।"

"আর হ্যাঁ, সত্যিই তাই।... এখানে [illegible] কোয়ার্টারে একটা রিপোর্ট পাঠাও। লেখো যে মোড়ল পালিয়েছে। তারা আর একজনকে পাঠাক। এবারে বোধ হয় আরও বেশি কোন বুদ্ধিমানকে পাঠাবে।"

সার্জেণ্ট পাশের ঘরে গিয়ে মোড়লের পলায়ন সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে আরম্ভ করল। তারপর আরও একটা রিপোর্ট লিখল যে, ক্যাপ্টেন ওলেনা কষ্টিয়ুককে হত্যা করার সংবাদ হেড কোয়ার্টার থেকে গোপন রাখতে চায়।

"সশ্!"

দীর্ঘকালের অভ্যাস বশে সার্জেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং অসমাপ্ত রিপোর্টটা নিজের দেরাজে বন্ধ করে রাখল।

"কাল রাতে গ্রাম পাহারার ভার কাদের উপর ছিল? তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেছ?"

"হাঁ, সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছি, হের ক্যাপ্টেন, এবং তারা কেউ কিছু জানে না।"

"কি চমৎকার ব্যাপার। স্বীকার করতেই হবে! তার মানে, তুমি পায়ে হেঁটেই গ্রাম প্রদক্ষিণ কর এবং গ্রাম ছেড়ে চলেও যদি যাও, আমাদের সান্ত্রীরা বলবে, 'তারা কিছুই জানে না।' এভাবে যদি সব কিছু চলতে থাকে তা হলে এক শুভদিনে দেখতে পাব, ঘুমের মধ্যে আমরা সব কচুকাটা হয়ে আছি, অবশ্য সান্ত্রীরাও বাদ যাবে না। তারা জানে না, কি রকম? সে ত আর উড়ে যায় নি, পায়ে হেঁটেই গিয়েছে! তারা কি করছিল, ঘুমোচ্ছিল?"

"দারুণ তুষারে তারা ঘুমোতে পারে না। তার উপর প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝায় এখানকার পথঘাট সম্বন্ধে যার অভিজ্ঞতা আছে তার পক্ষে পালানো সহজ। সারা গ্রামেই আমাদের সান্ত্রী মোতায়েন করা উচিত।"

"আমাদের কি করা উচিত, না-উচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ তোমার কাছে চাই নি। যাদের মোতায়েন করবে, তারা কোথায়, কোথায় পাবে অত সৈনিক? তোমাদের লোকজন যথেষ্ট আছে? আর তুমি—তুমি নিজেই বা কি করছ? তুমি কি জান না যে, মোড়লকে বিশেষ নজরে রাখা দরকার?"

সার্জেণ্টের মনে পড়ল যে, তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্যে মোড়ল একজন লোক চেয়েছিল। সেই রাত্রে একা একা যেতে তার ভয় করেছিল। কাজেই মনে হয়, সে এত ভয় পেয়েছিল যে, একাকী পালিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পাছে ক্যাপ্টেন আরও রেগে যায় তাই সার্জেণ্ট তাকে কিছুই জানাল না। সার্জেণ্ট নিজেকে অপরাধী মনে করল—সে নিজে যদি গাপলিককে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসত।

"সব আহাম্মক কোথাকার! এদের দিয়ে লড়াই জেতবার আশা!" ক্যাপ্টেন গজগজ করতে লাগল।

সার্জেণ্ট আদেশের প্রতীক্ষায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? লেখাটা শেষ করে ফেল। এমন কিছু লেখো, যা পড়ে ওরা একটু খুশি হয়। আর আমি বলব, কি চমৎকার সহকারীই না তারা আমার জন্যে খুঁজে পেতে এনেছিল!"

সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্ট চলে গেল এবং তাড়াতড়ি তার অসমাপ্ত রিপোর্ট শেষ করতে লেগে গেল। ক্যাপ্টেন ভের্নে'র রাগের মাথায় যা-যা করেছে বা বলেছে সে সবই রিপোর্টে লিখল। সময় সময় হাত তুলে গালে বুলোচ্ছিল। ক্যাপ্টেনের চপেটাঘাতের জলুনি তখনও মিলিয়ে যায় নি।

ভের্নে'রও কাগজপত্র নিয়ে বসল, কিন্তু অবিলম্বেই বুঝতে পারল, কাজ করবার মত মনের অবস্থা তার নেই, তাই সার্জেণ্টকে ডেকে পাঠাল।

"টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা কর, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কিন্তু আপনি বাইরে বেরুতে চান, বাইরে এখন বেজায় তুষার।..."

"তোমার বলতে হবে না, আমি জানি। তুষারের মধ্যেই ত আমি এলাম।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ভের্নে'র জামার কলার উল্টিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাতাসটা পড়ে আসছে, কিন্তু তুষার যেন আরও সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে উঠেছে। পায়ের চাপে বরফ মস্ মস্ করে। আকাশে সূর্য ওঠেনি বটে, কিন্তু বরফের চক্‌চকে আভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ভের্নে'র দরজায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে রাগের সঙ্গে গ্রামের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গ্রামখানি নিঝুম হ'য়ে আছে; দেখলে মনে হয়, বরফের আচ্ছাদনে পালকশয্যায় শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। চালাগুলির মাথায় সাদা পুরু আস্তরণ জমে আছে। বাতাসে চালের খড়গুলো জায়গায় জায়গায় উড়ে গিয়ে এখানে সেখানে খালি পড়ে আছে। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে সেদিকে জার্মান সৈন্যেরা দৌড়ঝাঁপ করছে, কিন্তু তা ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দটিও নেই—যেন মৃত্যুর মত নীরব। কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। সৈন্যেরা প্রথম দিন গ্রামে এসেই কুকুরগুলোকে গুলি করে মেরেছে।

কুকুরগুলোও মানুষের চেয়ে কম বর্বর নয়! বিদেশী লোক দেখে তাড়া করেছে; সৈন্যদের বাড়ীতে ঢুকতে দিতে চায় নি।

গ্রামখানি একেবারে নিঝুম হলেও ভের্নের একটা সাংঘাতিক কোন বিপদের আশঙ্কা করছিল। সামনাসামনি শত্রুকে আক্রমণ করলে সে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়, তাই যুদ্ধক্ষেত্রই বেশি ভাল। কিন্তু একটা অধিকৃত গ্রামে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করাটা তাদের মতে—বসে বিশ্রাম করা। আইন ও শৃঙ্খলা! একমাস হল তারা বলশেভিকদের গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারে নি। পার্থিব সকল রকমের চেষ্টা, যে-কোন গুরুতর কৌশল—সবই ব্যর্থ হয়েছে। অবিচলিতভাবে ওরা সব কিছু নীরবে সহ্য করেছে, তবু বশ্যতা স্বীকার করে নি। এই সব নিরেট লোকগুলি কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়? এ কথা ওদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবো যে, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রত্যেকটি মানুষকে যদি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়, তবুও এর অন্যথা হবে না। জার্মানদের যা মূল উদ্দেশ্য তা সফল হবেই। কিন্তু এটা তারা বুঝতে চায় না। তা থেকে এই মনে হয় যে, ওদের স্থির বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরাই জয়ী হবে।

দূরে কোথায় একটা এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। জামার কলারটা নামিয়ে দিয়ে ভের্নের শব্দটা ভাল করে শোনবার চেষ্টা করল। বোঁ বোঁ শব্দ নিস্তব্ধ বাতাস ভেদ করে মশার গুঞ্জনের মত ভেসে আসছে। কিন্তু শব্দটা যেন ক্রমেই জোর ধরে নিকটবর্তী হয়ে আসছে। বরফের ছটা থেকে চোখ দুটো আড়াল করে ক্যাপ্টেন উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাইল।

"ওই—ওই যে, ক্যাপ্টেন!" সান্ত্রীটা সাহসের সঙ্গে বিমানখানির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ভের্নের সে দিকে চেয়ে দেখল। প্রথমে মনে হচ্ছিল যেন ছোট্ট একটি ডাঁশ-মাছি, তার পর দেখতে দেখতে আকারটা বড় হতে লাগল।

"আমাদের?" ক্যাপ্টেন বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করল।

সান্ত্রীটা কান পেতে শুনছিল।

"আমার তা মনে হয় না ক্যাপ্টেন, এ যেন অন্য এঞ্জিন।"

ভের্নের উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

পুরো এক মাসের ভিতর একখানি শত্রু-বিমানও এ অঞ্চলে দেখা যায় নি। ওরা নিশ্চয় আবার জোর ধরে ওঠে নি?

বাড়ীর ভিতর থেকে জন কয়েক সৈন্য বেরিয়ে এল।

"বলশেভিক!" তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল।

রাস্তাটা আর এখন নির্জন নয়। গ্রামবাসীরা যেন মাটী ফুঁড়ে উঠে এল। স্ত্রীলোকেরা সব বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলেরা দল বেঁধে গড়াতে গড়াতে এসে উপস্থিত হল। সকলেই হাতে সূর্যালোক আড়াল দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল।

"আমাদের! আমাদের!" সাশা চেঁচিয়ে উঠল।

মাল্যুচিখা ঘাড় ধরে তাকে বলল: "আমাদের, তোকে কে বলল?"

কিন্তু তখন আর কারুরই এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রইল না। বিমানখানি যতটা সম্ভব নীচে দিয়েই উড়ছে। বরফের উপর প্রতিফলিত চোখ ঝলসানো আলোর ছটায় প্রত্যেকেই বিমানের পাখায় 'লাল-তারকা'-চিহ্ন নির্ভুলভাবে দেখতে পেল।

মাল্যুচিখা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, তার দেখাদেখি আর আর স্ত্রীলোকরাও তেমনি করেই বসল। ছেলেরা সব কিছু ভুলে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে হাত ছুঁড়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

"আমাদের! আমাদের!" আনন্দের সঙ্গে তারা চেঁচাতে লাগল। একাগ্র গম্ভীরমুখো স্ত্রীলোকদের চোখ থেকেও অশ্রু ঝরতে লাগল। একখানি বিমান, তাদেরই বিমান গ্রামের উপর দিয়ে উড়ছে, ডানায় তার 'লাল তারকা'-চিহ্ন—ওদের জন্য আশার বাণী বয়ে এনেছে, ও যে স্বাধীনতার প্রতীক। সারা মাসে আর তারা সোভিয়েট বিমান দেখতে পায়নি। এটি প্রথম বিমান—মৃত্যুর বীভৎস গোঙানি, জার্মান-মার্কা এঞ্জিনের সবিরাম স্বল্পস্থায়ী গোঙানি ছড়িয়ে

দিচ্ছে না চারদিকে, পাখায় যার কালো কুটিল সাপের স্বস্তিকা আঁকা নেই, তেমন বিমান এই প্রথম এলো এদিকে।

ক্যাপ্টেন ছেলেদের চেঁচামিচি শুনতে পেল। রাস্তার দিকে সোজা তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখল, যতদিন সে গ্রামে এসেছে তার মধ্যে এ দৃশ্য তার নজরে পড়েনি। সর্বত্রই নরনারী। স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ বাড়ীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে; ছেলেরা এক ঝাঁক চড়াই পাখীর মত রাস্তা জুড়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। বর্ষীয়ানের দল উড়ন্ত পাখীটির দিকে হাত সঞ্চালন করতে লাগল। এ সব দেখে শুনে ভের্নের রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

"হটিয়ে দাও, হটিয়ে দাও ওদের!" সৈন্যদের লক্ষ্য করে সে চীৎকার করে উঠল। সৈন্যেরা তার আদেশ বুঝতে পারল না। ভের্নের নিজের রিভলভার বার করে ছেলেদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল, পর পর দুটো গুলির আওয়াজ হল বটে, কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হল। রাগে লজ্জায় তার হাত কাঁপতে লাগল। এক ঝাঁক চড়াই পাখীর মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়লে তারা যেমন যে যেদিকে পারে পলায়ন করে, ছেলেরাও তেমনি সরে পড়ল, স্ত্রীলোকেরাও তাদের অনুসরণ করল। মুহূর্তের মধ্যে সকলেই অন্তর্ধান করল, যেন সকলকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল এবং ভের্নের দেখতে পেল, সারা গ্রাম আবার জনশূন্য হয়ে গেছে,—যেন মৃত। কাউকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

"এই গাড়লের দল, শুন্তে পাওনি কি বললাম?" ভের্নের নির্বাক সৈনিকদের তাড়া দিয়ে উঠল। তার রাগ এই কারণে আরও বেড়ে গেল যে, অত সামনে থেকে গুলি ছুঁড়েও সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি—সেটা তারাও দেখতে পেয়েছে। "ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর বিক্ষোভ প্রদর্শন লক্ষ্য করলে ত! তোমাদের বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো কি সব বে-কল হয়ে গেছে, তারা সব গেল কোথায়?"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিমান-বিধ্বংসী কামান থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। কামানটার অদূরেই বোমাটা ফেটে কতকগুলো কালো ধোঁয়ায়

চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। দ্বিতীয় বোমাটাও আর একটু দূরে গিয়ে ফাটল। বিমানখানি আরও উঁচুতে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এতক্ষণে ঘুম ভাঙল? কি করছিলে সব? কামানের কান মলছিল? ... আরাম করে ঘুমোচ্ছিলে, তাই না?" একটা সার্জেণ্ট তার দিকে ছুটে আসছিল, তাকে লক্ষ্য করেই ভের্নের গর্জে উঠল।

"হের ক্যাপ্টেন, যদি অভয় দেন ত বলি, আমরা ভেবেছিলাম ওটা আমাদেরই বিমান। কিন্তু পরে ..."

"গ্রামের সব ছেলেমেয়ে চিনতে পারল, কেবল তোমরাই পারলে না! তোমরাই শুধু ভাবলে—! মজা মন্দ নয়! সবুর কর দেখাচ্ছি। ..."

"এটা প্রথম বিমান, হের ক্যাপ্টেন। ..." সার্জেণ্ট ত্রুটি সমর্থন করতে চেষ্টা করল।

"চুপ! আমি ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিনি! প্রথম বিমান! আমাদের কামানগুলো যেখানে আছে সেখানে যদি একটা বোমা পড়ত তা হলে প্রথম বিমান বেরিয়ে যেত! বুঝলে, যত সব অপদার্থ!"

ক্যাপ্টেন পিছন ফিরে গিয়ে আপিসে প্রবেশ করল। রাগে তার আপাদ-মস্তক থর্ থর্ করে কাঁপছে। কি অক্ষলুণে দিন, আর কি অভিশপ্ত লোকগুলো!

"কি, মোড়লকে পাওয়া গেল?"

ভীত সন্ত্রস্ত সার্জেণ্ট লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"হের ক্যাপ্টেন, সন্ধান চালাবার হুকুম ত পাই নি। ..."

ভের্নের রাগের সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠে বসে পড়ল। একেবারে গাড়ল, কেউ কিচ্ছু ভাবলে না পর্যন্ত, আশ্চর্য! ... আর সব কিছুর দায়িত্ব একমাত্র ওর—ভের্নেরের ঘাড়েই চাপবে। সদর দফ্তরে তার হিতৈষীরা এ সুযোগ হেলায় হারাবে না নিশ্চয়ই।

হঠাৎ তার মনে হল যে, গোলমাল যদি শুরু হয়ই, তা হলে পুসিয়াকে নিয়েও এর উপর আর একটা বিপদ আসা বিচিত্র নয়। এখানকার বাসিন্দাদের প্রতি ভের্নেরের অতিরিক্ত উদারতার সে হবে একটা প্রমাণ।

"তার সংশ্রব আমাকে ছাড়তেই হবে," অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ভাবল।

তার কিছু করবার ইচ্ছা ছিল না। আসলে সে একজন সামরিক কর্মচারী, কিন্তু কার্যত তার উপর মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা অপদার্থ গ্রামে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার গছানো হয়েছে। এখানে সে কি করতে পেরেছে? ছোট-বড়-টুকরো নানা রকমের ফাইল ইত্যাদির চাপে সে মাথাও তুলতে পারেনি। মোড়ল ও সার্জেণ্ট সর্বক্ষণই কেবল এজমালি খামারের খাতাপত্র নিয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু তাতেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। সৈন্যবাহিনী চায় মাংস, চায় খাদ্যশস্য, চর্বি। কিন্তু পাজি বলশেভিকেরা গরুবাছুর সবই এমন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে যে, শরতের আগে আর ফিরবে না। যে কয়টি গরু এখনও অবশিষ্ট আছে তা ওর দলের পক্ষেই যথেষ্ট নয়। খাদ্যশস্য তারা নিয়ে গেছে, নয় ত এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যে কোন মতেই তা পাওয়া যাবে না।

"জামিনদারদের খবর কি?"

"ফাটকে আছে হের ক্যাপ্টেন।"

"তাদের কিছু খেতে দিয়েছ কি?"

"ন্-না। ··· কিছুই না, হের ক্যাপ্টেন।"

"জল?"

"না, জলও না," সৈনিক আরও অস্পষ্টভাবে আম্তা আম্তা করে বলল।

"ভাল! চমৎকার! এক কণা রুটি বা এক ফোঁটা জলও নয়! তারাও আমাদের কিছু খেতে দিতে চায় না, আমরাও তাদের দেবো না। ··· তারা যদি দরজা বন্ধ রাখতে চায় ত রাখুক, তাতে খুব বেশি ক্ষতি হবে না ···"

ভের্নের স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। আবার সে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমটা বাড়ী যাবে ঠিক করল, কিন্তু সেখানে পুসিয়া আছে মনে হতেই কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল। যেখানে কামানগুলি রাখা আছে সেদিকে তখন চলে এল। সে নিজে গোলন্দাজের কাজে তেমন দক্ষ নয় বলেই গোলন্দাজ সম্বন্ধে

তার একটু দুর্বলতা ছিল। মনটাকে অন্য দিকে নিয়োগ করবার জন্য সে চাঁদমারির ব্যবস্থা করল।

কয়েক মিনিট পরেই ময়দানে তার চেঁচামিচি শোনা গেল—লোকজনের উপর হুকুম ও গালাগালি সমান বর্ষিত হচ্ছে।

"ওই রে, ক্ষেপে গেছে," কমাণ্ডান্টুরের ভিতর একজন সৈন্য মন্তব্য করল।

"ক্ষেপবার যথেষ্ট কারণও আছে। ··· এক কণা খাদ্যশস্যের গন্ধও মিলল না, তার উপর আবার মোড়লের পলায়ন। ···"

"ধড়িবাজের ডিম। ···"

সার্জেণ্ট সন্দেহের সঙ্গে বক্তার দিকে তাকাল।

"সে কি, তোমার কি কোন কারণে মোড়লকে ইর্ষা হয়?"

"তাকে ঈর্ষা করার কি আছে হের সার্জেণ্ট?" সৈনিকটা জবাবে বলল। সার্জেণ্টের পানে নিরীহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। "পালালেও সে বেশি দূর যেতে পারেনি। আমাদের লোকেরা তাকে ধরে ফেলবেই।"

"অবশ্য যদি পিছু পিছু গিয়ে থাকে," আর একজন টিপ্পনি কাটল।

"আর যদি সে সামনের দিকে গিয়ে থাকে তা হলে বলশেভিকেরা জ্যান্ত অবস্থায় গায়ের ছাল খুলে নেবে। না, নিশ্চয়ই তাকে ঈর্ষা করবার কিচ্ছু নেই।"

"হয় ত, ইঁদুরের দল রাস্তায় কোথাও তাকে লোপাট করে ফেলেছে।"

সার্জেণ্ট আতঙ্কে শিউরে উঠল।

"কি আবল-তাবল বকছ? মুঝিকরা তাকে খুন করবে কেমন করে?" অনেক রাত পর্যন্ত ত সে এখানেই ছিল, তারপর আর বাড়ী পৌঁছয়নি।"

"পথে, অর্থাৎ ···"

"রাত্রে এখানে ত কেউ বাইরে বেরোয় না। সুস্পষ্ট হুকুম জারি আছে!" কথাটা হঠাৎ সার্জেণ্টের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

সৈনিকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে দিকে তাকাল কিন্তু কোন জবাব দিল না। অবশ্য একথাও সার্জেণ্ট কখনও ভোলে নি যে, আদেশ সত্ত্বেও, সৈনিকদের গ্রাম

চৌকি দেওয়া সত্ত্বেও কে একটা ছোকরা চালাঘরের সামনে এসেছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার মৃতদেহটা কেমন করে কোথায় অন্তর্হিত হল, কেউ বলতে পারে না। অথচ এ সত্যটা সকলেরই জানা আছে যে, মৃতদেহ কখনও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাফেরা করে না।

"সে যাক্‌গে, তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, বাজে বকার দরকার নেই।" সার্জেণ্ট গজ গজ করতে লাগল।

সৈনিকেরা চুপ করে গেল। ক্যাপ্টেনের মতই সার্জেণ্টও প্রয়োজন মনে করলে তাদের উপর হাত চালাতে কসুর করবে না। সেই দিনই সকালে ক্যাপ্টেনের হাত-চালানোর পরিচয় সে নিজে পেয়েছে, তার গালে এখনও হাতের পাঁচটা আঙুলের দাগ জ্বল জ্বল করছে। সুতরাং তার অধীনস্থ লোক-দের উপর মারমুখী হওয়ার অধিকার তারও আছে।

"নয়মান কোথায়?"

"তারা মাংসের খোঁজে বেরিয়েছে।"

সার্জেণ্ট ভ্রূ কোঁচকাল।

"মাংসের খোঁজে ··· গরুগুলো সব কোথায়, তারা কি জানে না?"

"এখানে একটাও গরু আছে কি-না সন্দেহ। হের ক্যাপ্টেন পরশু সদরে দশটা গরু পাঠিয়েছেন। তারা গেছে মুরগী-টুরগী পায় কি-না তারই সন্ধানে।"

সার্জেণ্ট কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গেল। সদর দফ্‌তর থেকে ফোন আসার আশাও সে করছিল। ক্যাপ্টেন বেশ মুশ্‌কিলেই একটু পড়েছে, এই সুযোগে ওর মনে একটা অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। সার্জেণ্টের গালে চড় মারা সহজ, কিন্তু সদর দফ্‌তর যে খাদ্যশস্য দাবি করছে তা জোগাড় করা বেশ কঠিন ব্যাপার। গেরিলারা কোথায় আছে তার সন্ধান পাওয়া আদৌ সহজ নয়। সার্জেণ্ট বেশ করেই জানে যে, ক্যাপ্টেন বেশ একটু অসুবিধায়ই পড়ে গেছে। তবে এটাও সে বেশ ভাল করেই জানে যে, আর কেউ এসে এখানে ওর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারবে না। তবে এক্ষেত্রে ভের্নেরের বিষ দাঁত ভাঙবে মনে হতেই সার্জেণ্ট অত্যন্ত খুশি হল। ভের্নের

নিজেকে বেশ একটা কেষ্টবিষ্টু মনে করে, কাজকর্মেও তেমন মনোযোগ দেয় না; একমাত্র মনোযোগ তার ওই শুটকিটার দিকে। সুতরাং এখন থেকে সব কিছুর জন্যেই তাকে মূল্য দিতে হবে।

তারা যেদিন একটা ছোট শহরে প্রবেশ করে তখন একটা বাড়ীর কোন ফ্লাট থেকে কে জার্মান সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, ফলে জার্মান সৈন্যেরা জোর করেই বাড়ীটায় ঢুকে পড়ে। সেই দিন থেকেই ক্যাপ্টেনের প্রতি সার্জেণ্ট একটা নীরব বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে। তারা যখন ফ্লাটে প্রবেশ করে তখন সেখানে কেউ ছিল না। সার্জেণ্ট ঘরে একটা ফার কোট কুড়িয়ে পায়। জামাটা সে পরের দিনই পাঠিয়ে দেবে স্থির করেছিল—মিংসি অনেক দিন থেকেই একটা ফার কোট চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেই ফার কোটটা তার ওই বানরীটার জন্যে নিয়ে নিল। এটা ত একটা পাড়া-গাঁ; এখানে ফার কোট পাবে কোথায়? এখানে দুর্গন্ধযুক্ত ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট ছাড়া আর কিছুই মেলে না। মিংসি সামান্য পুরানো পশমী জামায় ক্ষয়ক্লেশে শীত কাটায়, আর ক্যাপ্টেনের রক্ষিতা ওই মাগীটা সর্বাঙ্গে সেই ফার কোটটা জড়িয়ে দিব্য আরামে আছে। একথা যখন মনে হয়, সার্জেণ্টের আপাদমস্তক রাগে টগবগ করতে থাকে। এক এক সময় তার মনে হত, ক্যাপ্টেনের আচরণ সম্পর্কে সদরে সব কিছু রিপোর্ট করা দরকার। সেখানেও তারা ক্যাপ্টেনকে পছন্দ করে না। কারণ সব সময়েই সে দম্ভ ভরে থাকে এবং সকলের চেয়ে সে যে বড় এইটাই তার আচরণে প্রকাশ পায়। সে কিসে বড়? সার্জেণ্ট সশ্‌ কখনও ভুলতে পারে না যে, ফুরারও একদিন ছিলেন তারই মত সার্জেণ্ট। ফুরারের গৌরবের ছটা সার্জেণ্ট সশ্‌-এর উপর প্রতিফলিত হয়। সার্জেণ্ট কখনও একথা ভুলতে পারে না যে, ক্যাপ্টেন তার কাছ থেকে জোর করে ফার কোটটা নিয়েছে এবং গালেও চড় মেরেছে, তাও আবার এই প্রথম নয়।

ক্যাপ্টেনের চীৎকার গীর্জার ওখান থেকেও শোনা যাচ্ছে, সশ্‌ সে শব্দ শুনতে পেয়ে বিদ্বেষের হাসি হাসল। "যত পার চেঁচাও ওখানে, দেখি কি করতে পার!"

সৈনিকেরা গ্রাম তোলপাড় করে ফেলছে। দল বেঁধে তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরছে। কেউ তাদের কাপুরুষ বললে তারা ক্ষেপে যায়, কিন্তু এখানে, এই অভিশপ্ত গাঁয়ে তারা দিনের বেলায়ও দল না বেঁধে যেতে সাহস পায় না।

কড়া নাড়ার শব্দে গ্রোখাচিখা এসে দরজা খুলে দিয়ে সৈনিকদের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সাহসের সঙ্গে তাকাল। তার মেয়েরা কোণায় লুকিয়ে রইল।

"কি চাও তোমরা ?"

"মুরগী, মুরগী চাই !"

"মুরগী একটাও নেই, সব ত তোমরাই গিলে খেয়েছ।"

তারা ওর কথাগুলির মানে বুঝতে না পারলেও বক্তব্য বিষয় বুঝতে পারল ; কিন্তু বিশ্বাস করল না। আঁতিপাতি করে বাড়ীর সর্বত্র খুঁজে বেড়াল, মুরগীর খোঁয়াড়, গোয়ালঘর—কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু পেল না, বরং গামলার মধ্যে যে খড়-কুটো ছিল সেগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে দিল, সেখানে পাছে মুরগী লুকিয়ে থাকে। সৈন্যেরা বিফলমনোরথ হয়ে যখন ছুটে ফিরে আসছিল গ্রোখাচিখা তাদের দিকে তাকিয়ে একবার কাঁধ দুটো ঝাঁকাল।

"এখানে কিছু নেই," সৈন্যদের অন্য একজন বলে উঠল, সে খড়কুটো তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে।

এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী, এ ঘর থেকে আর এক ঘর এমনি করে তারা ঘরে ঘরে ছুটে বেড়াতে লাগল।

"মুরগী, মুরগী দাও !"

বাস্যচিখার অবশিষ্ট একমাত্র মুরগীটিকে সে সৈন্যদের দৃষ্টির আড়ালে চুল্লীর তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, হতভাগার দিন ঘনিয়ে এসেছিল, তাই ছাড়া পেয়ে কুঁ কুঁ করতে করতে বেরিয়ে এল। জার্মানরা বিজয়োল্লাসে মুরগীটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মুরগীটা কেমন করে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ভয়ে জানলায় গিয়ে উড়ে পড়ে জানলার সার্শিতে ডানার ঝাপ্টা মারতে লাগল।

"এদিকে আয়, এদিক পানে আয় !"

মুরগীটা একটা আর্ত চীৎকারে প্রথমে দালানে, পরে উঠানে গিয়ে পড়ল, সৈন্যরাও পিছু পিছু ধাওয়া করল। পাখীটার ডানার ঝাপটায় একরাশ চূর্ণ বরফও সেই সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা সৈনিক রিভলভার বার করে গুলি ছুঁড়ল। পাখীটা গুলি খেয়ে তালগোল পাকিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে বরফের উপর পড়ে গেল। সৈনিকটা তখন মুরগীর একটা ঠ্যাং ধরে বিজয়ীর আনন্দে তাকে দোলাতে লাগল।

তারা প্রত্যেক ঘরে গিয়েই ক্রমাগত দাবি করছে: 'মুরগী, মুরগী দাও!' ফলে কিছুটা লাভ তাদের হল বই-কি।

তাদের আসতে দেখেই লোকেরা যা-কিছু লুকোবার সবই তাড়াতাড়ি লুকোতে চেষ্টা করল। মুরগীগুলোকে চুল্লীর তলায়, বিছানায়, চিলে-কোঠায় লুকিয়ে রাখল। জার্মানরা ক্ষুধার্ত কুকুরের মত চারদিকে শুঁকে শুঁকে খুঁজতে লাগল। বলা বাহুল্য, এত হল্লা করেও খুব বেশি কিছু তারা সংগ্রহ করতে পারল না। যে কয়টি গরু তখনও ছিল তা নেওয়ার হুকুম না থাকলেও তারা একটি গরু নেবে ঠিক করল। লোকুতিখা কাঁদতে কাঁদতে হাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সৈন্যেরা তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, সে পড়তে পড়তে কোন রকমে খাড়া রইল।

"রঙ্গি, রঙ্গি!"

গরুটা অশ্রুসজল শান্ত চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে রইল। গলার দড়ি ধরে তারা গাইটাকে টেনে নিয়ে চলল, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। চক্‌চকে বরফ তার দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। উঁচু চৌকাট দিয়ে আগাতে সে নারাজ হয়ে সামনের পা দুটো গুটিয়ে বসে পড়ল। একটা সৈনিক লেজ ধরে টেনে তাকে নড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু গরুটা আর্ত চীৎকারে প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

"ওর পেটে বাছুর আছে, পেটে বাছুর আছে!" লোকুতিখা চেঁচিয়ে উঠল। "হায় ভগবান! কি করছ তোমরা! গরুটা যে গাভীন!"

"চেঁচিও না মা," জার্মানগুলোর দিকে ভ্রূকুটি করে দশ বছরের শিশুপুত্র সাভকা বিহ্বলভাবে বলে উঠল।

"বাছারা, তোদের আমি কি খেতে দেব, কি খেয়ে বাঁচবি তোরা! এক ওই রঙ্গী ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই, তাও আবার ওরা নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ, বাছারা আমার না খেয়েই মরবে!"

"অমন করে চেঁচিও না মা," আরও গম্ভীর হয়ে সাভকা বলল।

শেষ পর্যন্ত গরুটা চৌকাঠ পার হয়ে গেল। ওরা তাকে ধাক্কা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল এবং সর্বাঙ্গে অসংখ্য ঘুষি মারতে লাগল। লোকুতিখা পাশে পাশে ছুটে চলল আর একবার তার পেটে হাত বুলিয়ে দেবে বলে।

"রঙ্গি, রঙ্গি!"

গরুটি সজল করুণ দৃষ্টিতে গৃহস্বামিনীর দিকে চেয়ে হামলে উঠল।

"সোনামনি আমার! গরুটাও বুঝতে পারে ওরা কি অন্যায় করছে। রঙ্গি!"

লোকুতিখা ছুটে চলে। আঁচলে ওর পা জড়িয়ে আসে, মুখখানা কান্নার বেগে লাল হয়ে উঠেছে। ও ভুলে গেল যে, ওর চারিদিকে জার্মানরা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা জার্মান জোরে ধাক্কা দিতেই লোকুতিখা বরফের উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সাভকা দৃঢ়পদে তার দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি তোমাকে বলেছিলাম মা, ওতে কোন লাভ হবে না। ওঠ, অমন করে বরফের উপর পড়ে থেকো না।

বরফে মুখ গুঁজে লোকুতিখা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার বেগে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সাভকা তার কচি হাত দুটি দিয়ে মাকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

"কি করব, কি করব আমরা এখন?"

"আঃ চুপ করে থাক।" সাভকা রেগে উঠল। "সব লোকের গরুই ওরা নিয়ে গেছে, কিন্তু কেউ তোমার মত অমন হাউমাউ করেনি।"

"কিন্তু আমার যে পাঁচটিকে খাওয়াতে হয়।" লোকুতিখা বোঝাবার চেষ্টা করল।

"কারো কারো বাড়ীতে আট-দশ জনও আছে।"

"তোকে আর আমাকে নীতি-উপদেশ দিতে হবে না, বুঝলি? আমি মা, আমার সঙ্গে কি এভাবে তোর কথা বলা উচিত?"

"তুমি আগে বাড়ীর মধ্যে চল ত। নিয়ুর্কা কেমন কাঁদছে দেখতে পাচ্ছ না?"

"কাঁদছে, সত্যি?" সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে বাড়ীর মধ্যে চলে এল। তার আঁচলটা বরফে জমে ছিল, দৌড়তে গিয়ে তা ঝন ঝন করে উঠল। সাভকা শ্রান্ত মন্থর পদে মায়ের পিছন পিছন চলে এল।

সৈনিকেরা গরুটিকে নিয়ে রওনা হল এবং কামাণ্ডাণ্টুরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখানে তারা একটা চালায় ছোটখাটো একটা কসাইখানা তৈরি করে তুলেছে। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল গরুটার ছাল ছাড়িয়ে কড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এদিকে গীর্জার ময়দানে ক্রমাগত চীৎকার করে করে ভের্নের নিজেই সেই শব্দে উত্যক্ত হয়ে দফ্তরে ফিরে এল।

"হের ক্যাপ্টেন, আজ একটি গরু পাওয়া গেছে," সার্জেণ্ট বলল।

ক্যাপ্টেন হাত নাড়ল। এই খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে তার বিরক্তি ধরে গেছে। আজ একটা গরু, কাল একটা, কিন্তু কয়দিন বাদে কি পাবে? সদর দফ্তর স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে, যে গ্রামে সৈন্যেরা থাকবে, সে গ্রাম থেকেই তারা তাদের খাদ্যবস্তু জোগাড় করে নেবে। একমাসও হয় নি, আর এরই মধ্যে গ্রামের সব কিছু সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। হাঁস, মুরগী, শূয়োর—যার যা ছিল সবই তারা নিয়ে গিয়ে খেয়ে শেষ করেছে। এখন দু-চারটা শীর্ণ রুগ্ন গাই হয় ত আছে। সবই যখন নিঃশেষ হবে, তখন তারা কি করবে?

"খাদ্যশস্য কিছু দিয়েছে?"

"মদ আর চকোলেট পাঠিয়েছে, হের ক্যাপ্টেন।"

"মদ আর চকোলেট ছাড়া আর সব?"

"না আর কিছুই না, হের ক্যাপ্টেন। পরশুও তারা বলে পাঠিয়েছে যে আবশ্যক খাদ্যবস্তু আমাদের গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। মদ আর চকোলেট কি আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেব?"

"হাঁ, পাঠিয়ে দাও, কিন্তু লক্ষ্য রেখো যে, পথে সে সব যেন কেউ চক্ষুদান না করে!"

"না, তার জো নেই, গালামোহর করা সব।"

ভের্নের জামার বোতাম খুলে ফেলল, আস্তে আস্তে একটি সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল।

"ভাল কথা, সশ্! ..."

"আদেশ করুন, হের ক্যাপ্টেন।"

"শোন, আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। আজ থেকেই এ সম্বন্ধে তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে। যা-কিছু করতে হবে, তুমিই করবে।"

"যে আজ্ঞা, হুজুর," সার্জেণ্ট জবাবে বলল। রাগে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। ভের্নের তখন দরজার কাছে।

"হের ক্যাপ্টেন!"

"কি বলছ?"

"আপনি যদি হুকুম দেন তো পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকেও আমরা খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারি।"

ভের্নের কাঁধ ঝাঁকাল।

"গাধার মত কথা বলো না। তোমার ভাল করেই জানা উচিত যে, সেই সব গ্রাম থেকে অন্যান্য দল খাদ্য সংগ্রহ করছে।"

"এ গ্রামে আর কিছু নেই, হের ক্যাপ্টেন।"

"কিছুই নেই—এ কথাটা বলা সব চেয়ে সহজ। তোমাদের কাজ হচ্ছে কিছু সংগ্রহ করা, এবং আমাকে এনে দেওয়া। চারদিক ভাল করে খুঁজে পেতে দেখ। ভাল করে দেখলে কিছু না কিছু পাবেই।"

দরজাটা টেনে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল—কোন্ দিকে সে যাবে। ভাল করেই সে জানে যে, তার দূতীয়ালী ব্যর্থ হবে, কিন্তু কুর্ট জুলুম করতে লাগল। যতই জুলুমের মাত্রা বাড়তে লাগল, ততই সে অশিষ্ট ও শক্ত হতে লাগল।

"যাই কেন না বল, আসলে ও তোমার আপন বোনই। সেই বোনের কাছে কেমন করে কথাটা পাড়বে, তা তুমিই ভাল জান। আমার মনে হয়, তুমি তার সঙ্গে কথা বলতেই চাও না। যদি তা-ই হয়, বেশ, এমন সময় আসবে, তখন আর আমি তোমাকে কিছু বলতে আসব না ..."

পুসিয়া ভয় পেয়ে গেল। সে সম্পূর্ণরূপে কুর্টের আশ্রিত। সে যদি ওকে এই গ্রামেই ফেলে চলে যায়? এখানে তো প্রত্যেকেই ওকে শত্রু বলে গণ্য করে। কোটের আস্তিনে হাত দুটো গুঁজে নিয়ে সে ধীর মন্থর পদে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। কুর্টকে ও একথা বলতে পারে না যে, বোনের মনোভাব সে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে, অর্থাৎ—পুসিয়া যেদিন এই গাঁয়ে প্রথম আসে, সেদিন তাদের যে বচসা হয়েছিল তাকে যদি অলগার মনের ভাব বোঝবার সুযোগ বলা চলে। অলগা ওকে দেখে রাগে দুঃখে লজ্জায় ক্ষেপে গিয়ে ওর গায়ে থুতু দিয়েছিল, আর নালায় পড়ে থাকা ভাসিয়া সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে গিয়ে রাগে পুসিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছল। অলগা ওকে অপমান করতে চায়, ওকে দশের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, কেন না, ও যে স্ত্রীলোকের বাড়ীতে বাস করছে তার ছেলে যুদ্ধে নিহত হয়েছে! পুসিয়ার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? কিন্তু অলগা মনে করেছে যে সত্য সত্যই তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সে পুসিয়াকে গালিগালাজ করে চলে যায়। এই হল ব্যাপারটা। এখন সে কেমন করে সেই অলগার সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা বলবে?

রাস্তার দুধারে যে গাছগুলি আছে তার ডালপালা রূপালী বরফে ঝক্ ঝক্ করছে। সূর্যালোকে তুষার ঝক্‌মক্ করছে, তার ছটায় চোখ দুটো ঝলসে

যাচ্ছে। পুসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, সঙ্গে সঙ্গেই তার সেরিয়োশার কথা মনে পড়ে গেল। না, সেরিয়োশা কখনও ওকে ধমকায় নি, কখনও রাগারাগি করে নি। সে শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে যেত! কিন্তু সে যাই হোক, ও কেন এখন তার কথা ভাবছে? কুর্ট ই এখন ওর স্বামী।

ক্রোধের একটা ঢেউ এসে পুসিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কুর্টের এত বড় আস্পর্ধা? কিন্তু ও জানে যে, সত্যসত্যই সে দুঃসাহস তার আছে এবং ওর তাতে কিছুই করবার নেই। সেরিয়োশার প্রতি ওর যে মনোভাব ছিল, কুর্টের প্রতিও তাই। কাজেই এই ভুল বোঝার জন্যে ও অপরাধী নয়। এর মূলে যে সত্যটা আছে সে হচ্ছে এই যে, সেরিয়োশার সঙ্গে, প্রকৃতির দিক থেকে, কুর্টের কোনই আদল নেই।

অলগা যে বাড়ীতে বাস করে, ইতিমধ্যে পুসিয়া তার কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর মাত্র কয়েক পা গেলেই হয়। পুসিয়া এখন কি করবে? কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকবে? না, সে অসম্ভব। কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল, কি করবে স্থির করতে পারছে না। গরম বুট পরে থাকা সত্ত্বেও কুয়াশা তার পায়ের আঙুলগুলি যেন মুচড়ে দিচ্ছে। পুসিয়া ফিরে চলল। কুর্টের যা মন চায়, তাই সে করুক, চেঁচামিচি গালাগালি করুক—অলগার সামনে গিয়ে আবার কতকগুলি গালাগালি শোনার কোনই অর্থ হয় না। এর থেকে যদি কোন সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তা হলে অবশ্য কোন কথা ছিল না; কিন্তু পুসিয়া নিঃসন্দেহে জানে যে, তাদের এ আলাপ-আলোচনায় কোন ফলই হবে না। ও আরও কয় পা এগিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইতস্তত করতে লাগল। ওর এখন কি করা উচিত? ওরা যেমন ওলেনাকে খুন করেছে তেমনি যদি অলগাকেও মেরে ফেলত তা হলে আর এই হাঙ্গামা পোয়াতে হত না।

বোন যে বাড়ীতে থাকে পুসিয়া একবার সেই বাড়ীর দিকে তাকাল এবং ভিতরে ভিতরে সে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কে একজন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। পুসিয়া বরফের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। একবার আড়চোখে বাড়ীটার দিকে চাইল। না,

অলগা নয়, তবে যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে অলগা বাস করে, সেই। স্ত্রীলোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের উপর হাত মেলে সূর্যের আলো আড়াল করে মনোযোগের সঙ্গে কি দেখতে লাগল। তারপর দরজাটা একটু ঠেলে খুলে দিল। তারপর, চেঁচিয়ে যেন কি বলল। দেখতে দেখতে তার চারপাশে কতকগুলি মেয়ে-পুরুষ এসে জড় হল, সকলেই হাত দিয়ে সূর্যালোক ও বরফের জলুস আড়াল করে সেই দিকেই তাকাতে লাগল।

লোকজনদের রাস্তায় জড় হতে দেখে ফেডোসিয়া ক্রাবচুকও বাইরে বেরিয়ে এল। সেও ঠিক তেমনি ভাবেই সেই দিকে তাকাতে লাগল। মুহূর্তের জন্যে তার হৃৎপিণ্ডের কাজ যেন বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আবার বুকটা এক ভীষণ উন্মাদনায় দুর্ দুর্ করে উঠল। রাস্তায় দূরে কতকগুলো লোক মার্চ করে আসছে গ্রামের দিকে। সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে তারা, আর সূর্যালোকে এখানে ওখানে ঝকমক করে উঠছে তাদের সঙীন।

কে একজন শুধাল, "ওরা কি জার্মান ?"

"তুমি কি ভাব, এখানে তাদের লোক কিছুমাত্র কম আছে ? আমরা চাই এখন বেশি তাদেরই।..."

"আমার মনে হয়, ওরা, এখানে প্রচুর খাবার পাবে এই ভরসায়ই আসছে ..."

"কিন্তু ওরা জার্মান নয় !" বান্যুচিখা সহসা এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল যেন বেহালার উঁচু পর্দার স্বর। "দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ, ওরা জার্মান নয় !"

"মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ? জার্মান ছাড়া আর কি হবে ?"

"ওরা আমাদের লোক ! হে ভগবান ! আমাদের লোকেরা আসছে ! ..."

"ভাল করে চোখ মেলে দেখ মেয়ে, আমাদের লোক কেমন করে হয় ? এ রকম দিনের বেলায় পথ দিয়ে মার্চ করে কি করে আসতে পারে তারা !"

"মা মা, ওই দেখ ওদের টুপিতে তারা আছে—তারা !"

গ্রিশা বান্যুক তার বাঁশীর মত কচিকোমল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

"কি বলছিস্ ? দেখতে পাচ্ছিস্, তুই, সত্যি দেখতে পাচ্ছিস্ ওদের ?"

ঝলমল তুষার ওদের দৃষ্টিকে বাধা দেয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ওরা—গ্রামের দিকে কারা এগিয়ে আসছে।

"আমাদের লোকেরা, না, জার্মানরা ?"

"ওরা আমাদের লোক হবে কি করে ? গ্রিশার দেখ তো ··· দেখ না জার্মানরা যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, গুলি ছুঁড়ছে না তো ···"

"যা হোক, গ্রিশাই ঠিক বলেছে।" আলেকজান্দ্র সহসা বলে উঠল, "টুপিগুলো আমাদেরই মত। ···"

"আমাদের ?"

"এতে অত খুশি হওয়ার কিছু নেই। দেখ, ভাল করে দেখ, এখন ওদের দেখতে পাবে।"

নীরবতা নেমে এল। ওদের এখন বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক দল লাল পল্টন রাস্তা দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে আসছে। তারা আসলে মার্চ করে আসছে না, বরং বরফের উপর দিয়ে তাদের পাগুলোকে টেনে টেনে আসছে। তাদের দুদিকে সশস্ত্র জার্মান রক্ষীর দল।

"তারা বন্দী লাল পল্টনদের নিয়ে আসছে," নৈরাশ্যের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কে বললে।

"তারা আমাদের লোকদেরই নিয়ে আসছে। ···"

রাস্তায় দলে দলে লোক এসে জমা হচ্ছে। ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে ওরা তাদের দিকে তাকিয়ে রইল—ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। তারা দেখতে পেল, লোকগুলো যেন চলতে আর পারছে না। প্রাণপণ চেষ্টায় কায়ক্লেশে তারা হেঁটে আসছে। সঙ্গের সৈনিকগুলো ক্রমাগত মুখ ভেংচে গালাগালি দিয়ে তাদের যেন খেদিয়ে নিয়ে আসছে।

"হা ঈশ্বর, ওদের মধ্যে আহতও আছে। ···"

"তারা ওদের পায়ের বুটও খুলে নিয়েছে, খালি পায়েই চলছে।"

"দেখ, সোনিয়া, সকলেই রক্তাক্তকলেবর।"

বাড়ীগুলোর সামনে যে জনতা ভিড় করেছে তার দিকে লক্ষ্য করে একটা জার্মান বর্বরের মত গালাগালি দিতে দিতে চলেছে, কিন্তু জনতা তার দিকে এতটুকু নজর দিচ্ছে না। তারা অদূরাগত মিছিলের দিকেই একান্তভাবে চেয়ে আছে।

"হা ভগবান! ..."

তারা গ্রামে এসে পড়েছে। এখন বন্দীদের মুখ চোখ সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের নির্যাতিত রক্তশূন্য মুখগুলো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সারির একজন লাল পন্টন আর হাঁটতে পারছিল না এবং এমন ভাবে টলছিল যে, তাকে দেখলেই মনে হয় যেন সে মাতাল।

"এই, শুনছিস!" একজন জার্মান রক্ষী চেঁচিয়ে উঠল এবং অন্য সকলে যে ভাবে মার্চ করে চলেছে আহত লোকটিও নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি ভাবে চলতে চেষ্টা করল। সে যখন অস্বাভাবিক ভাবে টলে পড়ে যাচ্ছিল তখন তার একজন সাথী লুকিয়ে তাকে ধরে রাখছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই সাথীটির হাতের উপর এসে একটা রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি ভাঙা ডালের মত ঝুলে পড়ল।

"হায় ভগবান। ..."

খালি পা—ক্ষত-বিক্ষত, বরফের উপরে রক্তের দাগ এঁকে এঁকে তারা কষ্টে সৃষ্টে হেঁটে চলেছে। পড়ে যাচ্ছে, আবার দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ হচ্ছে তাদের উপরে কুঁদোর গুঁতো।

আর সকলের মতই পুসিয়াও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তাদের শীর্ণ শুষ্ক মুখ, জ্বরের উত্তাপে চোখ জ্বলে যাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় রক্ত জমে আছে, বরফে জমে যাওয়া কালশিরে পড়া পাগুলো তাদের। পুসিয়ার ঠোঁটে অভিব্যক্তিহীন নির্বোধের হাসি উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

"দাঁত খিচোনি বন্ধ কর," পুসিয়ার কানের কাছে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলল। ভয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল: অলগা। চাঁপা ঠোঁট, বদ্ধমুষ্টি, কুঞ্চিত ভ্রূ—বন্দীদের দিকে চেয়ে আছে।

পুসিয়া তার ঝাপসা দৃষ্টির সুমুখে সহসা দেখতে পেল তার বোনের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, জামার কলারের উপর ঝক ঝক করছে তার কানের দুল দুটো, তার রঞ্জিত ঠোঁটে উদ্ধত হাসির ইঙ্গিত।

"দেঁতো হাসি বন্ধ কর।"

পুসিয়া পিছিয়ে গেল, ক্রোধকম্পিত অলগার বড় বড় ক্রুদ্ধ দুটি চোখের দিকে, তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইল।

"না, আমি ত ওদের অবজ্ঞা করছিনে।" সঙ্কুচিত কণ্ঠে সে বলল।

"হাঁ, তুমি করছিলে," অলগা বলল। সে যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল পুসিয়ার সেই হাসির উপরে, তার পাণ্ডুর মুখের উপরে, একটা জার্মান সেনানায়কের রক্ষিতার মুখে। পুসিয়া কুকুরছানার মত একটা কর্কশ শব্দ করে পিছিয়ে গেল। তারপর সহসা সে কেঁদে উঠল, মুখে হাত ঢাকা দিয়ে ঘরের দিকে চলল। লম্বা ফারকোটে বারে বারে বেধে যায় তার পা। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে পুসিয়া ছুটে পালাল।

বন্দী লাল পল্টনের দল তখনও মার্চ করে চলেছে। তারা ভিড়ের কাছাকাছি এগিয়ে এল, তাদের জরতপ্ত চোখগুলি দুপাশের বাড়ীগুলোর সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের দিকে নিবদ্ধ।

"রুটি! ..." তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, তার মাথার উপর উদ্যত হয়ে উঠল বন্দুকের কুঁদো, কিন্তু তারই মত আবার কে একজন বলে উঠল:

"রুটি! ... সপ্তাহখানেক আমরা কিছুই খাইনি। ..."

"হে ভগবান, হে দয়াময়! ..." বাস্যুচিখা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল।

তারপর সকলেই ছুটল যে যার ঘরের দিকে, ছুটল ভাঁড়ারের দিকে— ঊর্ধ্বশ্বাসে খাদ্যকণা যা পড়েছিল বাইরে, তা-ই কম্পিত দুই হাতে মুঠো করে ধরল।

"হে দয়াময় ভগবান! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! ..."

বাস্যুচিখাই আগে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। রক্ষীদের তুচ্ছ করে সে ঢুকে পড়ল তাদের সারির মধ্যে। হাতে তার এক টুকরা কালো রুটি, ছেলেদের জন্যে লুকিয়ে রাখা রুটির শেষাংশ।

মার মার করে জার্মানরা চীৎকার করে উঠল, কিন্তু সে কিছুই গ্রাহ্য করল না। একটা সৈনিককে ধাক্কা দিয়ে আহত লাল পল্টনের একজনের হাতে রুটির টুকরোটা গুঁজে দিতে চেষ্টা করল।

"মার্ ওকে!" একটা জার্মান আবার চীৎকার করে উঠল এবং রাইফেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে মারল তার পেটে একটা গুঁতো।

একটি শব্দও বের হল না বান্ন্যচিখার মুখ থেকে। বরফের উপরে সে পড়ে গেল। জার্মান সৈনিক জুতোর ঠোক্করে রুটির টুকুরোটাকে ছুঁড়ে দিল দূরে। রুটিখানা গিয়ে পড়ল একটা খাদের মধ্যে। একজন শীর্ণকায় লাল পল্টন ছুটে গেল সেটার দিকে। গুলির শব্দ হল, পথের পাশে লুটিয়ে পড়ল বন্দীটি।

মূর্চ্ছিত বান্ন্যচিখার দিকে মেয়েরা কেউই তাকাল না, তারা ছুটল বন্দীদের পিছনে পিছনে। চেষ্টা করতে লাগল আগুনে সেঁকা রুটি বা রাই-কেকের একটা টুকরো তাদের হাতে তুলে দিতে। জার্মান সৈন্যেরা ছুটে এল তাদের দিকে।

"চল্ জলদি!" সার্জেন্ট গর্জে উঠল। সৈন্যরা মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাদের মারতে লাগল, দুই হাতে মাথা বাঁচিয়ে মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আর বন্দীদের পায়ের তলায় রুটিগুলি ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বন্দীদের একজন ঝুঁকে পড়ে একটা কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আবার গুলির শব্দ। লোকটা পড়ে গেল সাথীর পায়ের তলায়।

"পুরবাসিগণ, এরকম করে কোন লাভই হবে না, বরং এতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করা; এর কোনই অর্থ হয় না।" একজন আহত লাল পল্টন চেঁচিয়ে বলে উঠল, তার চীৎকারের শব্দ রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গেল। সৈনিকটি তরুণ, কিন্তু সে আর চলতে পারছিল না। "ঘরে চলে যাও মায়েরা। ওরা আমাদের এক কণাও নিতে দেবে না। অকারণ তোমরা মরবে কেন?"

মেয়েরাও দেখল যে এক্ষেত্রে তাদের কিছুই করবার নেই। দুজন তো মরে রাস্তায় পড়ে আছে। অনেক কষ্টে বান্ন্যচিখা উঠে দাঁড়াল, আর সকলে

যে যার হাতে রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা দেখল লাল পল্টনেরা হতাশার সঙ্গে খাবারের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

"সাশা!" মাল্যুচিখা তার ছেলেকে ডাকল। "এঁখানে আমরা কিছুই করতে পারিনে। ছেলেদের নিয়ে গিয়ে রাস্তার বাঁকে পথের উপর রুটিগুলো ফেলে আসতে পারিস? জার্মানরা দেখতে পাবে না হয়তো, কিন্তু আমাদের ছেলেরা নিশ্চয়ই কিছুটাও এর কুড়িয়ে নিতে পারবে।"

ছেলেরা যেন পাতলা হাওয়ায় উড়ে গেল। মেয়েরা আবার যার যার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, রুমাল চিবোতে চিবোতে হাত নেড়ে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল।

"এখন কেমন আছ?" বান্যুচিখাকে এক গ্লাস জল দিতে দিতে ফ্রসিয়া গ্রোখাচ জিজ্ঞাসা করল। এবং এক টুকরো বরফ কপালের রগে ঘষে দিল।

বান্যুচিখা উঠে বসল এবং দুহাতে চোখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল।

"ব্যথা কি খুব বেশি বোধ হচ্ছে?"

"না, না। ... আমাকে তোমরা কি মনে কর, ফ্রসিয়া?"

"কেঁদো না, সেরে যাবে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাক, তা হলে সুস্থ বোধ করবে।"

"বোকার মত কথা বলো না, ফ্রসিয়া, আমি তার জন্যে কাঁদছি তোমায় কে বলল? একটু অসুস্থ বোধ করেছিলাম বটে, কিন্তু সে একটু বাদেই সেরে যাবে। ... শোন ফ্রসিয়া, আমি ভাবছিলাম যদি পিটরেরও ঐ অবস্থা হয়ে থাকে। ... শুনছ, বরং সে যেন প্রথম যুদ্ধেই মারা যায়, একটা বোমার ঘায়ে যদি সে উড়ে যায়, ট্যাঙ্ক-এর সাহায্যে যদি তাকে পিষে ফেলা হয়, তাও বরং ভাল। ..."

আবেগের সঙ্গে জড়িত কণ্ঠে সে মেয়েটাকে সোজা ফিস্ ফিস্ করে বলল। ফ্রসিয়া তার হাতে একটু চাপ দিল।

"ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর। ..."

"আর, আর যদি তাও না ঘটে, তা হলে সে যেন নিজের হাতে নিজের মাথাটা গুলি দিয়ে উড়িয়ে দেয়, শুধু এটা নয়—এটা যেন তার ভাগ্যে না ঘটে!"

"নিশ্চয়। ··· কিন্তু তুমি বরং উঠে পড়। আমি তোমাকে ধরে তুলছি, এখানে থাকলে তুমি শীতে জমে যাবে।"

বাস্ত্যচিখা কষ্টে স্রষ্টে উঠে ফ্রসিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াল এবং চেষ্টা করে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। বড় বড় চোখ দুটো পাকিয়ে গ্রিশা ভীত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল। বিছানার কাছে আসতেই সে শুয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল। তার সর্বাঙ্গ কন্‌কন্ করছে এবং বমি-বমি করছে। কিন্তু সে কথা সে একদম ভাবছিল না।

"আয় বাবা গ্রিশা, কাছে আয়!"

ছেলেটি বিছানার কাছে এগিয়ে গেল।

"গ্রিশা, কি বলছিলাম শুনেছিস্?"

"শুনছি বটে, কিন্তু তুমি তো এখনও কিছুই বল নি।"

"শোন্ বাবা, যদি কখনও মৃত্যু ও জার্মান-অধীনতা—এ দুয়ের মধ্যে একটা তোকে বেছে নিতে হয় (ঈশ্বর না করুন), তা হলে তুই মৃত্যুকেই বেছে নিস্!"

"তোমার মাথা কি একদম খারাপ হয়ে গেছে!" বিস্মিত ফ্রসিয়া বলে উঠল। "দুধের ছেলে, মাত্র পাঁচ বছর ওর বয়স ..."

ছেলেটা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল।

"ছেলেটাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? ও সম্বন্ধে ওর এখনও কোন ধারণাই হয় নি এবং ও যখন বড় হবে, তখন এখানে একজন জার্মানও থাকবে না!"

বাস্ত্যচিখা ক্ষানিকক্ষণ কি ভাবল।

"হয় ত তোমার কথাই ঠিক। বর্ণ-সঙ্করের শেষ ডিমটিও যদি এ লড়াইয়ে নিঃশেষে ধ্বংস না হয়, তা হলে পৃথিবীতে সুবিচার বলে কিছু রইল না!"

বাস্ত্যচিখা পেটটা চেপে ধরে কাৎরে উঠল।

"শুনছিস ফ্রসিয়া? মনে হচ্ছে, সত্যি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ব। ..."

"তাই যদি হয়, তাও ভাল। দাঁড়াও, একটু ঠাণ্ডা জল এনে দিচ্ছি।"

ফ্রসিয়া একটা বালতি করে খানিকটা জল এনে একফালি ছেঁড়া নেকড়া ভিজিয়ে নিল। ফ্রসিয়ার কাজের দিকে বাস্ত্যচিখা চেয়ে রইল, ; যন্ত্রণাটা সম্ভবত

এখন একটু কম। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গ্রিশার অশ্রুসজল মুখের পানে।

"এখনও তুই ভয় পাচ্ছিস? কি বোকা ছেলে!... আমার মনে হয় ছেলেটাও বাপের মতই হবে! ..."

"কি করছ তুমি? কচি ছেলে, তাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ, তাই তো ও কাঁদছে। এতে আর অন্যায়টা কি? তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে কি চাও?"

"আমি চাইনে কিছুই। ... একটা কথা মনে করে আমি স্বস্তি পাচ্ছি নে যে, যদি কিছু হয় তা হলে আত্মহত্যা করবার মত সুবুদ্ধি তার আছে কি না।"

"জ্বালিও না, যা দরকার তিনি তাই করবেন।"

"কিন্তু দেখছ তো, আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি। ... সে ওই রকমেরই লোক; নিজে কখনও কোন বিষয় ভেবে চিন্তে দেখে না, সব সময়েই পরামর্শ চায়; সব কিছুরই কি এবং কেন—অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে চায়। ... এখন তাকে কে সুপরামর্শ দেবে? সত্যি, সে বড় অসহায়।"

"তিনি এখন সৈন্যদলে আছেন, কাজেই কি করতে হবে না হবে, সব কিছুর জন্যেই উপরওয়ালাদের কাছ থেকে নির্দেশ আসে। ভয়ের কি আছে?" ফ্রসিয়া বলল এবং ন্যাকড়ার পটি পেটের উপর চেপে ধরল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে কালশিরা পড়ে গেছে।

"হাঁ, হুকুম, সত্যি তাই," বান্যুচিখা বলল।

"আয়, গ্রিশা, তোর মুখটা ধুয়ে দিই, কি বিশ্রী দেখাচ্ছে! ছি, কাঁদে না। দেখছ, মায়ের অসুখ করেছে, শুয়ে আছে; একটা জার্মান তাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরেছে, তবু তো সে কাঁদছে না।"

ছেলেটি তার বড় বড় চোখ দুটো মায়ের দিকে নিবদ্ধ করে নাক খুঁটতে লাগল।

"নাক থেকে আঙুল সরিয়ে নে বাবা," বান্যুচিখা পুত্রকে ভর্ৎসনা করল। "তোর বাবা একজন লাল পল্টনের লোক, আর তুই কি-না ওখানে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে নাক খুঁটিস!" সে আবার আর্তনাদ করে উঠল। "ওঃ, ফ্রসিয়া, এক ছিল্‌কা, এক কণা রুটিও তারা পেল না।... তারা সকলেই মরবে, বেচারী, তারা নিশ্চয় মরবে।... ভেবে দেখ, ওরা আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেল। অথচ কেউ তাদের এতটুকু সাহায্য করতে পারল না, এক কণা রুটি বা এক গ্লাস জল খেতে দিতে পারলাম না। তারা যেন নিজের বাড়ীতে এসেছে মরবার জন্যেই।... ওদের তারা কোথায় টেনে নিয়ে গেল?"

"শুনেছি রুদিতে একটা শিবির আছে, সেখানেই হয়তো ওদের নিয়ে যাচ্ছে।"

"ওরা রুদি পর্যন্ত হেঁটে যাবে কেমন করে? দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না! কয় মাইল দূর হবে বলতে পারিস? না, ওরা সেখান পর্যন্ত পৌছতে পারবে না, তা ছাড়া ওই দু'জনকে খুন করে যেমন করে পথে ফেলে রেখেছে তেমনি করে সকলকেই তারা খুন করে ফেলবে।..."

"ছেলেরা গেছে গ্রামপ্রান্তে বাঁকের কাছে, সেখানে রাস্তার উপর ওদের জন্যে কিছু রুটি রেখে আসবে, ওরা সে পথ দিয়েই ত যাবে, যদি কিছুটাও তারা কুড়িয়ে নিতে পারে। জার্মানরা হয়তো লক্ষ্যও করবে না।..."

"ছেলেরা যদি ঠিক মত রুটিগুলো রাখতে পারে।... রাস্তার ঠিক মাঝখানে ... আমাদের ছেলেরা আগে আগে চলেছে, আর রক্ষীরা পিছন পিছন।..."

"ছেলেরা ঠিকমতই কাজটা করতে পারবে, তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল," ফ্রসিয়া মিষ্টি করে বলল! "আমাদের ছেলেরা সোনার চাঁদ। তুমি তো জানই।"

বাস্যুচিখা নীরবে তার মাথা নাড়ল। কিন্তু হঠাৎ তার ঘুম পেল। একটা অপ্রীতিকর অবসাদ তাকে পেয়ে বসল। তার সঙ্গে এল সাংঘাতিক বমির ভাব। কিন্তু এই জ্বরতপ্ত কোটরগতচক্ষু বন্দী লাল পল্টনের লোকটির কথা মনে হতেই ওর চিত্ত মথিত হয়ে উঠল। তার সেই রুটির টুকরো কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টার মধ্যে যে ক্ষিপ্রতা ও বুভুক্ষার করুণ চিত্র প্রতিফলিত হল এবং শেষ পর্যন্ত তার সেই ব্যর্থতা—সব কথা মনে হয়ে তাকে অত্যধিক পীড়া দিতে লাগল।

"ওঃ। …"

"কি, যন্ত্রণা বেড়েছে ?" চিন্তিত হয়ে ফ্রসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"না, না। … একটু যদি ঘুমোতে পারতাম। …"

"বেশ তো, ঘুমোও না। তোমার পক্ষে এখন ঘুমই একমাত্র ওষুধ, একটু ঘুমোতে পারলেই সেরে যাবে," মেয়েটি বলল।

বান্‌যচিখা চোখ বুজল, কিন্তু তখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ধূসর মলিন মৃত্যুপথযাত্রী তরুণের মুখখানি, তাঁর টুপির ফাঁক দিয়ে এক গোছা চুল এসে কপালে পড়েছে। সেই কালো রুটির টুকরাটির দিকে কি উন্মাদ দৃষ্টি দিয়েই না সে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তার মনে হল যে, তাদের সেই তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে চলা এবং চলতে চলতে বরফের উপর পড়ে যাওয়া, এবং বিশেষ করে, সেই ক্ষুধার্ত তরুণ লাল পল্টনকে রুটির টুকরো দিতে না পারা—এর কোনটাই সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না।

ছেলেরা তখন ঘন বরফের ভিতর দিয়ে গ্রামের পিছন দিকে বাঁকের কাছে পৌছতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাড়ী বা খামারের কাছে যেতে বরফ তত গভীর নয়, কিন্তু খোলা জমিতে জায়গায় জায়গায় বরফ অপ্রত্যাশিত ভাবে গভীর। বরফে অসকা চেচোরের কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল।

"সাশকা! সাশকা!"

"চুপ, চেঁচাস্ না। তোর গলা শুনে জার্মানরা ছুটে আসবে। তুই ছেলেমানুষ, বাড়ী ফিরে যা।"

"আমি উঠতে পারছি নে! …"

"কোন রকমে উঠে পড়্! সময় নেই, তোরা সব তাড়াতাড়ি কর্!"

এখানটায় জমি অত্যন্ত অসমান, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঢিবি, কোথাও বা গর্ত। কিন্তু সর্বত্রই অসমান বরফের আস্তরণ। গর্তগুলো ফাঁদের মত। দেখতে মনে হয় সমান, কিন্তু পা পড়লেই ছেলেরা ডুবে যাচ্ছে। বরফের উপরের আস্তরণটা শক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে খানিকটা বেশ হেঁটে যাওয়া চলে, কিন্তু হঠাৎ সশব্দে বরফের আস্তরণ ভেঙ্গে যায় আর ছেলেরা

নরম বরফের মধ্যে তলিয়ে যায়। তারা হাতের সাহায্য পায় না, কারণ রুটি, গোল আলু, রাইকেকে হাত তাদের জোড়া। ভাঙা কাচের মতই বরফও ধারালো এবং কাচের মতই বরফও হাত-পা কাটে! ছেলেরা একজনের পর আর একজন শ্রান্ত হয়ে পড়ল, একমাত্র সাশা আর সাভ্কা লোকুৎই একগুঁয়ের মত এগিয়ে চলল। রাস্তাটা যেখানে বৃত্তাকারে বেঁকেছে সেই বাঁকটাই ছেলেদের গন্তব্য স্থল সেখানে পৌঁছতে হলে গোটা গ্রামটা ঘুরে নীচের সুবিস্তীর্ণ মাঠ পার হতে হবে।

"আরও তাড়াতাড়ি চল, আরও তাড়াতাড়ি!" হাঁপাতে হাঁপাতে সাশা বলে। তার দম আটকে আসছে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। ঘাম বয়ে চোখের মধ্যে পড়ছে। এক পাশের পাঁজরায় তার একটা ব্যথা ছিল, সেটাও বেড়ে গেল। ভারী কষ্ট হতে লাগল। চলতে গিয়ে পা দুটোও পিছলে যাচ্ছে। বার বার পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে, কষ্টেসৃষ্টে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছে। ধারালো বরফে তার হাত কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে বরফ লালচে হয়ে যাচ্ছে। সে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার বইয়ের থলেটি নিয়ে এসেছিল। জার্মান আক্রমণের আগে সে স্কুলে যেত এই থলেতে বই নিয়ে। থলেটা এখন বেশ কাজে লেগেছে। তার মধ্যেই রুটি ইত্যাদি ভরে ঝুলিয়ে নেওয়ায় চলবার পক্ষে তার বেশ সুবিধাই হয়েছে। থলেতে রুটি বেশ ভালই ছিল এবং হাত দুখানিও তার যথেষ্ট কাজে আসছিল। সাভ্কা সাশার পিছন পিছন আসছে, চলতে চলতে তার জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। একজন আগে আগে চলায় সাভ্কার পক্ষে তার অনুসরণ করা সহজ হল। নইলে সে সাশার চেয়ে বয়সেও ছোট, এমনিও দুর্বল; তার পক্ষে পথ চলা কঠিনই হত।

বরফাস্তীর্ণ মাঠ যেন আর শেষ হতেই চায় না। অথচ গ্রীষ্মকালে এই ময়দানেই গরু-ঘোড়া চরিয়েছে, তখন এটা এত বড় মনে হয় নি। পা-তুলতুলে ঘাসের উপর দিয়ে যে-কেউ অনায়াসেই একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৌড়ে যেতে কষ্ট বোধ করে নি। গোচারণ ভূমিটা ছেলেদের বেশ ভাল করেই মনে

আছে, যখন থেকে তারা হাঁটতে শিখেছে তখন থেকেই এখানে তারা খেলাধূলা করে আসছে। কিন্তু এখন যেন সেই ময়দানটাই তাদের কাছে অজানা অচেনা মনে হচ্ছে। সীমানার চিহ্নগুলিও আর দেখা যায় না। যে গর্তগুলোতে তারা অত লাফালাফি করেছে, সে গর্তগুলোও আর নেই, ঢিবিগুলোর উপর খালি পায়ে শত শত বার ওঠা-নামা করেছে, সেগুলোও নেই। সমতল জমির উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তারা করল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বারম্বার ব্যর্থতায় পরিণত হল। সর্বত্রই বরফ, কিন্তু বরফের তলায় কোথায় কি লুকিয়ে আছে, বাইরে থেকে তো তা বোঝা যায় না। ছেলেরা তবু এগিয়ে চলেছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে, গর্তের ভিতর কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেছে, আবার চেষ্টা করে উঠে এসেছে। হাত-পা কেটে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। তবু যেন তাদের যন্ত্রণাদায়ক অভিযানের শেষ নেই।

"জল্‌দি!" সাশা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে একগাল বরফ থু থু করে ফেলে দিল।

ঝুলিটা কাঁধে ঝুলছে, ভিজে সেটা ক্রমশ ভারী হচ্ছে। পা ভিজে গেছে, পা-জামাও সপ্‌সপে হয়েছে। এবং যতটুকু সময় শক্ত বরফের উপর দিয়ে অনায়াসে হাঁটতে পারছে সেটুকু সময়ও ভিজে জামাকাপড় তার গায়ে শুকোতে লাগল এবং ফলে শীতে তুষারে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেল। তার সুমুখে লাল-কালো কতকগুলি ছোট ছোট আংটি দেখতে পেল। মনে হল দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথায় এসে চড়েছে, হয়ত এখুনি রগ ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরে জায়গাটা লালচে হয়ে যাবে।

"জল্‌দি, জল্‌দি!" ও কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। এবং তাতে ফল হল এই যে, সাভ্‌কা যেন চাবুক খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল। অথচ সাশার মনেই ছিল না যে, সে একা নয়, তার সঙ্গে কেউ আছে। সে নিজেকেই তৎপর হওয়ার জন্যে কথাটা বলে উঠেছে, কারণ সে বুঝতে পারছিল যে, যে-কোন মুহূর্তে সে পড়ে গিয়ে আর হয়তো উঠতেই পারবে না।

সাভ্‌কা অনেক পিছনে পড়ে আছে। কিন্তু সাশা জানে যে, অদৃষ্টে যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে রাস্তাটার সেই বাঁকে পৌঁছে গিয়ে ঝুলির ভিতরকার

খাদ্যদ্রব্যগুলি রাখতেই হবে। বন্দীদের খাদ্য পাওয়ার এই হচ্ছে শেষ সুযোগ। সে যদি বিফলমনোরথ হয় তা হলে বন্দীদের শেভানেভ্কার শ্মশানের মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে রুদি পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখানে বন্দিনিবাস আছে। লোকেদের মুখে সে শুনেছে যে, রুদির বন্দিনিবাসে যে সকল লাল পল্টন কাঁটা-তারের বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ আছে তারা এক কণা খাদ্য বা এক ফোঁটা পানীয়ও পায় না এবং ফলে শত শত লোক মারা যাচ্ছে। একমাত্র সাশাই এখন বন্দী লাল পল্টন আর রুদি বন্দিনিবাসের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হল, তার আনা রাই-কেক, রুটি দিয়ে সে প্রত্যেকটি বন্দীকে অনাহার থেকে বাঁচাতে পারবে।

আর একটি মাত্র টিলা পার হতে পারলেই সে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। জল্দি, জল্দি, সাশা আপন মনে নিজেকে তৎপর হওয়ার জন্যে বলতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল যে, ক্রমেই সে কাবু হয়ে পড়ছে, তার পা দুটো আর তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না। পাঁজরায় যে একটা ব্যথা ছিল সেটাও সঙ্গীন হয়ে দেখা দিল। কান ভোঁ ভোঁ করছে এবং তার মনে হল যে তার মুখে যেন রক্তের একটা বিশ্রী পান্সে স্বাদ। জল্দি! জল্দি! সাশা বরফের উপর মুখ থুব্ড়ে পড়ে গেল। জলে ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ যেমন হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, তেমনি অস্থিরভাবে সে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। হাতে পায়ে ভর দিয়ে শেষ টিলাটির উপরে গিয়ে সে উঠল। এর পরই রাস্তাটা থাকবার কথা।

হাঁ, আছে, ঠিক এর গায়েই রাস্তাটা। এই রাস্তা ধরেই জার্মানরা লাল পল্টনদের নিয়ে চলেছে। সাশার মনে হচ্ছিল, সমস্তটাই যেন এক বীভৎস স্বপ্ন। ও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এটা বাস্তব। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়। দুই হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সাশা টিলাটার উপরই শুয়ে পড়ল। ওরা তার পাশ দিয়ে চলে গেল। যারা আহত তারা মাতালের মত টলমল করছে। জার্মানগুলো থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছে। টিলার উপর উঠতে গিয়ে কেউ কেউ পড়ে গেল, কিন্তু

রাইফেলের গুঁতো, লাথি আর গালাগালির চোটে তারা আবার উঠে দাঁড়াল। সাশা লক্ষ্য করল যে, তারা একেবারে ওর গা ঘেঁষে মার্চ করে চলেছে। ওর বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আর দু মিনিট কি তিন মিনিট আগে এলেই ঠিক হত! লাল পল্টনদের সামনে পড়ে আছে এই বিস্তীর্ণ জনশূন্য পথ, সেখানে শুধু বরফ আর বরফ। রাই-কেকগুলো ওর ঝুলির মধ্যেই থেকে গেল। সেগুলো জলে ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। বন্দীরা যে পথ দিয়ে চলেছে সেখান থেকে মাত্র দশ-বার কদম তফাতে ওর মোটা কাপড়ের ঝুলিটার ভিতর কেকগুলো পড়ে রইল, মাত্র দু-তিন মিনিট দেরী হওয়ার জন্যে ওরা কেউ পেলে না। ও যদি আর একটু জোরে ছুটে আসত, যদি আর একটু পা চালিয়ে টিলার উপর উঠত, তা হলে হয় ত ওরা পেত। ওর উচিত ছিল, কিন্তু ও যে তা পারে নি। সাশা মিশকার কথা ভবতে লাগল। হাঁ, মিশকা হলে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছত। সে খুব দৌড়তে পারত। এখন জার্মানরা লাল পল্টনদের রুদিতে নিয়ে যাবে, সেখানে তারা কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে বাস করবে। ঠাণ্ডায়—অনাহারে তারা মরবে, কেবল ওরই জন্যে। ...

শেষ দলটি ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা এখন সেখান থেকে এগিয়ে চলে গেল। দূরে, দূরে, ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই তারা রাস্তার শুভ্রতায়, অসীম বরফাস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাশা মাথা থুবড়ে বরফের উপর পড়ে গেল এবং কাঁদেত শুরু করে দিল। চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা করে বরফের উপর পড়ছে, নাকও ঝরছে, ফলে তার মুখখানি ভিজে গেল। পা দুখানি ভিজে, সপ্‌সপে হয়ে গেছে, একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতে যেন জমাট ধরে গেছে এবং পাঁজরার ব্যথাটাও এমন অসহ্য রকম বেড়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে যেন ছোরার আঘাত করছে কেউ। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াতে পারল না, চাইলও না। তারা চলে গেছে, অনেক দূরে চলে গেছে, ও দু-তিন মিনিট আগে আসতে পারলে ওদের খাবার দিতে পারত।

কি সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, কি ভয়ঙ্কর শীত! সাশা কাঁদছে, যারা এই শীতের মধ্যে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলেছে, তাদের জন্যে কাঁদছে; মিশাকে দালানে কবর দিয়েছে, তার জন্যে কাঁদছে; বাবার জন্যে কাঁদছে, যিনি গ্যেরিলা দলে যোগ দিয়েছেন, আর সবার উপর ও কাঁদছে ওর ব্যর্থতার জন্যে—ও কিছুই করতে পারল না। ...

ও ক্রমেই শীতে জমে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করল না। ... ঠাকুর্দা য়েভদোকিম-এর মুখে গল্পটা শোনা। অনেক, অনেক দিন আগে একদল হোয়াইট গার্ড জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে অত্যধিক শীতে জমাট বেঁধে মারা যায়, তাদের কেউ বেঁচে ছিল না। একদল রেড গার্ড এসে তাদের লক্ষ্য করে বলে উঠল: "হাত তোল!" কিন্তু তারা যেমন বসে ছিল তেমনই বসে রইল, এতটুকু নড়ল না। একমাত্র য়েভদোকিমই বুঝতে পারল ব্যাপারটা কি। সে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তারা সেখানে বসে আছে, যেন জীবিত, কিন্তু আসলে তাদের সকলেই শীতে জমাট বেঁধে গিয়েছে। ... এখানে কেউ কখন আসবেও না। ওকে খুঁজতে কে এখানে আসবে? ও এখানেই পড়ে থাকবে, অনন্ত কাল ধরে পড়ে থাকবে। ...

"সাশ্‌কা, শীগগির ওঠ্, শীগগির ওঠ্!"

সে থর থর করে কেঁপে উঠল এবং মুখখানা বরফের মধ্যে আরও গুঁজে ফেলল।

"কি হয়েছে, বাবা? ওঠ, দেখছিস কত শীত। ... কাঁদে না বাবা, কাঁদবার কি আছে?"

মা পাশে বসে পড়ল এবং আদর করে আস্তে আস্তে কাঁধে চাপড় মারতে লাগল।

"দেখছিস, কেমন ভিজে সপসপে হয়ে গেছিস! উঠে চল্, বাড়ী যাই। আমারও খুব শীত লেগেছে, আমার আঁচলও এখানে আসতে গিয়ে ভিজে গেছে। যাওয়া অবশ্য কষ্টকর। ... চল্, উঠে পড়্ এখন। ..."

মা জোর করে তার মাথাটি টেনে তুলল। সাশা মায়ের দিকে সজল ফোলা চোখ দুটি মেলে তাকাল।

"এতে করবার আমাদের কিছুই নেই, বাবা। ঠিকমত কাজ হয়নি," সে বিরস কণ্ঠে বলল।

"আমাদের দেরী হয়ে গেছে," সাশা চুপি চুপি বলল, তার কণ্ঠস্বর ফোঁপানোর জন্যে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল।

"তাতে কি হয়েছে, বাবা, কাজটা ঠিক মত হয় নি। এ রকম ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমিই পথ চিনে তোর কাছে আসতে কত কষ্ট পেয়েছি। আয়, এখন আগে বাড়ী যাই। ..." মা ছেলের হাত ধরে টানল। সাশা আস্তে আস্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বসল।

"কাজটা এবারে ঠিক মত পারলে না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় এই প্রার্থনাই কর। ..."

"ভবিষ্যতে যখন তারা আমাদের সৈন্যদের এখান দিয়ে নিয়ে যাবে, তখন আর আমরা দেরী করব না, এতদূরে ছুটে আসতেও হবে না। আমরা ঘরের মধ্যেই থাকব এবং তাদের যা দেওয়ার তা রাস্তায় ছড়িয়ে রাখব। আজ আমরা দল বেঁধে এসেছি, হৈ চৈ করেছি, তাই কোন সুফল পেলাম না। ... কিন্তু কে জানত?"

চোখ দুটি মাটীতে নিবদ্ধ করে সাশা ধীরে ধীরে মায়ের পাশে পাশে হেঁটে চলল।

"সাভকা আধ-মরার মত পিছন পিছন দৌড়ে আসছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কোথায়! সে জবাবে বলল, তুই বরফের উপর পড়ে আছিস। ... হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে চলে এসেছি। ... কিন্তু তুই কাঁদিস নি, যা অসম্ভব, তুই তা সম্ভব করতে পারিস নে। ... এখানে কত গভীর গর্ত আছে। ... এরকম শীত শীগগির পড়ে নি। ..."

মায়ের পক্ষে চলাটা ভারী কষ্টকর, কিন্তু তবু সে চলতে চলতে সারাক্ষণ কথা বলছিল এবং ছেলেকেও চলতে সাহায্য করতে লাগল।

"তুই আমার পিছন পিছন থাকিস, ঠিক পিছনে, তাতে চলতে সুবিধা হবে! ..."

সাশা ও সাভকা যে পথ ধরে এসেছিল ওরাও সেই পথ ধরেই চলল। খানিকটা এসে সাভকা ফিরে গেছে, মা গোটা পথটাই অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু তবুও সাশার মনে হতে লাগল যে এ পথ যেন সে পথ নয়, এ পথ সে চেনে না। মা বলেছে যেতে কষ্ট হবে এবং যদিও পথটা এখন সুচিহ্নিত, তবু সাশা যেন দেহটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। বুট ভিজে এত ভারী হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছিল—এক একটারই ওজন যেন এক মণ করে। হাত দুখানি, মাথাটাও লোহার মত ভারি হয়ে গেছে। হাত পা ও পিঠের প্রত্যেকখানি হাড় ও অনুভব করতে পারছে এবং প্রত্যেকখানিই অসহ্য যন্ত্রণায় টন টন করছে, যেন চিবোচ্ছে।

তারা যখন রাস্তার উপর এসে পৌছল তখন আর ও চলতে পারছে না। টলমল করছে; মাটীতে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, মা সঙ্গে সঙ্গে এসে ওকে ধরে ফেলল।

"কি হয়েছে, বাবা, অমন করছিস কেন ?"

"ন্-ন, কিছু না," জড়িত স্বরে সাশা বলল। কিন্তু তখন ওর চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। মাথাটা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে।

মা নীচু হয়ে ওকে কোলে তুলে নিল।

"কি করছ, মা!"—সাশা আপত্তি জানাতে চাইল। কিন্তু মাথার নীচে মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। মাল্যচিখা নিদ্রিত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

"ব্যাপার কি, কিছু হয়েছে?" তের্পিলিখা এক আঁটি জ্বালানি কাঠ নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিল। ওদের দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। তার চোখের কোলে তখনও জলের দাগ, কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"না ··· ছেলেটা ভারী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওই উচুনীচু রাস্তা দিয়ে ছুটে এসেছে; কত খনা-খন্দ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ..."

"ঠিক সময় গিয়ে পৌছতে পেরেছিল ?"

"না, কেমন করে পারবে? … ও পথ দিয়ে চলা জোয়ান লোকের পক্ষেই কষ্টকর। …"

মাল্যুচিখা হাঁপাচ্ছিল, কাজেই আরও আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

"তোমার বেশ ভারবোধ হচ্ছে নিশ্চয়ই। …"

"হাঁ, ভারী বই-কি। … নয়ে পা দিয়েছে,"—মাল্যুচিখা ঘুমন্ত ছেলেকে বুকের মধ্যে আরও চেপে ধরল। "যেন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গোর্পিনা, আমাকে একটু সাহায্য কর না বোন, নইলে দরজাটা খুলতে পারব না। …"

তেপিলিখা দরজাটা খুলে দিল। খানিকটা গরম বাতাস ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

"মা, মা!" জিনা কেঁদে উঠল। "সাশার কি হয়েছে মা?"

"কিছু না, ঘুমিয়ে পড়েছে। চেঁচিয়ে ওর ঘুম ভাঙাস্ নি।"

"ঘুমোচ্ছে?" ছেলেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। তারা সকলে মাল্যুচিখাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত সাশাকে দেখতে লাগল। মা তার পা থেকে আস্তে আস্তে বুট খুলে নিল, ভিজে পা-জামাটা খুলল, তারপর একখানা শুকনো সুতী কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছে দিল।

"তোমার আঁচলটা একদম ভিজে গেছে," সোনিয়া বলল। "কোথায় গেছ্‌লে তুমি?"

"ও কিছু না, এখনই শুকিয়ে যাবে। ওর বুট জোড়াটা উনোনের ধারে রেখে আয় তো।"

জিনা জোরে নিশ্বাস ফেলে বুট জোড়া নিয়ে গেল।

"ঝুলির মধ্যে কি আছে?"

"রাই-কেক। তোরা নিয়ে খা।"

"ভিজে সপ্‌সপে হয়ে আছে যে। …"

"তাতে কি? বেশ খেতে পারবি।"

"আমি একটা নিই?" ঝুলির ভিতর থেকে রাই-কেকগুলি ঢালতেই সে-গুলোর দিকে তাকিয়ে জিনা বলে উঠল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আজ তো রাতে ওই খেয়েই থাকতে হবে। সোনিয়া, ভাগ করে দে তো মা, সকলকে। সাশার জন্যেও কিছু রাখ। ঘুম থেকে জেগে উঠে ওর খিদে পাবে।"

জিনা সেই ভেজা রাই-কেকের খানিকটা মায়ের জন্যে নিয়ে গিয়ে বলল ঃ "মা, এটুকু তোমার জন্যে। ..."

"আমার চাইনে, বাছা, আমার খিদে নেই। ..."

ছেলেরা তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল, এককণা পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা কুড়িয়ে নিচ্ছে। মাল্যুচিখা সাগ্রহে তা দেখতে লাগল। যাদের মৃত্যুর পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ খাদ্য তাদের কাছ পর্যন্ত পৌছয় নি। ওর গলার মধ্যে কি যেন একটা আটকে আছে। ছেলেরা সকলেই খেতে ব্যস্ত, খেতে খেতে এক-আধ কণা পড়ে যাচ্ছে, তাদের খুদে হাত দিয়ে তারা কণাটুকু পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছে। ... সাশা বড় দেরীতে গিয়ে পৌছেছিল, বড় দেরী করে ফেলেছিল। ...

সাশার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত ভাবেই পড়ছিল। ওর গালের স্বাভাবিক গোলাপী আভা ফিরে এসেছে। তবু ওর মনে পড়ল, মিশা নেই। কথাটা মনে হতেই ওর অন্তরটা যেন ছিন্নভিন্ন হতে লাগল।

হঠাৎ ওর মনে হল, মিশার মৃত্যুর পর আরও অনেক খারাপ, আরও অনেক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ওর চোখের সামনে আবার সেই বন্দীদের দৃশ্য ভেসে উঠল। রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো খেতে খেতে তারা এগিয়ে চলেছে! সেই ভীষণ বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখ, তাদের সেই কোটরগত জ্বরতপ্ত চোখ! ক্ষতবিক্ষত পা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। বরফের উপর, রুটির জন্য তাদের সেই বিশীর্ণ নখরের মত আঙুলগুলি প্রসারিত, এত কাছে, অথচ এত দূরে, এবং সবার উপর রাস্তার উপরকার সেই নিহত লোক দুটি! ... সেই সঙ্গে ভেসে উঠল মিশার চিত্র। সে টেবিলের উপর শুয়ে আছে, বুকে গুলির ক্ষত। আগের চিত্রখানির কাছে এ চিত্রখানি যেন ম্লান হয়ে গেল।

মাল্যুচিখা দুহাতে চোখ ঢাকল। ছেলে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর নিজের ও চেচোরিখার ছেলে-মেয়েরা রাই-কেক খাচ্ছে, কণাটুকু পড়ে গেলেও তা কুড়িয়ে নিচ্ছে। ভবিষ্যতে অদৃষ্টে কি জমা আছে কে বলবে? প্রতিদিনই নতুন নতুন দুঃখ-বেদনা দেখা দিচ্ছে। প্লাতোন এখন কোথায়? ও কি আর একবারও তাকে দেখতে পাবে না? মিশা দালানে মাটীর নীচে শুয়ে আছে। প্লাতোনের কোন খবরই ও পায় নি—হয়ত তাকে কুকুরের মত বিষ খাইয়ে মেরেছে, মৃত দেহটা বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ... ওলেনা, ফাঁসী-কাঠে-ঝোলানো লেভন্যুক, আরও অনেকে। ... একমাস হয়েছে—এও কি সম্ভব, মাত্র এক মাস হয়েছে! এই যে ছোট্ট একটি মাস কেটে গেল, ভাবলে মনে হয় যেন সে একটা সুদীর্ঘ জীবনকাল। যেন অনেক—অনেক বছর কেটে গেছে, দুঃখ বিভীষিকা এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের চরম অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। "মাত্র এক মাস!" ও আপন মনে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল। আগে আগে শস্য বুনবার দিন আসত, ঘাস কাটার দিন যেতো, ফসল তোলবার দিন আসত—জমি থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে আলু তোলা হত, নিঃশব্দে দুঃখবেদনাহীন কত সুন্দর মাস একটির পর একটি আনন্দের সঙ্গে কেটে গেছে! মাস যেত, বছর আসত, কিন্তু এতটুকুও জানতে পারে নি। আর এখন?—এখন একটি মাস, শুধুমাত্র একটি মাসকেই মনে হয় যেন পুরো একটা জীবনকাল। জগদ্দল পাষাণের মত বুকের উপর স্মৃতির মাঝখানে চেপে বসে; ক্ষতবিক্ষত শত চিহ্ন রেখে যায়—যা জীবনে কোন দিন মুছে যায় না।

হঠাৎ সাশা চমকে জেগে উঠল। নিজেকে বাড়ীতে দেখে ও বিস্মিত হল। কেমন করে ও বাড়ী এল? মা যে ওকে কোলে করে নিয়ে এসেছে, কেমন করে ও ঘুমিয়ে পড়ল, এর কিছুই ও জানে না। মুহূর্তের জন্যে ওর বিস্মিত চোখ দুটি কড়িকাঠের দিকে নিবদ্ধ হল। হাঁ, এ তো তাদের ঘরেরই কড়িকাঠ। জিনা উনুনের পাশে রয়েছে, সেখানে বসে সে তার সরু গলায় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে, তার চোখ দুটি সজল। একবার ঘরের সবটা একনজরে দেখে নিল। দেখল, মা তখন চুপটি ক'রে বেঞ্চের উপর উবু হয়ে বসে আছে—স্তব্ধ দৃষ্টি সামনের দিকে

প্রসারিত। গরমটা ভাল করে উপভোগ করবার মতলবে পা দুখানা কম্বলের তলায় ছড়িয়ে দিল। তখনও কিন্তু তার হাত ও পায়ের আঙুলের ডগাগুলোতে একটা সূচীভেদ্য যন্ত্রণা অনুভব করছে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ একটা তৃপ্তিকর অবসাদে ভরে উঠেছে। গরম কম্বল আরাম করে উপভোগ করা ভারী চমৎকার, অবশ্য তার সঙ্গে মাথায় দেওয়ার জন্যে যদি একটি বালিশ পাওয়া যায়, তা হলে তো কথাই নেই।

"কি ভাবছ মা ?"

মা চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল।

"সে কি, এরই মধ্যে তোর ঘুম ভেঙে গেল ?"

"হাঁ, আর ঘুমোবো না।"

"তবু আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাক্, শরীরটা একটু গরম হোক। ... বরফে এমন জমাট ধরে গেছলি ..."

এতক্ষণ যেন মা ওর কথা শুনতেই পায় নি, সাশার গায়ে কম্বলখানি ভাল করে ঢেকে দিয়ে বলে উঠল :

"আমি সেই দিনের কথা ভাবছিলাম, বাবা, যেদিন আমাদের লোকেরা ফিরে আসবে ..."

সাশা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল। "এখানে আসবে ? আমাদের এই গ্রামে ?"

"হাঁ, এইখানে আমাদের কাছে।"

"তারা কি রুদিতেও যাবে ?—ফিস ফিস করে সাশা বলল, যেন কোন গোপন কথা মায়ের কাছে প্রকাশ করছে।

"রুদিতে ? নিশ্চয়ই যাবে। প্রত্যেক জায়গায় তারা যাবে—দনীপারের এ-পারে ও-পারে যে সব গ্রাম ও শহর আছে, তার প্রত্যেকটিতে তারা যাবে। সীমান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি জায়গায়—যেখানে যেখানে আমাদের লোকেরা জার্মানদের উৎপীড়নে প্রাণ হারাচ্ছে, তার প্রত্যেকটি জায়গায় তারা যাবে।"

"বাবা কি তখন বাড়ী আসবে ?"

"হাঁ, সে আসবে। গ্যেরিলারা সকলেই বনের ভিতর থেকে বাড়ীতে ফিরে আসবে।"

"সবই কি আবার যেমন ছিল তেমনি হবে?"

"হাঁ, সবই আবার আগের মত হবে।" মা আপন মনেই বার বার বলতে লাগল, "হাঁ বাবা, আগের চেয়েও ভাল হবে।"

মাল্যুচিখা হঠাৎ নির্বাক হয়ে সেখানে বসে ভাবতে লাগল। এও কি সম্ভব যে, আবার সবই আগেকারের মত হবে? আমাদের কুটীরের চার পাশে কি তেমনই করে সূর্য্যমুখী ফুটে উঠবে? লিদা শহর থেকে যে ভূঁই চাঁপার বীজ এনেছিল তার সেই বড় বড় লাল ফুলগুলি কি আবার বাগানে ফুটবে? ছেলেরা কি আবার তেমনি কলরব করতে করতে ইস্কুল যাবে? গ্রীষ্মকাল এলে জিনা কিণ্ডারগার্টেনে যাবে, [illegible] সব খুদে খুদে ছেলে-মেয়েরা আবার তেমনই আনন্দে নাচগান করবে? ঘরে ঘরে তৈরী হবে আবার প্রচুর রুটি, হাঁড়ি ভরা দুধ! সন্ধ্যা হলে ওঁরা যাবেন ক্লাবে ···

গ্রামের উপর শত অত্যাচার করা সত্ত্বেও আবার সব কিছুই হয় তো ফিরে আসবে, মিশুৎকা আর স্কুলে যাবে না, মিতিয়া লেভন্যুক আর মাঠে কাজ করতে করতে গান গাইবে না, ওলেনা আর তার ট্রাক্‌টর চালাবে না, গ্রামের কিশোরী-দের চোখ আর ভাসিয়া ক্রাবচুকের উপর পড়বে না, তবুও কাজে কর্মে জীবন চলবে তেমনি স্বচ্ছন্দ গতিতে। প্রত্যেকটি কেটে যাওয়া বছরের সঙ্গে গমের ক্ষেতে গাছগুলো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠবে, নতুন ফলন্ত গাছগুলি ক্রমশ নুয়ে পড়বে ফলভারে, যৌথখামারের গরুগুলো দুধের বালতি একের পর এক ক্রমে ভরে তুলবে এবং সবার ছোট ছোট ছেলেগুলো একদিন শহরে যাবে পড়াশুনা করতে। শুধু একটা জিনিস তাদের প্রয়োজন—ধৈর্য, তিতিক্ষা। আত্মসমর্পণ নয়—না, এ পৃথিবীর কোন কিছুর পরিবর্তেই নয়। ···

সারা কুটীর ভরে উঠেছে রক্তিম আলোতে। সূর্য অস্তায়মান, দিগন্ত রঞ্জিত করেছে তার সমস্ত রং উজাড় করে। জানলার তুষার জমে অদ্ভুত কতকগুলি পাতার মত দেখতে হয়েছে। সেগুলি ফুটন্ত গোলাপের মত স্বর্ণাভায় রঞ্জিত।

দেখতে দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। ছায়াগুলো হয়ে এল আরও ঘন। দিগন্তসীমায় অস্তমান সূর্যের রং মিলাতে না মিলাতে চাঁদ উঠল। বরফের মত ঠাণ্ডা, রূপালী চাঁদ—শুরু হল তার দুরন্ত যাত্রা। অস্তমান সূর্যের আভা পথ ছেড়ে দিল চাঁদের আলোকে। আকাশে ওঠা বাঁকা রামধনু ঝলমল করে উঠল, ঝিকিমিকি করতে লাগল, স্তব্ধ আর নিশ্চল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সকলের মনের উপর একটা দুর্ভেদ্য বিমর্ষতা নেমে এল, অত্যন্ত গভীর এবং ভয়ানক একটা বিমর্ষতা—যা তারা আগে কখনও বুঝতে পারেনি। রাস্তায় তখনও পদ-ধ্বনি থামে নি, বন্দীরা তখনও গ্রাম অতিক্রম করে চলেছে, জরতপ্ত ক্ষুধিত পাণ্ডুর শীর্ণ মুখগুলি ভূতের মত। ক্ষতবিক্ষত পা বরফের উপর চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। তাদের কর্কশ আর্ত চীৎকার ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি তোলে, ঘুমকে দেয় দূরান্তরে পাঠিয়ে: "রুটি!" কোটরগত চক্ষু জ্বলছে উন্মাদনায়, তাকাচ্ছে লোকের দিকে। জার্মান-বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো এসে পড়ে তাদের বুকে, বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার হুঙ্কার যেন চাবুকের মত লাগে তাদের গায়ে।

কৃষক-শিশুর চক্ষে বহে ধারা
তিক্ত আঁখিজল,
তুর্কী হাতে বন্দী—ক্রীতদাস আজ
পরেছে শৃঙ্খল।

সে কবে? সে কি? তুর্কী-বন্দী, তুর্কীদের পাল-তোলা জাহাজ চলেছে সুদূর সমুদ্র-যাত্রায়, তুর্কীদের বাঁকা তলোয়ার তাদের মাথার উপর। না, এ সেই নেঝিন থেকে কীয়েভ পর্যন্ত মৃত্যুর বেড়াজাল নয়—যাতে প্যান পটকি কিসানদের শূলে বিদ্ধ করেছিল। এ বহু দূর দিনের য়ুক্রেনের উপর তাতার-আক্রমণও নয়। আজ তার চেয়ে অনেক বেশি রক্তপাত, আর অনেক বেশি আগুন জ্বলে উঠেছে য়ুক্রেনের মাটিতে, গাথায় গীতবদ্ধ সেই বহু দূর দিনের দুঃখের চেয়ে এ দুঃখ অনেক নির্মম—যার স্মৃতি জনগণের মন থেকে কোন দিনই নিশ্চিহ্ন হবে না।

আজ দনীপারের দুই পারে সুবিস্তীর্ণ য়ুক্রেন জুড়ে যা ঘটে চলেছে তার কথা কোন্ গাথায় লিপিবদ্ধ হবে? সে কোন্ গানে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে

দেশ আচ্ছন্ন করা সেই অন্ধকার ছুর্দিনের কাহিনী—যা ছড়িয়ে পড়েছে মহামারীর মত, জল প্লাবনের মত, ক্ষিপ্ত ঝড়ের মত? এই রক্তের স্রোত-ধারা, ফাঁসীকাঠের দড়ির করুণ বিলাপ, শিশুর আর্তক্রন্দন, হাজার হাজার মৃত্যু, গ্রামগুলির উপরে কালো ধূম্রশিখার উত্তাল ঢেউ, এই অসংখ্য কবর, রুদি এবং অন্যান্য অনেক জায়গার তারে-ঘেরা বন্দিনিবাসের মধ্যে অগণিত ছেলেমেয়ের মৃত্যু—কোন্ গানে রূপায়িত হয়ে উঠবে? আর কে গাইতে পারে সেই গান, যে গান মানুষের রক্তকে ভয়ে জমাট করে দেয়?

"না।" মেয়েরা ভাবে এবং যে সব বন্দী রাস্তা দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে চলেছে তাদের দৃশ্য মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করে, "না, এ রকম গান কখনও হবে না। আবার আমরা কোমর বেঁধে ঘর-বাড়ী তৈরী করতে লেগে যাব। আবার শস্যক্ষেত্রে এমন বীজ বুনব যাতে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ শর্ শর্ করতে থাকবে। আর গমের ক্ষেতে সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাবে। রক্তরঞ্জিত ধরিত্রীকে সোনার গমে ঢেকে দেব, সূর্য-মুখী ফুল আবার দিক আলো করে ফুটবে, সর্বত্র বাগানে বাগানে সাদা ফুলের মিষ্ট হাসি ফুটে উঠবে, নীল মসীনা, লম্বা শণের বন—কৃষ্ণ সাগরের বুকে যে সব নদী গিয়ে মিশেছে তাদের ছুই পারে জার্মানদের অত্যাচারের কোন চিহ্নই আর থাকবে না।"

গ্রামখানি ডুবে গেল একটা পীড়িত বিষণ্ণ ঘুমের মাঝে। কিন্তু তাও কোন শান্তি এনে দিল না তাদের ছুই চোখে, তাদের বুকে; কোন শান্তি নেই। মাল্যু-চিখা ছেলেদের দিকে চেয়ে রইল। সাশা ঘুমের মাঝে ছটফট করছিল, আর অস্পষ্ট শব্দ করে কাঁদছিল।

"অমন করছিস কেন বাবা?"

ভয় পেয়ে সাশা জেগে উঠল। "কি হয়েছে?"

"উঠে বস্, বোধ হয় তুই খারাপ স্বপ্ন দেখছিলি।"

সাশা শূন্য দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে রাইল, তারপর পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর বুকের উপর গুরুভার পাথরের

মত চেপে বসল আবার সেই দুঃস্বপ্ন। সে স্বপ্ন যেন ওকে কিছুতেই রেহাই দেয় না।

বান্ট্যচিখা বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার সারা দেহ কন্ কন্ করে উঠছে। পাকস্থলীটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। অবশ্য তার জন্যেই যে তার ঘুম হচ্ছিল না, তা নয়, রক্তাক্ত কম্বলের ভিতর থেকে শ্মশ্রুযুক্ত বেদনার্ত মুখখানি যেন তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টির কি জ্বালা!

*

জামিনদারদের মধ্যে এক গ্রোখাচ ছাড়া আর কেউ ঘুমোয়নি। মালাশা হতাশভাবে আপন মনে চিন্তার জাল বুনে চলেছিল, আরও একটি দিন কেটে গেল, অথচ কোন কিছুরই পরিবর্তন হল না। শুকনো ঠোঁটগুলো পিপাসায় ফেটে উঠেছে, সে তো ও চোখের সামনেই সেদিন দেখেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই তাই ঘটেছিল। গ্রামের ভিতর তাই ঘটছিল—দিনের বেলায় রাস্তার ভিতর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল, জার্মানরা কখনও ফাঁকা আওয়াজ করে না। গ্রামে যারা বেঁচে ছিল তারা সেই গুলির আঘাতেই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সে, সে এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে সে, আর দেয়ালের শক্ত থামগুলোর পিছনে বসে জার্মান ভ্রূণটাকে বাড়িয়ে তুলছে।

য়েভদোকিম একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে যেমন বসেছিল তেমনি অবস্থায়ই নড়ে চড়ে বসল।

"সে কি, ঘুম হচ্ছে না?" চেচোরিখা জিজ্ঞাসা করল।

"না। ··· ঘুম পায়নি। ··· তোমরাও যে এখানে ভাল করে ঘুমোতে পারবে, তা তো মনে হয় না। দেখছি তো, তুমিও ঘুমোতে পারছ না। ···"

"আমি ভাবছি—কেবলই ভাবছি, কে কাকে গুলি করল? কাছেই কোথাও গুলি ছোঁড়া হয়েছে। ···"

"কাছে, না, দূরে—বলা শক্ত। ··· এই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা বদলে যেতে পারে। গীর্জার চাইতে কাছে কোথাও হবে বলে আমার মনে হয় না।"

"কে বলতে পারে? ···"

"আমরা যখন এখান থেকে বেরুব, তখনই সব জানতে পারব," মোলায়েম গলায় অল্গা পালাঞ্চুক বলল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," চেচোরিখা সমর্থন করল।

আসলে তারা সে বন্দিনিবাস থেকে মুক্তি পাবে, এবং গীর্জার ময়দানে নিয়ে গিয়ে যে তাদের জার্মানরা গুলি করে মারবে না, বরং তাদের ছেড়েই দেবে, গ্রামে গিয়ে তারা আবার আপন লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে—যেমন স্বাধীন লোকের সঙ্গে বলে—এইটা সুনিশ্চিতভাবে কারুর কাছ থেকে শুনবার জন্যে অল্গা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"আমাদের যখন ঘুম আসছেই না, তখন দাদু, তুমি যদি একটা গল্প বল তো সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।"

"কি গল্প বলব?" সে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল। "তা ছাড়া, গল্প বলবার মত আগ্রহ আমার এখন নেই। ..."

"তা হলে একটা গান কর না," অল্গা বলল।

"কি বললে? গান?—এখানে?"

"না কেন? আস্তে আস্তে গাও, তারা শুনতে পাবে না।"

অন্ধকারের মধ্যেই য়েভদোকিম মাথা নাড়ল।

"বেশ, গাইছি। ... পুরানো গান, আমার ঠাকুর্দা গাইতেন। ... তিনিও আবার শিখেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছ থেকে। গানটা অনেক—অনেক পুরানো, হয়ত য়ুক্রেনের মতই পুরানো।"

বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গাইতে শুরু করল:

এই দুনিয়ায় নাইরে, বিচার—নাই,
বিশ্ব জুড়ে অনাচারের খেলা;
বাঁচতে যদি চাও সেখানে,
এগিয়ে চলো সাহস ভরা বুকে—
করবে লড়াই—ভাঙবে তারি ভেলা॥

"কিন্তু এ গান আমি গাইতে পারব না! ভাটেরা তানপুরার সাহায্যে এ গান গাইতেন।"

"নাই বা পেলে এখানে তানপুরা, তবু গাও। ... তাতে বেশি করুণ হবে না। ..."

ভগবানের আশীর্বাদ আজ
তাদের মাথায় পড়ুক ঝরে
জীবন দিয়ে অগ্রপথিক যারা
ন্যায়ের দণ্ড উচ্চ করি ধরে।

"হে ভগবান, ন্যায়ের জন্যে যারা লড়াই করছে, তাদের তুমি আশীর্বাদ করো," চেচোরিখা চুপি চুপি বলল।

কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ অতীতের এই গান গাইল—পদদলিত জনগণের এই গান দুর্দিনের বিষণ্ণতায় অশ্রুসজল রাত্রির অন্ধকারে দাসত্বের আর অত্যাচারের দিনগুলিতে এর রচনা। এক বিস্মৃত সংগীত নিঃশব্দ হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে সেই দিনগুলিতে যখন স্বাধীন য়ুক্রেনের মাটীতে ফুটে উঠত সূর্যমুখী ফুলগুলি, আর নতুন জীবন রচনা করত নতুন গান।

কিন্তু এখন এই বদ্ধ গৃহের অন্ধকারে, এই গ্রামে যেখানে ফাঁসীকাঠে ষোল বছরের একটি ছেলের দেহ ঝুলছে, খানার ভিতরে মৃত দেহ আছে পড়ে, যেখানে বরফের তলা দিয়ে একটি স্ত্রীলোকের মৃত দেহ বয়ে নিয়ে গেছে জলস্রোত, যেখানকার প্রত্যেকটি ঘরে মৃত্যু বুনে চলেছে তার জাল, সেইখানে এই পুরানো গান ধ্বনিত হয়ে ওঠে আবার সেই পুরানো স্বরে, সেই শত শত বছর আগেকার দুঃখ দহনের সুরে।

ভগবানের আশীর্বাদ আজ
তাদের মাথায় পড়ুক ঝরে
জীবন দিয়ে অগ্রপথিক যারা
ন্যায়ের দণ্ড উচ্চ করি ধরে।

য়েভদোকিমের কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, ঝিমুতে শুরু করে, তাদের ক্লান্ত মাথাগুলি ক্রমশ নীচু হয়ে ঢুলতে থাকে।

৯

ফেডোসিয়া ক্রাবচুক ঘুম থেকে উঠে পড়ল, যেন কেউ তাকে নাড়া দিয়েছে। বিছানায় উঠে বসল। বুকটা দুর দুর করছে, যেন এখনি ফেটে পড়বে! গভীর মনোযোগের সঙ্গে হাঁ করে সে শুনতে লাগল।

কিসে তাকে জাগিয়ে তুলল? কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল? তার ধারণা ছিল, কোন দিনই সে ঘুমোতে পারবে না, তারপর হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর নিদ্রা থেকে কিসে যেন তাকে জাগিয়ে তুলেছে। সেটা কি?

কেউ দরজার কড়া নাড়ে নি—সর্বত্র একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এমন কি জার্মানটার নাক ডাকানিতেও রাত্রির নিস্তব্ধতা নষ্ট হয় নি। ভেনের অনেক রাত পর্যন্ত আপিসে ছিল, প্রায়ই সে এ রকম দেরী করে। এবং তখনও সে আসেনি। যাই হোক, কোন একটা কিছু তাকে জাগিয়েছে, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে তার, সেইজন্যেই বুক এত দুর দুর করছে।

আর সে শুল না, কান খাড়া করে বসে রইল। ঘরের ভিতরে আর বাইরে বিরাজ করছে অবিচ্ছিন্ন নিঃশব্দতা, সন্ধ্যার দিকে বাতাস পড়ে গেছে, বহুদিন পরে আবার এসেছে পরিচ্ছন্ন রাত্রি। রামধনুর জ্যোতির্গুলের মধ্যে চাঁদ শুরু করেছে তার আকাশযাত্রা। মেঝের উপরে এসে পড়েছে পরিষ্কার ভাবে জানালার ছায়া। জানালার তুষারধবল পটভূমিকায় গভীর কালো গাছের ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ জানালার বাইরে একটা শব্দ হল। একটা রুদ্ধ গোঙানি সেই সঙ্গে, একটা কর্কশ শব্দ হঠাৎ যেন শোনা গেল। তারপর গলার মধ্যে শব্দটা চেপে বন্ধ করা হল। ফেডোসিয়া বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল এবং খালি পায়ে বেরিয়ে এল। তার আঙুলগুলো কাঁপছে, চারিদিকে দরজা খুঁজতে

লাগল। তারপর দেখতে পেল, দরজা খোলা। নিশ্চয়ই ভের্নের এখনও ফিরে আসে নি। সে কখনও দরজা বন্ধ করতে ভোলে না।

দরজার হুড়কোটা সে খুলে ফেলল। কালো কালো ছায়াগুলো চারদিকে নড়ে বেড়াচ্ছে।

"কে?"

ফেডোসিয়া জিজ্ঞাসা করল না। কারণ, সে জানত ওখানে কারা দাঁড়িয়ে! ঘুম থেকে চমকে উঠেই সে জানতে পেরেছে। দুই হাতে সে স্পন্দিত বুক চেপে ধরল।

"আমি, এই বাড়ীরই লোক," চাপা গলায় সে উত্তর দিল: "চুপ, সে এখানে নেই! ..."

তারা এতক্ষণে দালানে ঢুকে পড়েছে। ফেডোসিয়া ছোট সৈনিকটিকে চিনতে পারল।

"সে এখনও ফেরে নি, নিশ্চয় সে এখনও আপিসেই আছে!"

"বেশ, তা হলে আমরা আর ঘরের ভিতর ঢুকব না। চলো, আমরা জার্মান কমাণ্ডান্টুরেই যাই!"

"থাম থাম!" ফেডোসিয়া বলে উঠল। "সে মেয়েটি কিন্তু এখানে আছে!"

"সে কে?" কমাণ্ডার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল।

"জার্মানটার রক্ষিতা।"

"ও, মেয়েমানুষের সম্বন্ধে আমাদের এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। কালকে ভেবে চিন্তে দেখা যাবে জার্মান মেয়েটাকে নিয়ে কি করা যাবে।"

"কিন্তু সে তো জার্মান নয়, সে আমাদেরই একজন।" ফেডোসিয়া বিকৃত কণ্ঠে জবাব দিল।

"তাই না কি? বেশ, তা হলে তো সে আলাদা ব্যাপার! সে কোথায়?

"ঘরে ঘুমোচ্ছে।"

কমাণ্ডারের মুখখানি বিকৃত হয়ে গেল।

"বেশ, চল, একবার তাকে দেখি! ... একটু আলো দেখাতে পার?"

"সান্ত্রীটা যে দেখতে পাবে।"

"সান্ত্রী-টান্ত্রী এখন আর কেউ নেই, মা।"

"বেশ, তা হলে আলো জালছি।"

কম্পিত হাতে সে দেশলাই খুঁজতে লাগল।

তারা এসেছে! শেষ পর্যন্ত এসেছে, এতদিন পরে!

ছোট সৈনিকটি তার হাতে একটি দেশলাইর বাক্স গুঁজে দিল।

ফেডোসিয়া আলো জ্বালালো এবং বাতিটা উস্কে দিল।

"আমাদের পাঁচজন জামিনদার হিসাবে কমাণ্ডাণ্টুরে বন্দী রয়েছে।..."

"কিছু ভাবতে হবে না, মা। সেখানে এখন আমাদের লোক আছে, তারা জামিনদারদের মুক্তি দেবে। আমরা চাইছিলাম বেশি গোলমাল না করে ওদের কমাণ্ডাণ্টকে গ্রেফ্তার করতে পারব, তার কোন উপায় নাই। আচ্ছা, আসি মা।"

"উপায় কি, সে আজ আসে নি। আমার মনে হচ্ছে, আজ ওদের খুব কাজের চাপ পড়েছে।"

পাছে কোন শব্দ হয়, এই জন্যে সে খুব সতর্কতার সঙ্গে দরজা খুলল। লাল পল্টনেরা ভারী বুটের শব্দ না করে আস্তে আস্তে পা ফেলে তাকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফেডোসিয়া আলোটা উঁচু করে ধরল যাতে বিছানায় আলো পড়ে।

পুসিয়া জেগে উঠল। কুর্ট ফিরে এসেছে ভেবে ঘুমজড়িত কণ্ঠে কি যেন বলল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। তখন সে মুখের চুলগুলো পিছনে সরিয়ে নিয়ে ঘুরে দেখল।

কমাণ্ডার তাড়াতাড়ি ফেডোসিয়ার হাত থেকে আলোটা কেড়ে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

"এ কে?" কামাণ্ডার বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

"জার্মান কমাণ্ডারের রক্ষিতা, আমাদেরই একজন, শহর থেকে এসেছে," ফেডোসিয়া বুঝিয়ে বলল।

যে লোকটি আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পুসিয়া তাকিয়ে রইল। তার নীল রঙের রাত্রিবাসখানি একটি কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। এক পাশের বুকের খানিকটা উন্মোচিত হয়ে গেছে। পা দুটো গুটিয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে আস্তে আস্তে বিছানার এক কোণে সরে যাচ্ছে, যেন সে নিজেকে ঢাকতে চায়, আড়াল করতে চায়, দেয়ালের কাটলে গিয়ে যেন লুকোতে চায়। কমাণ্ডার কাঁপতে লাগল। পুসিয়ার রক্তিম আঙুলের নখগুলি দীপালোকে ঝক্ ঝক করছে এবং তার ছুঁচোলো দাঁতগুলো সাদা কাগজের মত দুই ঠোঁটের ফাঁকে মুহূর্তের জন্যে ঝকমক করে উঠল।

"সে-রি-য়ো-শা-! ..."

এই চাপা কণ্ঠের ডাক পাতার মর্মরের চেয়েও মৃদু। তবুও সেরিয়োশা শুনতে পেল। যেন পুসিয়ার ঠোঁটে পড়ল তার নিজের নাম। সেও কাঁপতে লাগল। পুসিয়া যেন নিজেকে আড়াল করবার জন্যে তার ক্ষীণ-দুর্বল দুটি হাত তুলে ধরল। হাতের নখগুলো যেন রক্তে রঞ্জিত! চোখে তার বিভীষিকা। এক কোণে সরে যাওয়ায় বিছানাটাকে মস্ত বড় মনে হচ্ছিল, ও যেন একটা পুতুলের মত, ওর নগ্ন বক্ষ উঁকি মারছে নীল রেশমী পোশাকের আড়াল থেকে, ছোট দুটি পা ঢাকা পড়েছে রাত্রিবাসের মধ্যে।

বাইরে কোথায় যেন গুলির শব্দ হল।

"ও বোধ হয় কমাণ্ডান্টুরের কাছাকাছি," ফেডোসিয়া বলল।

সেই সময় আর একদিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। পরক্ষণেই আর একদিক থেকে, তারপর চারদিক থেকেই গুলির আওয়াজ আসতে লাগল।

সের্গাই তার রিভলভার উঁচু করে তুলে ধরল। তার অতি পরিচিত দুটি কালো চোখের দিকে নির্নিমিষে চেয়ে রইল। রিভলভার গর্জে উঠল। পুসিয়া একবার হাত-পা নেড়ে নিশ্চল হয়ে গেল। ওর ঠোঁটের ফাঁকে ছুঁচোলো দাঁতগুলো চকমক করে উঠল। ওর গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে রইল, সঙ্গে সঙ্গেই অনড় হয়ে গেল।

"কমাণ্ডান্টের দিকে চলো!" সের্গাই আদেশ করল, এবং চৌকাঠের উপর হোঁচট খেয়ে ও রান্নাঘরের বালতির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে তারা রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তাটা জ্যোৎস্নার আলোয় রূপার মত ঝকঝক করছে।

গ্রামের মধ্যে ভয়ানক লড়াই চলছে। তারা ঘর থেকে যে প্রথম গুলির শব্দটি পেয়েছে তা ছুঁড়েছে প্রাইভেট জাভিয়াস। শত্রুর কামানগুলোকে আয়ত্ত করবার জন্যে যে দলটি নিযুক্ত ছিল এই জাভিয়াস সেই দলের।

সের্গাই ও তার অনুচরেরা যখন জার্মান কমাণ্ডারকে নিদ্রিত অবস্থায় আয়ত্ত করবার জন্যে ফেডোসিয়ার কুটীরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল, তখন আর একটি দল কামানগুলি দখল করবার জন্যে বরফের উপর দিয়ে তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে টিলার দিকে উঠছিল। তারা সকলেই চলেছে সাদা পোশাকে অদৃশ্যভাবে, যেখানে ছায়া পেয়েছে সেখানেই আত্মগোপন করেছে, যত রকম আত্মগোপনের সুযোগ মেলা সম্ভব, সবই তারা অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত কামান-শ্রেণীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাদের আগে আগে চোখ পাকিয়ে চলেছে সার্জেণ্ট সেহ্র্যক। এমনি করে তারা শত্রুর কামান-শ্রেণীর কাছে অন্যের অলক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছল। বরফ ও আকাশের পটভূমিকায় কামানের কালো কালো চোঙাগুলি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আছে। ওদের মাথার উপর দিয়ে নীরবে ভয়াবহ কামানগুলি মুখ বাড়িয়ে আছে। তিনটি সৈনিক সে কামানগুলির পাশে বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। একজন সান্ত্রী ব্যাটারী লাইনের উপর পায়চারি করছে— একবার এগিয়ে যায়, একবার পিছিয়ে আসে, পায়ের তলায় বরফের মড় মড় শব্দ ওঠে।

সেহ্র্যক শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক খানাটার কাছে সান্ত্রীটা ফিরল, সার্জেণ্ট তার সরু পিঠটা দেখতে পেল, সঙীনটা মাথার উপরে ঝক ঝক করছে। নিঃশব্দে নালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জার্মান-টাকে আঘাত হানল। তারপর উভয়েই বরফের উপর গড়াগড়ি যেতে লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বী কোনরকম শব্দ করবার পূর্বেই সেহ্র্যক তার গলা টিপে ধরল। কিন্তু গোলন্দাজ তিনজন লক্ষ্য করল তাদের সাথীর আকস্মিক অন্তর্ধান।

"এই, হান্স!" তাদের একজন ভয়ে ভয়ে ডাকল। ঠিক সেই মুহূর্তে লাল পল্টনের একজন অসতর্কতার সঙ্গে একটা শুকনো ডালের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। ডালটার উপর পা পড়তে মড় মড় করে উঠল। আদেশের অপেক্ষা না করেই গোলন্দাজরা তাদের বন্দুক সেই দিকে তাক্ করল এবং তখনই জাভিয়াস বলে একজন লাল পল্টন মাথা ঠিক রাখতে না পেরে নিকটবর্তী একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। জার্মানটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, লাল পল্টনেরাও হতবাক হয়ে গেল—তারা কোথায় আছে জানবার আগেই দেখা গেল কামানগুলির কাছে একজন জার্মানও নেই অথচ কামানগুলি তাদেরই জিম্মায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিক থেকে—যে দিকে জার্মান সদর দফ্তর অবস্থিত, সেই দিক থেকে পূর্ব ব্যবস্থামত তোপ দাগা শুরু হয়ে গেছে।

"জোড়ে চালাও!" সেহ্যর্ক আদেশ করল, কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কতকগুলো কালো কালো ছায়া তাদের সামনে দেখা গেল।

জার্মানরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে, আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অল্প এবং খোলাখুলি ভাবেই তারা সগর্বে ছুটাছুটি করছে। জার্মানদের গুলির ঘায়ে সেহ্যর্ক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হঠাৎ তার ডান পায়ে বেদনা অনুভব করল।

"কি হল?"

"কিছুই না। তোমরা আর দাঁড়িয়ে থেকো না, গুলি চালাও!"

কে একজন দৌড়তে গিয়ে পড়ে গেল, কিন্তু তাতে আর সকলের চলা বন্ধ হল না। তাদের সকলেই টমি বন্দুকে সজ্জিত এবং অবিরাম গুলির শব্দ চলতে লাগল।

"মাটীতে শুয়ে পড়ে গুলি চালাও।"

লাল পল্টনেরা কামান-শ্রেণীর আড়ালে দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে জার্মানদের কালো কালো মূর্তিগুলি স্পষ্ট লক্ষ্য করে মনের আনন্দে গুলি ছুঁড়তে লাগল। সেহ্যর্ক এমনভাবে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল যাতে একটি টোটাও বাজে খরচ না হয়। হঠাৎ তার মনে হল যে, মুখখানা যেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

তার টমি বন্দুকের কুঁদোতে এই ঠাণ্ডা লাগছে। কপাল, নাক, জমে গেছে। গাল দুটি যেন অসাড়।

সেহ্য্যক আবার যখন বন্দুকে টোটা পুরছিল তখন একবার নীচের দিকে তাকাল, দেখতে পেল বরফের উপর একটি বড়গোছের কালো গর্ত রয়েছে!

"গুলি! গুলিবৃষ্টি!"

যে গর্তের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সেটা কি? তার হাঁটুর কাছে পাজামাটা ভিজে গেছে। অথচ এ রকম কুয়াশায় সেটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে, যেন কেউ জল ঢেলে সেটা ভিজিয়ে দিয়েছে।

জার্মানরা ময়দানের ও পাশে, রাস্তার দিকের খানায় শুয়ে অবিচলিত ভাবে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। সেহ্য্যক একটা বরফের স্তূপের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, কি হচ্ছে দেখবার জন্যে মাথাটা তুলল। খানা থেকে বন্দুকগুলির দিকে এবং বন্দুকগুলির দিক থেকে খানার দিকে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি কতক্ষণ যে চলবে কে জানে। সারা গাঁয়েই গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোথায় যে কি হচ্ছে কিছুই সে জানতে পারছে না। তার দলটি মাত্র পাঁচ জন নিয়ে, এই পাঁচ জনকে ওখানে নিয়ে গেলে কোন না কোন কাজে আসতে পারে।

"দেখি বন্ধুরা, এক জায়গায় এমনি ভাবে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। স্বদেশের জন্যে ও স্তালিনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়!"

তারা যুগপৎ একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে সমুখে সঙীন উঁচিয়ে ছুটল তারা শব্দায়মান মেশিনগান ও অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে। কয়েকটা দিক দিয়ে তারা দ্রুতগতিতে খানার কাছে গিয়ে পৌছল, লাফিয়ে পড়ল স্তম্ভিত জার্মানদের উপর। জার্মানরা তখনও বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা কি! তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে জার্মানদের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাস্তার ধারে খানাটা নিস্তব্ধ, জার্মানদের মৃতদেহগুলো বরফের উপর কালো কালো স্তূপের মত পড়ে আছে—অসহায় হতভাগার মত।

"এবার কোন্ দিকে?" রুদ্ধ নিশ্বাসে জাভিয়াস জিজ্ঞাসা করল।

"কমরেড সেহ্র্যক, তুমি কোথায় ?"

"কি হল ?" সেহ্র্যকের অন্তরঙ্গ বন্ধু টেকো আলেকসাই জিজ্ঞাসা করল।

"আমাদের সঙ্গে সে এসেছিল তো, না আসে নি ?"

"পাগল নাকি ? নিশ্চয়ই এসেছে !"

"তবে সে কোথায় ?"

"এই যে এখানে, শুয়ে আছে !" দলের সব চেয়ে কনিষ্ঠ সৈনিকটি চেঁচিয়ে উঠল। আলেকসাই ছুটে গেল সেই দিকে।

সেহ্র্যক পড়ে আছে খানা আর কামানগুলোর মাঝামাঝি জায়গায়, হাত দুটো ছড়িয়ে পড়েছে দুদিকে, এক হাতে শক্ত মুঠিতে তখনও তার বন্দুক ধরা।

"কি হয়েছে ?" রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ভানিয়া।

আলেকসাই বরফের উপর তাকাল।

সেহ্র্যক যেখানে পড়ে আছে সেখানে রক্তের একটা জমাট চাপ আর সেখান থেকে কামানগুলোর কাছ পর্যন্ত একটি রক্তের ধারা চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যায়।

"কোথায় লাগল ?"

আলেকসাই নিঃশব্দে দেখিয়ে দিল। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত উড়ে গেছে, তার চারপাশের বরফের উপর জমাট কালো রক্ত।

"গুলি লেগে পা-টা উড়ে গেছে, যেন ছুরি দিয়ে দু-টুকরো করে কাটা হয়েছে।"

"বোঝ তবে—এই পা নিয়েই সে ছুটেছিল !"

"এখন ভাববার সময় নেই। কমাণ্ডান্টুরের দিকে চল। মনে হচ্ছে, সেখানে দিব্যি জমেছে।"

তারা দ্রুত আলেকসাইর অনুসরণ করল। তুষার ঘিরে এসেছে চারদিকে, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

*

প্রথম গুলিটা যখন ছোঁড়া হয় তখন ক্যাপ্টেন ভের্নের কামাণ্ডান্টুরে তার নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। সদর থেকে ফোন পাবে—এই আশা ছিল, তাই বাসায় যেতে পারে নি। জামাকাপড় পরে লং-কোট গায়ে চাপিয়েই সে ঘুমোচ্ছিল। সার্জেণ্টও পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সৈনিকেরাও আর এক ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। টেলিফোনের আশায় ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে বসেছিল, কিন্তু ফোন এল না। পাশের ঘরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাঁই সাঁই শব্দে ওর রাগ ধরে গেল। সার্জেণ্টের নাক ডাকার শব্দও কম বিরক্তিকর নয়। তা ছাড়া, যে বিছানায় ও ঘুমোচ্ছিল তাও দস্তুর মত কঠিন, মোটেই আরামদায়ক নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠল গুলির শব্দে।

"কে হয় তো আবার রাত্রির বেলা বাড়ীর বার হয়েছে," রাগতভাবে ভের্নের কথাটা আপন মনেই ভাবল। জার্মানদের হুকুম অমান্য করার আরও একটি নতুন প্রমাণ পেয়ে ও ক্ষেপে উঠল।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় শব্দটিও শোনা গেল, তার পর তৃতীয়। ক্যাপ্টেন আর বিছানায় থাকতে পারল না, লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল।

"সশ, ওঠো শীগ্‌গির!"

সার্জেণ্ট ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই তার নিদ্রালু ভাবটা কেটে গেল। জানলার নীচেই কতকগুলি ভারী পদক্ষেপের শব্দ পাওয়া গেল, একদল জার্মান ঘরে ঢুকল।

"বলশেভিকরা গ্রামে ঢুকে পড়েছে!"

"সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দাও! বাতি নিবিয়ে দাও!" ভের্নের হুকুম করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার আদেশ প্রতিপালিত হল।

যে ঘরে টেলিফোন আছে সে ঘরখানিই সব চেয়ে বড় এবং আত্মরক্ষা করার পক্ষে সুবিধাজনক। ভের্নের অবশ্য এটা আশা করে নি যে, তাকে এখানে এমনি ভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে, তবে অবশ্য তা ঘটবার সম্ভাবনাকে মনে রেখে সকল রকম ব্যবস্থাই সে করে রেখেছে! পুরু কাঠের তক্তার উপর

লোহার পাত মোড়া দরজা, তার উপর অর্গলের ব্যবস্থাও পাকাপাকি। ঘরের দেয়াল মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী, জানলার কপাটগুলোও বেশ মজবুত। বাড়ী পুরানো, এবং দেখলেই মনে হয় গুদাম-ঘরের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। পাশের যে ঘরে সৈনিকেরা ঘুমিয়ে আছে, আর যে ঘরে জামিনদারদের আটক রাখা হয়েছে,—এ দুটি ঘর নতুন তৈরি। ইতিপূর্বে এটা ছিল গ্রাম্য সোভিয়েটের দফ্‌তর, গ্রামের ক্লাব ও লাইব্রেরী। সে সময় দেয়াল এত পুরু ও জানলা-দরজাও অত মজবুত ছিল না, সামান্য তালা-চাবিতেই কাজ চলে যেত।

কিন্তু এখন এই ঘরটা বলতে গেলে একটি দুর্গবিশেষ।

"ঘুলঘুলিগুলো খুলে দাও!"

তৎক্ষণাৎ তারা দেয়ালের পাশের কড়িকাঠটা সরিয়ে ফেলল, তখন ঘুলঘুলি-গুলো খুলে গেল। এই ছিদ্র-পথে ঘর থেকে বাইরে গুলি ছোঁড়া হয়। এই ছিদ্র-পথের পাশেই বালি-ভরতি থলে সাজানো আছে। মেঝেতে ট্রেঞ্চ কাটা রয়েছে। সৈনিকেরা সটান সেই ট্রেঞ্চে শুয়ে পড়ল। ঘরে এতক্ষণ বেশ গরম ছিল, কিন্তু যেই ছিদ্র-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে অমনি বাইরে থেকে সেই ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ বইতে লাগল। সৈনিকদের রাইফেল গর্জে উঠল।

"সদরে খবর দাও শীগগির, জলদি কর! ভাল কথা, ওরা কি গ্যেরিলা দলের?" ভের্নের একজন সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল। সে তখন হাঁপাতে হাঁপাতে মেশিন-গানে একটা বেল্ট পরাচ্ছিল।

"না, দস্তুর মত সৈনিক!"

"অনেক?"

"আমি ঠিক জানিনে। তারা চারদিক থেকেই গুলি ছুঁড়ছে—মনে হয় যেন চারদিক থেকেই তারা এসে গ্রাম আক্রমণ করেছে।"

ভের্নের গাল দিয়ে উঠল।

"সদরে ফোন কর।"

'হের ক্যাপ্টেন, টেলিফোন অকেজো হয়ে গেছে, জবাব পাচ্ছি নে।"

ভের্নের টেবিলের উপর একদিকে কাৎ হয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, কিন্তু যখন কোনই জবাব পেল না তখন নির্বাক বাক্সের উপর মারল ঘুষি। কিন্তু টেলিফোনটা মরে গেছে।

"হতভাগারা লাইন কেটে দিয়েছে!"

"রাগের মাথায় ঘুষি মেরে অকেজো বাক্সটাকে ছুঁড়ে দিল, সশব্দে সেটা মেঝের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি মেরে ঘরের আর এক কোণে নিয়ে ফেলল।

"আমরাই যা পারি, করি! তৈরী হয়ে নাও।"

রাস্তায় গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, গুলি এসে পুরু দেওয়ালের গায়ে সশব্দে বিদ্ধ হচ্ছে। কাছাকাছি যে ঘর আছে তার বন্ধ দরজায় রাইফেলের কুঁদোর সাহায্যে সশব্দে আঘাত করছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, দরজা খোলা সম্ভব হল না।

"ভাল করে বন্ধ করে দাও," ক্যাপ্টেন বিড়বিড় করে বলল। দরজার দৃঢ়তায় তার আস্থা ছিল।

*

যে দলটি কমাণ্ডণ্টুর আক্রমণ করেছে তার দলপতির নাম লেফ্‌টেনেণ্ট শালভ। তার দলের লোকেরাই প্রথম দরজাটা ভেঙ্গে ফেলল এবং যখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তখন যারা কামানগুলি অধিকার করতে গিয়েছিল তারা এসে পড়ল।

"সেত্যুর্ক কোথায়?"

"সে মারা গেছে। কামানগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

প্রথম ঘরে তারা দেখতে পেল সৈন্যদের শোয়ার খাট কতকগুলি, চারিদিকে জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে পড়ে আছে, কিন্তু একটিও জীবিত মূর্তির দেখা নেই।

"মনে হচ্ছে, ইন্দুরগুলো জেগে উঠে ওই ঘরে ছুটে গেছে।"

"ওখান থেকে ধোঁয়া দিয়ে বের করব আমরা।"

"সবাই বাইরে এসো। বাইরে থেকে সবাই আক্রমণ করব!"

বাড়ীটার চারদিকে তারা ছড়িয়ে পড়ল, অবিলম্বেই তারা বুঝতে পারল, ঘরটা দুর্গবিশেষ, মোটা মোটা গাছের গুঁড়িগুলো বন্দুকের গুলির পক্ষে দুর্ভেদ্য! গুলির ছর্‌রা গিয়ে আঘাত হানল বটে, কিন্তু দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে রইল—একটুও চিড় খেলো না। মেশিন গানের সুতীব্র গর্জন, নীল আর লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুচ্ছে দেওয়ালের ছিদ্রপথ দিয়ে। ঘরটা যেন মৃত্যুকে উপেক্ষা করছে।

"এরা হরদম গুলি ছুঁড়ছে," শালভ চাপা কণ্ঠে বলল।

"বোধ হচ্ছে, ওরা যেন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত।"

সারা গ্রামে গুলির শব্দ হচ্ছিল। বিভিন্ন দল বিভিন্ন জায়গায় জার্মানদের ঘিরে ফেলেছে। তার মধ্যে দুর্গরূপে সুরক্ষিত ওই ঘরটার গর্জন আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

"বন্ধুগণ, ওটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে। ভোরের আগেই ওদের শেষ করতে হবে। আর বেশিক্ষণ আমরা এখানে হাঙ্গামা পোহাতে পারি নে। সকালের দিকে ওদের কোন দল এসে পড়তে পারে, তা হলেই সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।..."

মাটীর উপরে উঁচু জায়গার আড়ালে, খানার ভিতরে গিয়ে তারা শুয়ে পড়ল যাতে দেয়ালের ওপাশে ছিদ্র-পথ দিয়ে উঁকি-মারা জার্মান অটোমেটিক বন্দুক-গুলোকে সুবিধামত তাক করতে পারে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও জার্মানদের গুলিবর্ষণ থামল না!

লেভন্যুকের ঘরে যে সকল জার্মান ছিল তারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল। লাল পল্টনেরা ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে ফেলল। জার্মান সৈনিকেরা আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে এবং বিছানার ধারে রাখা বন্দুকগুলি ধরল ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, আর উল্টে পড়ল ঘরের অবিন্যস্ত জিনিস-পত্রের উপর।

"মেঝেতে শুয়ে পড়" ভীতার্ত লেভন্যুচিখাকে মিঙ্কেঙ্কো চেঁচিয়ে বলল।

তাই শুনে সে শুয়ে পড়ল, আর কোলের কচি ছেলেটাকে খাটের তলায় ঠেলে দিল। ঘরের গোলমাল না থামার আগে সে বুঝতেই পারছিল না, কি ঘটে যাচ্ছে। লাল পল্টনেরা ছুটে বেরিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মত, আর মেঝেতে পড়ে রইল জাঙিয়া-পরা জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহগুলি।

"ভাস্থ্যংকা, আয় তো বাবা, আমাকে একটু সাহায্য কর। এই নোংরা-গুলোকে ঘর থেকে বাইরে ফেলে দিই।" ছেলেকে ডেকে বলল। তখনও কাঁপছে সে। তারা দুজনে মৃতদেহগুলোকে টানতে লাগল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে জার্মানগুলোর পা ধরে টানতে লাগল। ভাসিয়ার মাত্র বার বছর বয়স আর সে নিজে আসন্নপ্রসবা।

"আস্তে আস্তে। অত তাড়া কিসের?" মা ছেলেকে ধমক দিয়ে উঠল।

কিন্তু ভাসিয়ার তাড়া করার কারণ আছে। লাল পল্টনের দল চলে গেল, একবারও সেই উপলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল না, তারপর, এখন আবার মা তাকে এই বাজে কাজে আটকে রাখতে চায়। গ্রামে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে, চেঁচামিচি শোনা যাছে। আর ওকে কি-না বাইরে বেরিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে নিজের চোখে না দেখে মৃত জার্মানদের পা ধরে টেনে গিয়ে বাইরে ফেলতে হচ্ছে। চাই কি, তারা হয় তো ওর হাতে একটা বন্দুকও তুলে দিত! কে জানে, হয় তো তারা দিত।

যে নিস্তব্ধতার মধ্যে গ্রামখানি আক্রান্ত হয়েছে এখন আর তা নেই। এখন আর কেউ লুকিয়ে উঁকি মেরে বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে না, পাছে তাদের ছায়া পড়তে দেখে তাদের গুলি করে।

"ভুলে যেয়ো না, একটি লোকও যেন পালাতে না পারে, জ্যান্ত একটি লোককেও পালাতে দেওয়া হবে না!" গ্রামে ঢুকবার সময় তারা যখন ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়, সে সময় লেফটেনেণ্ট তাদের বলে দিয়েছে।

এবং তারা এটা বুঝেছে যে, এরই উপর সাফল্য নির্ভর করছে।

জার্মানরা এক এক জায়গায় এক এক রকম নীতি মেনে চলে। কোথাও তারা ঘরে থেকেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, আবার কোথাও বা যে যে-রকম

অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায়ই ভয়ার্ত হয়ে আঙ্গিনায় বেরিয়ে আসে, কিন্তু তাদের রাইফেল ও টোটা নিয়ে আসতে ভুল করে না। অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কুয়াশার মধ্য দিয়ে তারা আত্মরক্ষার জন্যে ছোটে বা আড়াল থেকে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে থাকে।

"রাস্তা থেকে সরে যাও, আমাদের চলাফেরায় বাধা দিও না!" মেয়েদের লক্ষ্য করে সের্গাই চেঁচিয়ে উঠল। মেয়েরা দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, মনে হল যেন তারা সব মাটী ফুঁড়ে বেরুল।

"দেখ বাছারা, আমার বাড়ীতে ছ'টা জার্মান থাকে, ছ'টা। শীগগির এসো!" পেলচারিখা একজন লাল পল্টনের জামার হাতা ধরে টানতে লাগল।

"তোমার ঘর কোথায়?"

"তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমি দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। খুব কাছে, এক মিনিটও লাগবে না," সে অনুনয় করতে লাগল, ও যেন বাড়ী ভাড়া দেবে, তাই যেন বাড়ীর প্রশংসা করছে।

এক দল লাল পল্টন তার অনুসরণ করল। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখতে পেল যে, ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়। জার্মানরা ঘর থেকেই ভীষণভাবে গুলি ছুঁড়ছে, যেন তারা ক্ষেপে গেছে। এ বাড়ীতে মেশিনগান চালাবার জন্যে দেয়ালে ফুঁটো করা হয়েছে। মৃত্যু যেন বিরাজ করছে এই ঘরে।

লাল পল্টনদের পাশে পেল্‌চারিখা মাটীতে শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তার পাশের সৈনিকটি বুকে হাত চেপে একটা আর্ত চীৎকারে মাটিতে পড়ে গেল।

"এতে কোন ফল হবে না, বাছারা!" সে চেঁচিয়ে উঠল। "তারা এতে একের পর এক তোমাদের খুন করবে, অথচ তারা বেশ নির্ভয়েই ঘরের মধ্যে বসে আছে। আমি বলি কি, ঘরটায় আগুন ধরিয়ে দাও!"

"এ তোমার বাড়ী?"

"আর কার হতে পারে মনে কর? দাও—দাও, ঘরটায় আগুন ধরিয়ে দাও!"

"ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই তো ?"

পেলচারিথা সবলে হাত মুঠো করল।

"আমার শিশুপুত্র।... বড়রা কোন মতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সে ... দোলনায় রয়েছে।"

"তা হলে কেমন করে আমরা ঘরে আগুন দিই ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?"

সে লাল পল্টনের লোকটির হাত চেপে ধরল।

"শোন, বাবা, আমি কি করতে যাচ্ছি তা আমার অজানা নেই। ... আমার শিশুপুত্রের জন্যে তোমরা কেন একে একে জীবন হারাবে ? ... আমি মা, আমিই বলছি—ঘরে আগুন লাগিয়ে দাও !"

"তুমি পাগল, আস্ত পাগল !"

"ঘরে আগুন দাও ! আমার মনে কোন দ্বিধা নেই, তোমরা কেন সঙ্কোচ করছ। চাই কি, আমরা হয় তো তাকে বাঁচাতেও পারব। ... বুঝতে পারছ !"

আর একজন লাল পল্টনের লোক তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে হাত বেঁধে ফেলল, রুমালের বাঁধন ছাপিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

পল্টনের লোকেরা পেলচারিথার কথা-মত ঘরে আগুন দিতে সম্মত হল না। ও কিন্তু একজনের জামা ধরে ঝুলতে ঝুলতে তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

"তুমি বরং এখান থেকে চলে যাও, দেখছ না ওরা কেমন দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। ওরা তোমাকে খুন করবে।"

"আমার মত একটা বুড়ীকে কে গুলি করে মারবে ? ..."

দেয়ালের ফুটো দিয়ে যে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল।

"দেখছ, আমাদের সোজা গুলি চালাতে হবে। তা হলে সব কিছু ঠিক হবে !"

"শোন বাছারা, চালের উপর দিয়ে ভিতরে ঢোকার একটা ব্যবস্থা আছে, ওপাশ দিয়ে সোজা উপরে যাওয়া যায়। কেমন, রাজী আছ ?"

"এখনই বা কি মন্দটা আছি! যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করছি, ততক্ষণ কেবল ঘর-পোড়ানোর কথাই বলছ। কেমন করে আমরা ওখানে পৌছব? বেশ, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল!"

তাদের কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে গুলি ছুঁড়তে লাগল। আর একদল পেল্চারিখাকে অনুসরণ করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"গুলি ছুড় না!" পেলচারিখা ঘরের দরজা খুলে দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল। "গুলি করো না!"

লাল পল্টনের লোকেরা গিয়ে ঢুকল। জার্মানরা সকলেই ঘরের ভিতরে। একজন তার মেশিন গানের পাশে মুখ নীচু করে আছে, আর সকলে বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে মরে আছে।

"সেরিয়োশা, দেখ, দেখ, লোকটার কপালে কেমন চৌকো একটা আঘাত লেগেছে! ..."

জার্মানটাকে সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলা হল।

এদিকে পেলচারিখা তখন দোলনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেছে।

"তারা ওকে খুন করেছে," পেলচারিখা নিস্তেজ, মৃত্যুম্লান কণ্ঠে বলল, "তারা ওকে মেরে ফেলেছে!"

সৈনিকেরা চারদিক তাকাতে লাগল। মা তার শিশু পুত্রকে কোলে তুলে নিল, শিশুর মাথার খুলিটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। দোলনাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

"ও হয় তো কাঁদছিল, তাই তারা ওর মাথায় আঘাত করে গুঁড়ো করে ফেলেছে।..."

পেলচারিখা মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দোলা দিতে লাগল।

"দেখ। ... তবু তোমরা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে রাজী হওনি। ... মৃত শিশুর জন্যে তোমাদের মায়া হয়েছিল। ... এর জন্যে তোমরা দু জনে আহত হলে। ..."

"চুপ কর মা, চুপ কর। ..."

"না, বাবা, আমি কাঁদছি না। আমাকে একটা বন্দুক দিতে পার না, একটা বন্দুক? ..."

ক্রমে গুলির শব্দ বিরল হয়ে আসতে লাগল। তখনও কমাণ্ডান্টের ওখানে লড়াই চলছে। আকাশটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। চাঁদের শোভা ও রামধনুর স্তম্ভগুলি দেখতে দেখতে মিলিয়ে এসেছে। বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ হয়ে অসীম নীল আকাশে মিশে গেছে। সারা পৃথিবীকে দেখে যেন মনে হয়, তুষারাচ্ছন্ন একটি স্বচ্ছ কাঁচের গোলক। মাথার উপরে ওই নীল আকাশ আর পায়ের নীচে এই রজতশুভ্র পৃথিবী, মাঝখান দিয়ে অবিরাম গুলি বর্ষণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভেসে চলেছে।

"বাছারা, এ পথ দিয়ে আমরা কোনখানে পৌছতে পারব না। ... ওই জানলায় বরং আমাদের দুটো হাত-বোমা মারা উচিত, জানলার শার্শিগুলো বোধ হয় খুব শক্ত নয়।"

"কিন্তু জানালার কাছে কেমন করে গিয়ে পৌছব? তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি চালাচ্ছে।..."

দেয়ালের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ক্রমাগত গুলির স্রোত বয়ে আসছে। আর সে অসংখ্য গুলির আঘাতে শত শত জায়গায় বরফের স্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

"পূব দিক ফরসা হয়ে এসেছে।" শালভ অস্বস্তির সঙ্গে আকাশের দিকে চেয়ে বলল।

দূর দিগন্তে গোলাপী আভা ফুঠে উঠেছে। ওরা যতক্ষণ আশা করেছিল, যুদ্ধ তার চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে চলতে লাগল। অপ্রত্যাশিতভাবে ভোরবেলায় জার্মানদের কোন একদল এসে রাস্তায় উপস্থিত হতে পারে। হয়তো এদের সাহায্য করবার জন্যেই পাঠাতে পারে। রাত্রির অন্ধকারে যে লড়াই শুরু হয়েছে, তা হয়তো কেউ লক্ষ্য নাও করতে পারে। তার উপর, জার্মানরা দিনের বেলায় রাত্রির অজানা ভয়টাকে হারিয়ে ফেলে, তখন তারা যে-কোন জায়গায়

চলাফেরা করতে অনেকটা স্বাধীন; এবং তখন আক্রমণকারীদের সংখ্যাল্পতা তারা ধরে ফেলবে। গ্রামে যে জার্মান বাহিনী আছে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেই দেখা যাবে যে, টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন অবস্থাটা দাঁড়াবে—আগুনে ঘি ঢালা।

"ও হে ছোকরার দল, এখন আমরা কি করতে পারি?"

"যতক্ষণ না একটি অন্তত হাত-বোমা ছুঁড়ব, ততক্ষণ তাড়াহুড়ো করেও বিশেষ কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।"

"বেশ, তা হলে," সের্গাই হঠাৎ বলে উঠল, "চেষ্টা করতে দোষ কি?"

"এখানে কেমন করে চেষ্টা করব?"

"ভয় নেই, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।…"

সের্গাই গোটা বাড়ীটা দূর থেকে একবার ঘুরে দেখল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের পিছনে গেল—এখানে একটিও ঘুলঘুলি নেই। লাল পল্টনেরা এই মনে করে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল যে, পাছে তারা ওকে লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়ে।

"ও মনে মনে কি ভাবছে?" শালভ উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু সের্গাই তখনও আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

উষার আলো-আঁধারে কালো ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে একটা রাইফেলের চোঙা দেখতে পেল, রাইফেলটা শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর অনবরত গুলি ছুঁড়ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর বীজ বোনা চলেছে সমানে।

হঠাৎ দেখা গেল, সের্গাই উঠে দাঁড়াল। কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝবার আগেই দেখা গেল সের্গাই সেই মৃত্যুর ছিদ্র-পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা ভীষণ দোল দিয়ে ছিদ্র-পথের মুখে একটি হাত-বোমা ছুঁড়ে মারল। একটা বজ্র নিনাদে সব কিছুই ঝন্ ঝন্ করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার বেড়াজালে ঢাকা পড়ে গেল। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা সবেগে ধেয়ে এল। ছিদ্র-পথের মুখে যে লোকটি ছিল, মনে হল সে যেন শূন্যে ঝুলছে এবং নীচে পড়তে তার অনেক সময় লাগল, লম্বা দেহটা আগুনের পট-ভূমিকায় সুস্পষ্ট রেখায় দেখা গেল। তারপর সে যেন সঙ্কুচিত হয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"এগিয়ে চলো!" শালভ হুকুম দিল।

তারা জানলার দিকে ছুটে গেল। ঘুলঘুলির সামনেকার মেশিন গানটি তখন নীরব, নিস্তব্ধ, তার গায়ে রক্ত ছড়িয়ে আছে। মেশিন গানের চালকেরাও চুপচাপ রয়েছে। হাত-বোমা তার কাজ করেছে।

"তোমরা আমার সঙ্গে এস!"

লাল পল্টনেরা তখন বাড়ীটাকে গুলির শরশয্যায় শুইয়ে দিয়েছে, ছিদ্র-পথে দৃষ্টি মেলে দেখা গেল হাত-বোমায় সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের হাত শার্শির ভাঙা কাচে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। মোটা কড়িকাঠগুলো থেকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে।

"ও ঘরে আমাদের লোকেরা আছে, জামিনদারেরা আছে!" মাল্যুচিখা করুণ আর্তনাদে চেঁচাতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ই জামিনদারদের কথা লাল পল্টনদের মনে পড়ল। তারা তখনও সেই অন্ধকার ঘরে রয়েছে। সকলেই কান খাড়া করে কি হচ্ছে না হচ্ছে শুনবার চেষ্টা করছে। প্রথম গুলিটা যখন ছোঁড়া হয় তখনও তারা ঘুমোয় নি। তারা প্রত্যেকেই যেমন নিজের নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই তারাও শব্দটা শুনতে পেল। মুহূর্ত কাল তারা প্রতীক্ষা করল। প্রথম গুলিটার পরেই দ্বিতীয়টা শোনা গেল। না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সান্ত্রীর আকস্মিক গুলি ছোঁড়া নয়।

"আমাদের লোক!" চেচোরিখা উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

"আমাদের লোক," অলগা চুপি চুপি বলল।

একমাত্র মালাশাই তার আসন থেকে এতটুকুও নড়ল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করে অন্ধকারের দিকে সজল চোখে চেয়ে রইল।

"গীর্জার কাছে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে," য়েভদোকিম মন্তব্য করল।

"জার্মান কামান থেকেই ..."

দেয়ালের ঠিক পাশেই একটা গুলির আওয়াজ হল। অলগা উৎকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

"এই, চুপ! তারা এখানে, এখানে এসে পড়ছে। ..."

ওরা যেন ফাঁদে পড়েছে এমনি ভাবে বসে রইল। চারদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু দেয়ালের ও পাশেই গুলি চলেছে, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, লড়াই চলেছে, আর তারাই কিছু দেখতে পেলে না, জানতেও পেলে না।

"আমাদের লোকজনেরা আসবার আগেই জার্মানরা শেষ করে দেবে," গ্রোখাচ মনে মনে ভাবল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না, কেন না তাতে মেয়েরা ভয় পেয়ে যাবে। দরজার বাইরে কি হচ্ছে, উদ্বেগের সঙ্গে সে সব শুনতে লাগল। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই সে শুনতে পেলে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি এসে পড়ছে দরজার উপর, পাশের ঘরে বহুলোকের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। গ্রোখাচও দরজায় ঘুষি মারতে লাগল।

"আমাদের বেরোতে দাও, আমাদের বেরোতে দাও!"

দেয়ালের অপর পার্শ্বে হৈ চৈ চলেছে, বহুলোকের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার চীৎকার কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

"এসো ত মেয়েরা, আমাকে সাহায্য কর, নইলে এরা শুনতে পাবে না। আরও কতক্ষণ আমরা এখানে পড়ে থাকব!"

দেয়াল ভাঙবার জন্যে অলগা সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন করল। চেচোখিখাও তার অনুসরণ করল।

"শুনছ তোমরা, আমাদের বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও, শুনছ!"

বাইরে তখনও হৈ চৈ, গুলি ছোঁড়া, চেঁচামিচি চলতে লাগল। বন্দীদের হতাশার্ত আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না।

"জোরে, আরো জোরে! তাদের শোনাতে হলে আমাদের সমানে চীৎকার চালিয়ে যেতে হবে। ..."

"গ্রামের কেউ না কেউ তাদের বলবেই। তারা কি আমাদের ভুলে গেছে?"

আবার তারা দরজায় করাঘাত করতে লাগল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা বাইরে বহু লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। বোঝা গেল, লাল পল্টনেরা বাড়ীটা থেকে চলে গেল। মুহূর্তখানেক সেখানে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল।

বন্দীরা ভাবল তাদের সামনেই যেন একটা বিরাট গহ্বর খোলা হয়েছে, তাদের আর মুক্তির কোন আশাই নেই।

"এ সব কি হচ্ছে?" য়েভদোকিম কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। "আমাদের লোকেরা কি হটে যাচ্ছে?"

"ওঃ!" অলগা বিলাপ করে উঠল।

"চুপ, বোকা কোথাকার! আর তুমি, বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ, এখনও বোকামি গেল না! তারা আর এক দিক থেকে চেষ্টা করবে, শুনতে পাচ্ছ না?"

প্রত্যেকেই চুপ করে রইল।

আর এক দিক থেকে গুলির আওয়াজ, হৈ চৈ ক্রমেই বেড়ে উঠল।

"তারা সদর রাস্তা দিয়ে বাড়ীটায় ঢুকতে চায়। ..."

"মেশিন গান কাদের? ..."

"জার্মানদের। ... ওটা আমাদের, শুনতে পাচ্ছ না?"

তারা সকলে জড়াজড়ি হয়ে শুনতে লাগল। একমাত্র মালাশা নিস্পন্দ-ভাবে বসে রইল; বাইরে যা-কিছু হচ্ছে, ওর যেন তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

"হায় ভগবান, হায় দয়াময়," য়েভদোকিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

গ্রোখাচ তার দিকে তাকাল।

"তুমি কি এখন প্রার্থনা আরম্ভ করবে নাকি?"

"প্রার্থনা করতে যদি চায় তো নিশ্চয়ই করবে," চেচোরিখা বৃদ্ধকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল। "তাতে কোন ক্ষতি হবে না; হবে বলতে পার?"

য়েভদোকিম দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেল এবং কম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা করে—

"... অনাহার, ভূমিকম্প, মহামারী ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা কর, প্রভু! ..."

গ্রোখাচ তার কাঁধ ঝাঁকাল। বাইরে তখনও গুলি ছোঁড়া চলছে। হঠাৎ একটা ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ হল। গোটা বাড়ীটা কেঁপে উঠল, যেন এখনই ধূলিসাৎ হবে।

"ওঃ!" অলগা তীব্রভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

ওরা বাইরের সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সেখানে গোলযোগ হৈ চৈ যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে। খুব কাছে কোথায় যেন নারীর আর্ত চীৎকার শোনা গেল। ঠিক সেই সময়েই আবার দরজায় বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি শুরু হল।

"দরজা থেকে সরে এসো! পিছনে সরে যাও!" গ্রোখাচ আদেশ করল।

প্রত্যেকেই সরে এল। সশব্দে দরজাটা ভেঙে পড়ল।

মনে হল, অন্ধকারের ভিতর উজ্জ্বল দিনের আলো এসে পড়ল। পাশের ঘরে উষার ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল—তার মধ্যে লাল অগ্নি শিখা যেন তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। মাল্যুচিখাই সব প্রথম হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল।

"আমাদের লোকেরা এসেছে! আমাদের লোকেরা এসেছে! তোমরা সব বাইরে বেরিয়ে এসো!" সে যুগপৎ চেঁচাতে, কাঁদতে ও হাসতে শুরু করে চেচোরিখাকে জড়িয়ে ধরল। "তোমার ছেলেরা আমার বাড়ীতে আছে, ভালই আছে তারা।... আমাদের সৈন্যেরা গ্রামে এসে পড়েছে।··· তারা গ্রামে এসে পড়েছে!"

"তুমি অত চেঁচাও কেন?" গ্রোখাচ সপ্তম স্বরে বলে উঠল। "চল, বাইরে যাই!"

হঠাৎ মালাশা উঠে পড়ে একটা শব্দও না করে ঘর থেকে বাইরে ছুটে গেল।

দরজার চৌকাঠে বসে একজন তরুণ লাল পল্টন তার পা ব্যাণ্ডেজ করছিল। তার সামনে একটা জার্মান রাইফেল পড়ে ছিল, নির্ভয়ে সেটা তুলে নিল।

"এই, কি হচ্ছে!" সে বলে উঠল, মালাশার হাত থেকে সেটা নেওয়ার জন্যে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেই দুটি কালো চোখে বীভৎস অর্ধ-উন্মাদ লক্ষণ দেখতে পেয়ে সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে সরে এল।

"উঃ, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।···"

"ওটা ওকে নিতে দাও," গ্রোখাচ বলল।

"এখানে জার্মানদের প্রচুর রাইফেল ছিল নাকি ?"

বাড়ীর পিছন দিক থেকে চীৎকার উঠল :

"পালিয়েছে ! জার্মানটা পালিয়েছে !"

*

ধোঁয়ায় ক্যাপ্টেন ভের্নেরের দম আটকে আসছে। ঘরখানা একেবারে যেন গালামোহর করে রেখেছিল, বাইরের আলো-বাতাস এক ফোঁটাও ভিতরে আসতে পারছে না। ঘরে গভীর অন্ধকার, তার উপর ক্রমাগত গুলি চলেছে। ধোঁয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, জালায় চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছে। রাইফেলের চোঙ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন আহত সৈনিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কাতরাচ্ছে। ভের্নের পাশ ফিরে আহত সৈনিকটিকে গুলি করতে চায়, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তার অটোমেটিক রাইফেল ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। মেঝেময় আহত সৈনিকেরা গড়াগড়ি যাচ্ছে। ভের্নের বুঝতে পারছে যে, জীবন্ত অবস্থায় তাকে এখান থেকে বেরোতে হবে না। তারা ওকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। যে সময়ে আক্রমণ করা নানা কারণেই অসম্ভব ছিল, ঠিক সেই সময়েই অপ্রত্যাশিতভাবে সে আক্রান্ত হয়েছে। ওদিকে সদর দফ্তর সেখানে বসে কেবল খাদ্যশস্য, চর্বি ইত্যাদিই দাবী করে চলেছে—অথচ গ্রামে আসবার রাস্তাটার নিরাপত্তার কথা তাদের মগজে আসে নি। গ্যেরিলাদের নামোল্লেখেই ভয়ে তারা থর থর করে কাঁপতে থাকে, গ্যেরিলাদের সম্বন্ধে আলোচনা কখনও থামায় না, কিন্তু তাদের চার পাশে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। বলশেভিকরা কোথায়, সে খবরও তারা রাখে না।

ভের্নের এটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। খবরানুযায়ী জানা যায় যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে আছে। অথচ সহসা জার্মান কমাণ্ডাণ্ট আক্রান্ত হয়েছে ! এ আক্রমণ গ্যেরিলারা করে নি। তারা আক্রমণ করতে অবশ্য সব সময়েই পারে, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আক্রমণ করেছে দস্তুর মত লাল পল্টন। এখন তারা বেশ ভাল করেই খাদ্যশস্যের যোগান পাবে !

আহত লোকটির কাতরানি ক্রমেই অসহ্য হয়ে পড়ছিল; তার পেটে গুলি লেগেছে। জাহান্নমে যাক! এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না, ভের্নের নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। চীৎকার ও হৈ-হল্লায় তার কানে তালা লেগেছে। মনে হয়, মাথাটা যেন এখনই ফেটে চুরমার হবে। কতক্ষণ আর তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে? টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কাউকে কোন খবর দেওয়ার উপায়ও আর নেই। গ্রামে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল, কমাণ্ডান্টুরের সামনেকার ময়দানে গোলমাল যেন বেড়ে উঠছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তার দলের একটি লোকও আর জীবিত নেই। একমাত্র কমাণ্ডন্টুর থেকেই যা-কিছু বাধা এখনও দেওয়া হচ্ছে।

পর মূহূর্তেই সহসা ভের্নেরের পায়ের তলাকার মেঝেটা যেন ফুলে ফেঁপে উঠল এবং ঘরের ধূমায়িত বাতাস কেঁপে উঠল একটা কানে তালা লাগা বিস্ফোরণে। বিস্ফোরণের ধমকে সে দেয়ালে গিয়ে ঠোক্কর খেল। কানে এসে লাগে বাইরের চীৎকার, জানলার শার্শিগুলো চুরমার হয়ে গেছে। মনে হল, একগোছা হাত-বোমা কে যেন জানলার দিকে ছুঁড়ে দিল। অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বা লক লক করে উঠল। সহসা ভের্নের কাঁধের উপব একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল। মেঝের উপরে বিচ্ছিন্ন মাংস, হাত, পা ছড়াছড়ি যেতে লাগল। না, আর এখানে থাকা কোন মতেই সমীচীন নয়। বিদ্যুৎগতিতে সে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে অনেকটা শান্ত ভাব বিরাজ করছে। ছোট ভাঁড়ার-ঘরটিতে মাত্র একটি ঘুলঘুলি আছে, সেখান থেকে মেশিন গ্মানের গোলন্দাজ অবিরত ঘোড়া টিপে চলেছে রাত্রির শূন্য অন্ধকার লক্ষ্য করে। তার প্রত্যুত্তর কেউ দিচ্ছে না। বস্তুত, সে দিক থেকে তারা সকলেই চলে গেছে। ভের্নের হুড়কোটা টেনে খুলে ফেলল; ঝন্ ঝন্ করে শার্শিটা খুলে গেল। একটি সবল ঘুষিতে ভেঙে গেল জানলার খড়খড়িগুলো। তারপর বাইরে তুষারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল—একবার দেখল না, সেখানে কেউ আছে কি না! জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা হয়তো সেখানেও দাউ দাউ করে জ্বলছে। হিমেল হাওয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে এল এবং প্রথম প্রভাতের ঝলমলায়িত তুষার ও আকাশ তার চোখ ধাঁধিয়ে

দিল। পিছনে সে শুনতে পেল চীৎকার ও পায়ের শব্দ। ইতিমধ্যে লাল পল্টনেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই। সে একটা দৈত্যের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রথমে যে আশ্রয়টি দেখতে পেল সেই দিকেই এগিয়ে গেল—সেটা মাল্যুকদের চালা।

কিন্তু সহসা তার পথের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল মালাশা, যেন সে সেই মাটী থেকে ফুঁড়ে বেরুল। নলির দিকে বন্দুকটা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ভের্নেরের উপর। ভের্নের দেখতে পেল তার কালো মুখটা আর জ্বলন্ত দুটো চোখ—একেবারের কাছাকাছি। বড় বড় কালো দুটি চোখ। তার মুখের চারিদিকে এলোমেলো চুল, ভয় লাগে, উত্তেজনা আনে। হাত দুটির প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে মালাশা বন্দুকটাকে ঘুরিয়ে তুলল মাথার উপর। ভের্নের রিভলভার তাক করল। তারপর গুলির শব্দ হল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার উপরে প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়ল রাইফেলের কুঁদো। একটা অস্ফুট চীৎকার করে ভের্নের মাটীতে পড়ে গেল। নাকটা ভেঙে গেছে, কপালটা থেতো হয়ে গেছে। রক্তের প্রবাহে তার মুখখানা ভরে গেল। দম বন্ধ হয়ে এল সেই রক্তে। উৎসারিত রক্তস্রোতে চোখ ভরে গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হল, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল ভের্নেরের।

তার কাছ থেকে দু পা দূরে মালাশা পড়ে আছে। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাড় ভাঙার শব্দও শুনতে পেলো। গুলিটা তার দেহে এসে বিদ্ধ হয়েছে, যেন পরম সৌভাগ্য! তার পেটেই এসে বিদ্ধ হয়েছে, ঠিক যেখানটায় হওয়া উচিত সেখানটাতেই। এতে তার আঘাত লাগেনি মোটেই। না, কোন যন্ত্রণা নেই, সে একটা আনন্দ। তার ঠোঁটে একটা পরম প্রশান্তির হাসি। গত এক মাস ধরে বার্ধক্যের যে জীর্ণ ছায়া তার মুখে চোখে নেমে আসছিল, সেটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল—এতটুকু চিহ্নও তার রেখে গেল না। সেখানে সে, গ্রামের সেরা সুন্দরী মালাশা, তার দুখানি হাত প্রসারিত করে পড়ে আছে। মুখখানি তার স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ। তখনও তার মুঠোতে রাইফেলটি ধরা রয়েছে, কিন্তু সে নিজে তখন দূরে, অতি দূরে, সব কিছু থেকে দূরে ভেসে চলেছে রামধনুর দেশে, তুষারাচ্ছন্ন প্রভাতের নীল আকাশে,

সেই ঝলমল তুষারের মধ্যে—প্রথম স্থর্যের আলোকরশ্মি এসে পড়েছে যার উপরে।

স্থর্যের প্রথমালোকে রামধনু জেগে উঠেছে। সমস্ত রাত্রিই তার বক্র-রেখা মাথার উপরে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একটু অস্পষ্ট! মুক্তা-স্বচ্ছ রেখা চাপা পড়েছিল আকাশের গভীর নীলিমায়। কিন্তু এখন আলোতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রঙীন করে তুলেছে। নির্মল আলোয় জল্ জল্ করে উঠছে, সন্তো-প্রস্ফুটিত দলগুলির মত—স্থকোমল তার রঙ। সেই রক্তিম দলগুলির উজ্জলতাই যেন প্রতিফলিত হয় প্রথম বসন্তে ফোঁটা স্থলপদ্মের রঙে, লেটুসের নির্মল সবুজাভায়, ব্লু বেলের রঙের আমেজে, গোলাপের উজ্জল আভায় আর ক্যাম্পি-য়ন ফুলের সোনালী উচ্ছ্বাসে।

মালাশার ছুটি চোখ নিবদ্ধ ওই রামধনুর দিকে,—আকাশজোড়া উজ্জল ধনু-রেখা! দ্রুত ভাটার টানে, প্রবাহিত রক্তস্রোতের সঙ্গে তার জীবন নিঃশেষ হয়ে আসছে। আঙুলগুলি শক্ত, পা তুখানি ঠাণ্ডা এবং সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু তখনও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই রামধনুর দিকে, সুদূর স্বর্গের দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন করা প্রোজ্জল পথ-রেখার দিকে। আলোকিত একটি পথ গিয়েছে অজানা নিরুদ্দেশে, স্বর্গের সবুজ আভায় আনন্দের একটি পথ—স্থর্য আলোকের আঘাতে উজ্জল হয়ে উজ্জলতর হয়ে উঠেছে। সে হেঁটে চলেছে সেই রামধনুর পথে—সে মালাশা, এই গ্রামের সবচেয়ে স্থন্দরী একটি মেয়ে, যৌথ-খামারের সেরা কর্মী। সংবাদপত্রে এরই কথা লিখেছিল তারা, এরই জন্যে বসন্তের রাত্রিগুলো একদিন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভালবাসায়।

তখন আর তুষার বা বরফ ছিল না। তার মাথার নীচে ঘাস আর বাতাসের ফিসফিসানি, ফুলের চাপা মৃদু গন্ধ। কাছে কোথায় যেন নির্মল জলস্রোতের কলকলধ্বনি। প্রান্তরের মিঠে গন্ধ। বহু দূর থেকে তার কানে ভেসে আসে জনকণ্ঠের শব্দ, মেয়েদের গান আর ছেলেদের হাসি। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল স্থরের কান্নায়। তার দৃষ্টি খুঁজতে লাগল আকাশে সেই রামধনুটিকে। কিন্তু না, এ যে বসন্তের রাত্রি, রামধনু থাকবে কি করে। ... ইভান হো হো

করে হাসছে, তার দুটো চোখ একেবারে তার মুখের কাছে, কালো ভুরুর নীচে—সেই দুটি কটা চোখ। তার পর ছবিটা মুছে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে। রামধনুটা তখনও আছে—ঠিক সেইখানে। আর একবার সে চোখ মেলে দেখতে চাইল তার দ্যুতি, নিতে চাইল চোখ ভরে।

বহু কষ্টে কনুই ভর দিয়ে মালাশা উঠতে চেষ্টা করল; একটা অসহ্য সুতীব্র যন্ত্রণার প্রবাহ তার সারা দেহে বয়ে গেল। উঠতে গিয়ে আবার সে পড়ে গেল তুষারের উপর। অনুভব করল আসন্ন মৃত্যুকে, বুঝতে পারল যে সে মরে যাচ্ছে। সে হাত বাড়াল আনন্দের উজ্জ্বল রেখাটিকে ধরবার জন্যে—আকাশশায়ী সেই রামধনুটিকে। কিন্তু তার হাতের মুঠোয় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না। চোখ দুটি আকাশের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে নিবদ্ধ, মসৃণ শুভ্র দাঁতগুলো ঠোটের ফাঁকে চিক্ চিক্ করছে, মুখে একটি বেদনার হাসি ফুটে উঠেছে।

*

ঘরটার পিছনে হল্লা আর চীৎকার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মেয়েরা বন্দী জার্মানদের নিয়ে চলেছে। তের্পিলিখা একটি পলাতককে তার খামার থেকেই বার করেছে। বন্দুকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে গিয়ে কোণের একগাদা খড়ের তলায় গা ঢাকা দিয়েছিল। বরফের উপরে তার পায়ের চিহ্নই তাকে ধরতে সাহায্য করেছে। তাকে ধরবার জন্যে লাল পল্টনদের কোন সাহায্যই তের্পিলিখা চাইল না। সে আর গ্রোখাচের দুই মেয়ে, অস্ত্র-হিসেবে নিল কাস্তে ও বিদা। সাবধানে গিয়ে ঢুকল খামারের ভিতর।

"এই, শূয়ার, বেরিয়ে আয় ওখান থেকে! ফ্রসিয়া, ওই দেখ, লোকটা, ওইখানে খড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ..."

"ধাক্কা দিস নি! আমার এইটে দিয়েই খোঁচা দেব।"

"দেয়ালের ধার দিয়ে তুই ঘুরে আয়, ইঁদুরটা তোর দিকে গুলি ছুঁড়তে পারে। ..."

অবরুদ্ধ সৈনিকটি বুঝতে পারছিল না ওরা কি বলছে। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল খড়ের উপর উদ্যত ক্যাঁচা। তাড়াতাড়ি সে হামাগুড়ি দিয়ে খড়ের ভিতর

থেকে গা ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এল। তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পোশাক ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে, তার মাথায় জড়ানো এক জোড়া মেয়েদের জুতো।

"লোকটা প্রেমিক দেখছি! দেখো ওর দিকে তাকিয়ে! এই বেরিয়ে আয় ওখান থেকে! দেখি একবার তোকে! ..."

ভীতার্ত জার্মানটা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে সরে গেল। তারপর উল্টে পড়ে গেল দরজার সামনে।

"কি রকম করে হামাগুড়ি দিচ্ছে ছাখ্! ... এই, চলে আয় এদিকে, হাত তোল্! ফস্‌কা, দেখ তো একবার খড়ের ভিতর বন্দুক-টন্দুক আছে কি-না। কাজে লাগবে তা হলে।..."

মেয়েটি বেশ ভাল করে কোণাটা খুঁজে দেখল।

"না, এখানে কিছু নেই ত। ও হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছে।"

"তোর বরের দিকে একবার চেয়ে দেখ্, কেমন সুন্দর জুতো পরেছে! ফুস্।" তের্পিলিখা সবিস্ময়ে বলল।

জার্মানটার পা দুটোয় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো।

"ওর পা দুটো নিশ্চয়ই বরফে জমে গেছে। কেমন করে টেনে টেনে হাঁটছে ছাখ্!"

"ওকে তো কেউ এখানে আসতে বলে নি। ও তো ওর ঘরে থাকলেই পারত, আগুনের ধারে বসে দিব্য আগুন পোয়াতে পারত—যত ওর খুশি। কিন্তু না, ওদের লোভ রয়েছে আমাদের দেশের উপরে!"

লোকজন সব ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।

"ওকে কোথায় পেলে, তের্পিলিখা?"

"ছাখ্, ছাখ্, চেয়ে ছাখ্ একবার এটার দিকে!"

"তোমরা কি চাও? দেখতে পাচ্ছ না, আমি একজন বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছি। এখানে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে তোমাদের উচিত নিজেদের খামার ও চালাগুলি খুঁজে দেখা। গুবরে পোকার মত কে যে কোথায় লুকিয়েছে!—কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে সবগুলোকে!"

"ঠিক বলেছে তেপিলিখা।" খোঁড়া আলেকজান্দ্র বলল। "চল, আমরা খুঁজে দেখি আর কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি-না।"

সকলে ছুটল, হাতে কুড়ুল।

"চল সকলে একসঙ্গে যাই।"

"সকলে একসঙ্গে গেলে বড় মজা হবে।"

"ওহো, ফ্রসিক্সা ভয় পেয়েছে—বোধ হয় কোন জার্মানের সামনে পড়ে যাবে বলে। ..."

"ভয় নেই, যদি মুখোমুখি পড়েই যাই, তা হলে তাকে টুঁ শব্দটি করতে হবে না।"

"তা হলে, চল মেয়েরা সব," ওদের ঠাণ্ডা করবার জন্যে আলেকজান্দ্র বলল। "অত চেঁচিয়ো না।"

ওদের দল চলল ঘর-ঘর খুঁজতে। ভেড়ার গোয়ালে সমস্ত খড় নেড়ে চেড়ে দেখল, খুঁজে দেখল খামারগুলি। ছেলেমেয়েগুলো ছুটল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। খোঁচা দিতে লাগল প্রত্যেকটি কোণায়, আর আনন্দে চীৎকার করে উঠতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে উর্ধ্বশ্বাসে সাশা ছুটে এল।

"আমাদের খামারে একটা জার্মান। ..."

সকলে সদল-বলে ছুটল সেই খামারের দিকে। এবং সগর্বে ভীত কম্পিত একটা জার্মানকে বের করে নিয়ে এল। লাল পল্টনদের মধ্যে যারা গ্রাম তল্লাস করছিল, তারা হেসে উঠল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু মেয়েরাই জানে গ্রামের প্রত্যেকটি গলিঘুচি, সেইজন্যে তারাই জার্মানদের ধরেছে বেশি।

"কি গো পল্টনের দল, কারা বেশি বন্দী পাকড়েছে?"

"তোমরা, তোমরা," সৈনিকেরা হেসে জবাব দিল।

"এদের দলপতিটি কোথায়?" শালভ অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। "আর একবার খুঁজে দেখ তোমরা, নিশ্চয় সে পালাতে পারে নি।"

তারা মৃত জার্মানদের মধ্যে খুঁজতে লাগল, কিন্তু তাদের মধ্যে সব সাধারণ সৈনিক এবং একটি মাত্র সার্জেণ্ট !

"ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার কর—ক্যাপ্টেন !"

কিন্তু ভের্নের চালাটার পিছনে পড়ে আছে বরফের উপরে, প্রচণ্ড আঘাতে একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর একটা চোখের দৃষ্টি সোজা নিবদ্ধ তার মাথার উপরে আকাশের দিকে। মাথার যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। তার মনে হচ্ছিল, যেন একটা হাতুড়ির ঘা পড়ছে —ঠিকরে বেরুচ্ছে রক্তিম, পাণ্ডুর, বাসন্তী রঙ্গের ফুলকি ; একটা ক্ষিপ্ত শিখা জ্বলছে তাঁর অন্ধ চোখটার কাছে, আর তার গলার মধ্যে গিয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলছে, রুদ্ধ হয়ে আসছে তার কণ্ঠ, কিন্তু তবু সে রক্তস্রোতের নিবৃত্তি নেই, যেন একটা অতল গহ্বর থেকে উৎসারিত হয়ে আসছে। সে ঢোক গিলে চলেছে অনবরত। বুঝতে পারছে, এই ঢোক গেলা বন্ধ করলেই সেই উচ্ছ্বসিত স্রোতপ্রবাহে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। গলার ভিতরে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিল—তাতে স্বাভাবিক ভাবে ঢোক গিলতে পারছিল না। কিন্তু তবু এই আপ্রাণ ঢোক গেলার প্রচেষ্টায় তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নিজেরই তার মনে হচ্ছিল, অসাড় হয়ে আসছে সে। বুঝতে পারছিল যে, এক্ষুনি যদি কেউ তাকে খুঁজে না বের করে, না যদি সাহায্য করে, সে নিশ্চয়ই মরে যাবে। সে কেঁপে উঠল। কে তাকে সাহায্য করবে? চাষীরা, এই গ্রামের অভিশপ্ত চাষীর দল? একটা ভয়ের বন্যা বয়ে গেল তার উপর দিয়ে ঃ ধর, সে মরল না কিন্তু পড়ল চাষীদের কঁ্যাচার মুখে, অথবা বলশেভিকেরা তাকে বন্দী করে নিয়ে চলল। ··· চারিদিক এখন নিঃশব্দ। লড়াই থেমে গেছে। সে নিজেকে ঠকায় নি। সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার দলবল সব নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর বলশেভিকেরা জিতেছে। হতাশা তার বুকের মধ্যে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। সে, ক্যাপ্টেন ভের্নের, ওই খাকি রঙের পোশাক পরা উকুন-গুলোর দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছে। কি করে এটা ঘটল?

সে যেন তার একটা চোখ দিয়ে সুদূর নীলিমায় এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগল। আর সেখানে সে দেখতে পেল সেই রামধনুটি ঃ দিগদিগন্ত সংযোজিত করে সেই বিরাট ধনু-রেখা, স্বর্গ-মর্ত্য-সংযোজিত-করা সেই একটি প্রদীপ্ত রেখা। তার কোমল রঙগুলি ঝলমল করছে আলোকে। তার আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে হঠাৎ অস্পষ্ট একটা স্মৃতির ছায়া পড়ল ঃ কোথায় সে দেখেছিল এই রামধনু ? ···কেন, সেই যে তুষারঝড়ের আগে। ··· কি বলেছিল সেই স্ত্রীলোকটি ? বলেছিল রামধনু একটি ভাল লক্ষণ।

ক্যাপ্টেন ভেনের গোঙাতে লাগল। উদ্ভাসিত আনন্দে রামধনুটি হাসছে। এটা সুলক্ষণ, কিন্তু তার জন্যে নয়। উদ্ভাসিত রামধনু কিন্তু সে আর দেখতে পেলে না। অন্ধকারে সে ডুবে গেল।

১০

যারা সে রাত্রিতে নিহত হয়েছে এবং যারা মাস খানেক আগে নিহত হয়ে খানায় বরফের উপর পড়ে আছে তাদের সকলকেই কবর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে গির্জার ছোট্ট ময়দানটিতে।

ফেডোসিয়া ক্রাবচুক নিজেই তার ছেলের দেহটি বয়ে এনে দিয়েছে। অনড় ও অস্বাভাবিক হালকা মাথাটি তার কাঁধের উপর ন্যস্ত করে ফেডোসিয়া ছেলের রেশমের মত নরম চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগল। যখন সেই কালো মুখখানির দিকে তাকাল, তখন ওর মনে বেদনা বা দুঃখ কোন ভাবেরই উদয় হল না। ওর মনে হল, হয়তো সে মুখখানি কাঠ খোদাই করে তৈরী হয়েছে। ভাসিয়া অনেক দিন অপেক্ষা করেছে। একদিন ভাই-ই ওকে বরফ থেকে দূরে কবর দিয়েছিল, আজ আবার ভাইয়েরাই একটি কবরে বহু ভাইয়ের সঙ্গে তার শেষ বিশ্রামের ব্যবস্থা করল।

নালার উৎরাই বয়ে শ্লেজখানা ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। গাড়ীর পাশে পাশে ফেডোসিয়া ছেলের মৃতদেহটি এমনি ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে যাতে

সেটি কোনমতেই হাত ফস্‌কে বরফে পড়ে না যায়। ভাসিয়ার পাশে কবরে যে-সব অপরিচিত লোকের দেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, ফেডোসিয়া মায়ের স্নেহে তাদের সকলকেই ভাল করে শুইয়ে দিল।

"এই ছোট মেয়েটিকেও এদের পাশেই কবর দাও," শালভ হুকুম করল। "এ মেয়েটিও সৈনিকের মতই লড়ায়ে প্রাণ দিয়েছে।"

"ও ছোট মেয়ে নয়, প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী," মাল্যুচিখা মন্তব্য করল। ওর স্বামী সৈন্যদলে কাজ করে।" কিন্তু তারা যখন মালাশার দেহটি নিয়ে এল, তখন মাল্যুচিখার মনে হল যে তারই ভুল। একটি বালিকা, একটি যুবতী বরফের উপর শুয়ে আছে। এক বছর আগে মালাশার যখন বিয়ে হয় নি, তখনকার কথাই মাল্যুচিখার মনে পড়ছে।

"সত্যিকারের সুন্দরী বটে," কোমল কণ্ঠে একজন লাল পল্টন বলল।

হাঁ, সেই, মালাশা, গ্রামের সব চেয়ে সেরা সুন্দরীই বটে। তার চোখের লম্বা পক্ষ্মগুলি তার গালে ছায়া ফেলেছে। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো ভ্রূদুটি ওর সুন্দর মসৃণ কপালের উপর চাতকপাখীর মত ডানা মেলে রয়েছে। ঠোঁট দুটি একটি বেদনার হাসিতে জমাট বেঁধে আছে, এ হাসি থেকে কেউ দৃষ্টি ফেরাতে পারে না।

ফাঁসীকাঠ থেকে তারা লেভন্যুকের দেহটি নামিয়ে আনল। তার মা আসন্নপ্রসবা, প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তবু সে ঘরে থাকতে রাজী হয় নি। পুত্রের শক্ত কালো যে দেহটি সুদীর্ঘ একমাস ধরে বাতাস ও বরফের মধ্যে ফাঁসীকাঠে ঝুলে ঝুলে দোল খেয়েছে সেই দেহটি দু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল।

"আস্তে, আস্তে," সে সাবধান করে দিল, যেন ও ব্যথা পাবে, যেন ওর লাগবে।

মেয়েরা সকলে তাকে সাহায্য করল। লেভন্যুকের দেহটা অত্যন্ত হালকা হয়ে গেছে, বলতে গেলে ওজন মোটেই নেই। বয়স তার অবশ্য ষোল, কিন্তু মুখখানা দেখলে মনে হয় বালকের, যেন কাঠ থেকে খোদাই করা।

তারা একটি অতি বৃহৎ কবর খুঁড়ে ফেলল এবং তার মধ্যে মৃত দেহগুলি পাশাপাশি শুইয়ে দিল। এই প্রস্তরীভূত কালো দেহগুলি যাদের, তারা মাস-অনেক আগে নিহত হয়েছিল। আর সেদ্যুর্ক ও সেগাই ব্লাশেস্কোর বিকলাঙ্গ দেহের অবশেষ, মালাশা এবং কমাণ্ডাণ্টুরে যারা নিহত হয়েছে—তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সকলেই ঘুমোচ্ছে। সকলের হয়ে শালভ বলতে লাগল। তার গুরুগম্ভীর অথচ সরল কথাগুলো বাতাসে ভেসে গেলে দূর দূরান্তরে, ভেসে গেল রামধনু-আঁকা কাচস্বচ্ছ আকাশে।

গ্রামের সকলে—স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও ছেলেমেয়েরা সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল আর চেয়ে রইল পাশাপাশি শায়িত মালাশার ও লাল পল্টনদের দিকে। কেউ কাঁদল না। খোলা মাথায় তারা দাঁড়িয়ে রইল গম্ভীর হয়ে। ফেডোসিয়া ক্রাবচুক তার ছেলের দেহাবশিষ্ট তার দেশের মাটিতে সমাধি দিল। বৃদ্ধা শারিখাও তার কন্যার দেহাবশেষ শুইয়ে দিল মাটীর উপর। আর সকলে অপরিচিত, কিন্তু কবরে শায়িত ওই দেহগুলি আজ সকলের কাছেই যেন অতি-পরিচিত—যেন ওরা তাদের কারুর ছেলে, কারুর স্বামী, কারুর বা ভাই।

সেদিন যারা মৃত্যুকে বরণ করেছে, যারা উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে শুয়ে আছে ওই কবরে, ওদের কাছে তাদের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ যেন আর কেউ নেই। তারা লাল পল্টনের সৈনিক—তাদেরই সৈনিক।

"কোন দিন আমাদের মাতৃভূমি এদের কথা ভুলবে না," শালভ কম্পিত আবেগে বলে উঠল।

হাঁ, তারা জানে—তারা কোন দিন এদের ভুলতে পারবে না। তারা জানে, এই মৃত দেহের মুখগুলি আর এই দিনটি—যেদিন তারা এদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করল, সেদিনের কথা স্মৃতি থেকে কোন দিনই মুছে যাবে না। শত্রুর গুলি বর্ষণের ঝড়ে যারা নিহত হয়েছে, যারা এই গ্রামকে উদ্ধার করবার জন্যে ছুটে এসেছিল এবং কেড়ে নিয়েছে শত্রুর হাত থেকে,—আজ তারা সম্মিলিত হয়েছে একটি কবরের মাঝখানে এসে।

সকলের দৃষ্টি শান্ত ও সজাগ। হাঁ, এই তো যুদ্ধ, গ্রামের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্ত, আগুন, আর লোহা নিয়ে। কিন্তু অন্ধকার ও অতি দুর্দিনের মাঝখানে এই গ্রামখানিকে অবিচলিত রেখেছিল যে বিশ্বাস, তা আজও সকলের বুকে তেমনি সজাগ আছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের পল্টনেরা আবার ফিরে আসবে এবং তাদের কথাই হবে শেষ কথা।

শালভ ঝুঁকে খানিকটা কঠিন মাটী তুলে নিল এবং কবরের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর একে একে সকলেই কবরের পাশে এসে এক মুঠো করে তাদের মাতৃভূমির মৃত্তিকা নিয়ে ফেলতে লাগল সেই কবরের মধ্যে। "প্রার্থনা করি, কবরের মধ্যে তারা শান্তিতে বিশ্রাম করুক। অনুভব করুক তাদের মাতৃভূমিকে, তাদের মুক্ত স্বাধীন মাতৃভূমিকে—হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে।"

"নিউরা, তুইও খানিকটা মাটী দে," একটি মা তার দু বছরের মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলল।

ছোট মেয়েটি কচি হাত দিয়ে বরফের তলা থেকে কালো মৃত্তিকা খুঁড়ে বের করল খানিকটা এবং ফেলে দিল কবরের মধ্যে। সৈনিকেরা কোদাল দিয়ে কবর ভরতি করতে লাগল। এক সময় কবরটা ভরে জমির সমতল হয়ে গেল। তার উপর একটি স্তূপ গড়া হল।

"যখন বসন্ত আসবে তখন এর উপর আমরা ফুল গাছ লাগাব," মাল্যুচিখা বলল।

"আর সবুজ ঘাস," ফ্রসিয়া বলল। "সকলেই যে যার বাগান থেকে গাছ নিয়ে আসবে।"

ভিড় ভেঙে গেল আস্তে আস্তে। কারো হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত নয়। শুধু একটি গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে আছে। যারা মরেছে তারা সর্বস্বই দিয়ে গেছে তাদের মাতৃভূমির জন্যে। এ রকম আর একবার ঘটেছিল ১৯১৮ সালে এবং সকলেরই তাই মনে পড়ল। সে দিন এই গ্রাম থেকে অল্প লোক মারা যায় নি। এই রকমই হয়। এই দেশের মাটীতে যারা জন্মেছে আর বড় হয়ে

উঠেছে—তাদের জীবন দিয়ে আর রক্ত দিয়ে এই দেশকে রক্ষা করতে হবে। এ অত্যন্ত সহজ সরল কথা।

নিঃশব্দে সকলে চলে গেল সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পরেই, তারপর সারা গ্রাম মুখর হয়ে উঠল গোলমাল আর হট্টগোলে। প্রত্যেকটি মেয়েই লাল পল্টনদের অনুরোধ করছিল তাঁদের অতিথি হওয়ার জন্যে। সকলেরই ইচ্ছে তাদের খাওয়াবে—যা আছে তাই দিয়ে।

তাদের একটা বিরাট প্রতিনিধি-দল এল শালভের কাছে।

"আপনার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে," তেপিলিখাই শুরু করল, "আপনাদের সকলকে একটু আপ্যায়ন করতে চাই, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের নেই। ..."

"আমি কি করতে পারি ?" সে হাসতে লাগল।

"আমরা সব ব্যবস্থাই করব—আপনি শুধু একটু যদি সাহায্য করেন। ... আমরা সব কিছু পুঁতে রেখেছি—লুকিয়ে রেখেছি মাটির নীচে। যখন জার্মানরা এসে পড়ল—তখন সব আমরা লুকিয়ে ফেলেছিলাম। এখন কথা হচ্ছে—সেগুলো খুঁড়ে বের করি কি করে? খোঁড়াখুড়ি করবার হাতিয়ার কোন কিছু নেই আমাদের। কিন্তু আপনাদের সে সব আছে। যদি আপনাদের জন দুই লোককে দেন তা হলে এক্ষুনি সব বের করে ফেলব।"

"বেশ ত। আমরা যাচ্ছি। এই—কে আছ তোমরা, কে যাবে ওদের সঙ্গে।"

অনেক জুটল স্বেচ্ছাসেবক। মেয়েদের কোমর পর্যন্ত তুষারের মধ্যে ডুবে গেল—ছুটল তারা মাঠের মধ্যে।

"এইখানে—এই ঝোপের ধারে। ..."

"কি বলছ তুমি! এইখানে ছিল—এই দিকে!"

"তুই আবার এর মধ্যে কেন? ছেলেমেয়ে তোরা সব দেখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—তোদের কথা আমার শুনতে হবে? ভাবিস্, আমার বুঝি কিছু মনে নেই?"

এদিকে খোঁড়া আলেকজান্দ্র পল্টন-অতিথিদের অনুরোধ করছে :

"যাও না তোমরা এগিয়ে—মেরে ফেল ভেড়াটাকে, এটা তেমন খারাপ নয়। হাঁড়িতে চাপিয়ে দিলেই একটা খাবার তবু তৈরী হবে।"

"কিন্তু এ তো তোমার একটিমাত্র ভেড়া, তাই না?"

"হাঁ একমাত্র বটে। ... আমার আরও ছিল, কিন্তু জার্মানরা সব মেরে খেয়েছে। একমাত্র এটাকেই রেখে দিয়েছে।"

"তোমার এই সব শেষ ভেড়াটাকে কি আমরা নিতে পারি? না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না!"

আলেকজান্দ্র হাত কচলাতে শুরু করে দিল।

"আমাকে হতাশ করো না, বাছারা। আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের এটা দিচ্ছি, সর্বান্তঃকরণেই দিচ্ছি। এ ছাড়া যে আমার আর কিছু নেই। তোমরা আমাকে হতাশ করো না, সত্যি, তাতে আমার মনে ভারী কষ্ট হবে। ..."

ওদিকে মেয়েরা চার দিক ঘুরে ঘরে ঘরে যা লুকানো ছিল সব টেনে বার করল, চিলকোঠা ও মেঝের নীচেতেই তারা সাধারণত খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে রেখেছিল। গত শরতে যে শূয়র কাটা হয়েছিল তারই শুকনো মাংস, রশুন ইত্যাদি জার্মানরা ছুঁতে পারে নি। জালা জালা মধু, এমন কি সূর্যমুখীর বিচিও পাওয়া গেল। গ্রামে যে কয়টা গাই-গরু তখনও ছিল তারা তাড়াতাড়ি সেগুলিকে দুইয়ে আহতদের পানের ব্যবস্থা করল।

গ্রাম্য সোভিয়েটের বাড়ীতে দুটো প্রশস্ত ঘরে আহতদের স্থান করে দেওয়া হয়েছে। আর সকলের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে ফ্রসিয়া সেখানে অতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় সে নার্সিং-এর কাজ কিছু শিখেছিল। সাদা পোশাকে তাকে সর্বক্ষণ কাজকর্মে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছিল, মাথায় তার একখানা সাদা রুমাল এমন ভাবে আটকানো যে, চুলগুলো আর খুলে পড়তে পারবে না। দরজার সামনে স্ত্রীলোক ও তরুণীরা এসে সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

"আচ্ছা, তোমাদের জন্যে আমরা কি করতে পারি বল?" তরুণ সদানন্দ চিকিৎসকটি সেখান দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল। লাল পল্টনের যে দলটি আগের রাত্রে জার্মান কম্যাণ্ডান্টের সদর দফ্তর অধিকার করেছে, এই ছোকরা ডাক্তারটি তাদের সঙ্গেই গ্রামে এসেছিল, এইমাত্র আহতদের ব্যাণ্ডেজ শেষ করেছে।

"আমরা সাহায্য করতে চাই ··· হাসপাতালে। ···"

"সত্যি আমাদের আর সাহায্যের দরকার নেই। আমরা দুটি মেয়ে পেয়েছি, তা ছাড়া, আমাদের নার্সরাও আছে। ···"

"বেশ তো, না হয় আমরাই মেঝেটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি, ওটা তো যথেষ্ট অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে। ···"

"বেশ তো, মন্দ কি। তা মন্দ নয়।"

তারা সকলে ছুটে যে যার বাড়ী চলে গেল এবং অবিলম্বেই বালতি ও ন্যাতা নিয়ে এসে হাজির হল।

"তোমরা সকলেই কি মেঝে পরিষ্কার করতে চাও?"

তাদের মধ্যে তখন একটা দস্তুরমত তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। অবশ্য আহতরা যেন বিরক্ত না নয় এজন্যে যথেষ্ট সাবধানে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল। শেষটায় তাদের সকলকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হল এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটুকই পরিষ্কার করতে লাগল।

"ওই রোগীটির গা থেকে কম্বলখানা কেবলই সরে সরে যাচ্ছে, অথচ তা তোমার নজরে পড়ছে না," ফ্রসিয়াকে উদ্দেশ করে পিজিচিখা বলে উঠল।

"যদি সরেই যায় তো তুমিই ঠিক করে দাও না কেন?" ফ্রসিয়া সংক্ষেপে জাবাব দিল। সে তখন এক গামলা রক্তমাখা জল নিয়ে যাচ্ছিল।

পিজিচিখা বিছানার কাছে এগিয়ে গেল এবং অত্যন্ত সাবধানে আস্তে আস্তে আহত লোকটির পা দুখানি ও সারা দেহ কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর সে আর রোগী ফেলে কোথাও নড়ল না।

"তুমি এখানে কি করছ?" ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি এর গায়ের কম্বলখানা ঠিক করে দিচ্ছি! কম্বলখানা কেবলই সরে সরে যাচ্ছে," সে সম্ভ্রমের সঙ্গে জবাব দিতে দিতে আর একটি রোগীর মাথায় বালিশ ঠিক করে দিল।

ডাক্তার হাতের ইশারা করল:

"বেশ, দাও ঠিক করে, তোমার যখন এত আগ্রহ।"

হাঁ, বাস্তবিক, সে কাজ করতে চায়। তারা সকলেই সাহায্য করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। সামান্য কাজ, তুচ্ছ হুকুম তামিল করবার জন্যে তারা সাগ্রহ প্রতীক্ষা করছে। মগে করে জল গড়িয়ে দেওয়া, মগগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা, তাদের জামা-কাপড় কেচে দেওয়া, তাদের মাথার চুল আঁচড়ে দেওয়া, কেউ যেন অসতর্ক হয়ে দরজার কবাট খুলে রেখে না যায় সে দিকে নজর রাখা, কেন না, দরজা খোলা থাকলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

ঠিক এই সময় লিদা গ্রোখাচ ভয়ে ভয়ে উঁকি মারল।

"কি, তুমিও সাহায্য করতে চাও না কি?" ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করল।

সে মাথা নাড়ল:

"আমাদের একজন প্রতিবেশিনীর প্রসববেদনা উঠেছে, ... আপনার কি একবার গিয়ে তাকে দেখা সম্ভব হবে? আপনি যখন ডাক্তার।..."

"কিন্তু, আমি—আমি তো ডাক্তার নই, আমি সার্জেন।..."

"তাতে কি, তবু আপনি ডাক্তার। সে বড় কষ্ট পাচ্ছে। আজই সকালে তাকে ঘর থেকে জার্মানদের শব টেনে ফেলতে হয়েছে, আমার মনে হয় তার জন্যেই তার এই যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"যাক, কিছু অবশ্য করবার নেই, তবুও আমি যাব," ডাক্তার সহাস্যে বলল: "একজন নতুন নাগরিক জন্মগ্রহণ করছে, কাজেই আমাকে সাহায্য করতেই হবে। কুজমা, রোগীদের তোমার হেপাজতে রেখে যাচ্ছি। কোন্ দিকে যাব?"

লিদা তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে লেভন্‌চ্যুকদের বাড়ীর দিকে চলল। ডাক্তার আড়ষ্ট হাত দুখানা একটু রগড়ে নিয়ে তার অনুসরণ করল।

"এত ঠাণ্ডায় আপনার দস্তানা পরা উচিত !"

"দস্তানা আমার ছিল, কিন্তু কাল রাত্রির বেলায় কোথায় যে হারিয়ে ফেলেছি। ... আর তো নেই ..."

লিদা সসঙ্কোচে তার দিকে একবার তাকাল, তারপর তাড়াতাড়ি নিজের হাতের পুরোনো দস্তানা জোড়া খুলে ফেলল। এ দস্তানা তার নিজেরই হাতে বোনা এবং তাতে লাল নীল ফুল তোলা।

"ও কি হচ্ছে !" ডাক্তার বলে উঠল। "তোমার নিজের কি হবে ?"

"আমার আর এক জোড়া আছে," লিদা নির্ভয়ে মিথ্যা ব'লে বসল। "একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, জার্মানরা খুঁজে পায় নি। আপনি ডাক্তার, আপনার এর প্রয়োজন খুব বেশি।"

তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে দেখে এবং ও কেঁদে ফেলতে পারে মনে করে ডাক্তার হাসল :

"বেশ, তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন এটা আমি নিলাম।"

লেভন্যুকদের বাড়ীর সদরে এক দল স্ত্রীলোক জটলা করছিল। তারা তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে রাস্তা ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যেই তারা ডাক্তারকে চিনে ফেলেছে।

"ছেলে মাটিতে পড়েছে," তাদের একজন বলল।

"তা হলে তো আমার আর এখানে কোন প্রয়োজন নেই।"

"হাঁ নিশ্চয় আছে। আপনি আগে ওকে দেখুন। অনেকক্ষণ কষ্ট পেয়েছে, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

"এই যে মাসি, ডাক্তার এসেছেন," লিদা জানিয়ে দিল।

"কিন্তু কেন বল তো ? ডাক্তারের দরকার কি ? আর তা ছাড়া, ইনি তো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ !" রোগিণী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল ! "আপনি বরং একবার বাচ্চাটাকে দেখুন, আমার জন্যে করবার আপনার কিছুই নেই। আর এ তো আমার প্রথম বার নয় !"

ডাক্তার দোলনার উপর ঝুঁকে পড়ল।

"ছেলে ?"

"হাঁ, ছেলে, বেটাছেলে। আমার একটি মাত্র মেয়ে, নিউর্কা, আর সবই ছেলে। ... আমাদের পরিবারে ছেলের সংখ্যাই বেশি! ..."

"বাঃ, খাসা ছেলেটি ত! ওর নাম কি রাখবেন ?"

"এক্ষুনি আমার পড়শীদের সঙ্গে সেই কথাই বলাবলি করছিলাম। ... ওকে মিতিয়া বলেই ডাকতে চাই, কিন্তু ওরা বলে তা ঠিক নয়।..."

"কেন, ওর দাদার কি হয়েছে ?"

"ওর দাদা, আমার সব চেয়ে বড় ছেলেকে আজ আর সকলের সঙ্গে কবর দেওয়া হল। ... গোটা একটা মাস সে ফাঁসীকাঠে ঝুলে ছিল। আমার সেই ছেলেকে আজ আমি নিজের হাতেই ফাঁসীকাঠ থেকে নামিয়েছি," ধীরভাবে স্ত্রীলোকটি সব কিছু খুলে বলল।

ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

"সে আপনার ছেলে তা তো জানতাম না। ..."

"হাঁ, আমার বড় ছেলে! ... গ্যেরিলাদের সঙ্গে যোগ রাখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জার্মানরা ধরে ফেলল। ... আমার প্রথম সন্তান, সতেরয় পা দিয়েছিল। তার নামানুসারেই একে মিতিয়া বলে ডাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা যখন নিষেধ করছে—ওরা বলছে এ রকম নাকি করা উচিত নয়—কাজেই কি নামে ওকে ডাকব জানি নে। ..."

"ওর নাম রাখুন—ভিক্তোর," ডাক্তার পরামর্শ দিল। "নামটাও বেশ ভাল। ও আজ জন্মাল, সুতরাং ভিক্তোর নাম ওরই সাজে। ..."

ক্ষণেকের জন্যে লেভন্যুচিখা কি ভাবল।

"মোটেই খারাপ নয়, লিদা, তুই কি বলিস ?"

"যদি এটাই ওঁর পরামর্শ হয়।..."

"থাক গে, এ নিয়ে আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ কি! সারা গাঁয়ে আর একটি ভিক্তোর নেই, ও-ই ভিক্তোর হোক! কিন্তু বসো বাবা, বসো, একটু আমাদের কাছে বসো!"

"আপনাদের এ স্নেহ ভুলব না, কিন্তু আমাকে যে এখনই ফিরতে হবে, রোগীরা সব হা-পিত্যেশে বসে আছে।"

"কিন্তু মেয়েদের কাছে শুনেছি, তুমি আহতদের সকলকেই তো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে এসেছ। তারা সকলেই নিজের নিজের বাড়ীতে লাল পল্টনদের অতিথিরূপে পেয়েছে, কিন্তু আমি আঁতুড়ে আছি বলেই আমার বাড়ী আর কেউ আসে নি, কেউ না। ... লিদা, ওই তাক্ থেকে ভোদকার বোতলটা নিয়ে আয় তো মা।"

"আপনার কিন্তু খাওয়া উচিত নয়," ডাক্তার ইতস্তত করে বলে ফেলল।

লেভচুচিখা মৃদু হাসল।

"কিন্তু, নয় কেন? আহতদের কেমন করে সারাতে হয় তুমি তা জান, এটা স্বীকার করি, কিন্তু মেয়েদের দেহের ভিতরের খবর তুমি যে বিশেষ কিছু জান না এ আমি অনুমান করতে পারি। এতটুকু ভোদকা যে-কোন লোককে কাজের লোক করে তোলে।"

ডাক্তার আর আপত্তি করল না। লিদা একটি সবুজ রঙের গ্লাসে ভোদকা ঢেলে দিল।

"নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনা করি, সে সুস্থ সবল জীবন লাভ করুক। ..."

"তাকে যেন কখনও জার্মান আক্রমণের সম্মুখীন হতে না হয়।"

"আজ ওর জন্ম হল, এ দিনটি যেন প্রতিদিনই নব নব বিজয়োল্লাস বয়ে আনে।"

"ও যেন ওর দাদার মতই হয়। ..."

ডাক্তার খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ভাল ঘুম হয় নি। আর ভোদকার স্নিগ্ধ একটা গরম প্রবাহ তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেল। তারপর তা গিয়ে ঠিক মাথায় চড়ল! ডাক্তার একখানা টুলের উপর বসেছিল এবং তার মনে হল লড়াই, যুদ্ধ—সব কিছুই যেন রয়েছে দূরে—অনেক দূরে। ঘরের দেয়ালগুলি চমৎকার সাদা; উনোনের গায়ে নানা রকম ফুলের নক্‌শা, ওড়নার কোণে নানারকম সুচের কাজ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরী লিদা তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু

হাসছিল। এ বাড়ী থেকে খান কয়েক বাড়ীর পরেই যে কতকগুলি আহত লোক আছে—এটা যেন মনেই হচ্ছে না, যেন গীর্জার সামনের ময়দানে কবরের উপর একটা স্তূপ গড়া হয় নি, যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে পথে ঘাটে যে পরিশ্রম করেছে তাও যেন মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিল।

"লিদা, ইকোনের পিছনে ফটোখানা আছে, ডাক্তারকে দেখা তো, ওঁকে দেখা।…"

ডাক্তার সেই বিবর্ণ ফটোগ্রাফখানা হাতে তুলে নিল—একটি প্রগল্ভ ছেলে-মানুষের মুখ তার দিকে যেন চেয়ে আছে, মুখখানি সরল, সাধারণ গ্রাম্য বালকের মুখ যেমন হয় তেমনি।

"বরফে তুষারে ওর চেহারার এমন বিকৃতি ঘটেছিল যে ওকে মোটেই চিনতে পারা যেত না। আগেকার ওর ওই চেহারা," মা ধীরভাবে বুঝিয়ে বলল।

ডাক্তারের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। বিদায়ের সময় তাঁর সেই সাদা দুখানি কম্পিত হাত, তাঁর সেই আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, দুটি বড় বড় সজল চোখ—চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাত্রিগুলোর কথাও তার মনে পড়ল, কি বেদনা-দায়ক দুশ্চিন্তা, একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসত। প্রতি দিনই নতুন নতুন আহতের দল আসতে লাগল। রক্তের ভয়, দুঃখ কষ্টের ভয়, মৃত্যুর ভয় তাকে পেয়ে বসল। "মনের বল," আপন মনেই ও বলে, কিন্তু তাতে এতটুকু সুরাহা হয় না। মনের বল—মনের বলই থেকে যায়, সেগুলোকে কোন মতেই মন থেকে দূর করা যায় না। কাজেই মনের বল না বেড়ে বরং যুদ্ধের সময় তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

বিছানায় শায়িত স্ত্রীলোকটির দিকে ডাক্তার তাকাল। তার মাথার নীচে একটি রঙিন বালিশ, চুলগুলো সুবিন্যস্ত থাকায় মুখখানিতে একটা প্রশান্তি বিরাজ করছে! বাতাসে যখন তার বড় ছেলের মৃত দেহটা দোল খেয়েছে, বাতাস গোঙিয়েছে তার চার পাশে, এই স্ত্রীলোকটি কান পেতে শুনেছে বাতাসের সে গোঙানি পুরো এক মাস ধরে। গোটা একটা মাস ধরে এই স্ত্রীলোকটি তার

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনাহারে এবং আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে। আসন্নপ্রসবা হয়েও সে তার ষোল বছর বয়স্ক পুত্রকে ফাঁসীকাঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে কবর দেওয়ার জন্যে, গলার দড়িটাও তাকেই কেটে ফেলতে হয়েছে। তারপর সে গিয়ে ঢুকেছে আঁতুড়-ঘরে। এখন সে শুয়ে আছে সেইখানে, শান্তভাবে কথা বলছে তার সঙ্গে, জার্মানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা মদের সবটা দিয়ে অতিথি সংকার করছে।

মেয়েরা সদর দরজা থেকে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল এবং বেঞ্চি ও টুল টেনে বসল। ডাক্তার তাদের দিকে লুকিয়ে তাকাল। তাদের সকলেই জার্মান-পীড়নের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। চাবুকের ঘা খেয়েছে। তাদের স্বামী-পুত্রেরা আছে অনেক দূরে কোন রণক্ষেত্রে! তাদের কেউ জানে না যে, তাদের প্রিয়জন বেঁচে আছে, কি মরে গেছে। সেই শীতের প্রচণ্ডতার মধ্যে দিন যাপন করেছে সকলে এবং জার্মানদের ডেকে আনা বুভুক্ষার মধ্যে কোন রকমে কাল কাটিয়েছে। তাদের অনেকেরই শরীর বন্দুকের গুঁতোয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কেউ না জানলে তাদের আচরণ থেকে এটা মোটেই বোঝা যায় না। ধ্যানগম্ভীর মুখ তাদের, অবিচল, কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে একটি শান্ত ভাব তাদের মহিমময় করে তুলেছে।

"চাষী রমণী," সে ভাবল এবং এই শব্দ দুটির যেন একটা নতুন অর্থ, একটা নতুন গুরুত্ব তার কাছে ধরা পড়ল।

"আরও কিছুটা ভোদকা থাকলে আমরা মিতিয়াকে স্মরণ করে পান করতে পারতাম," লেভন্যচিখা মৃদু কণ্ঠে বলল।

"কিন্তু কেন?" তের্পিলিখা সংক্ষেপে প্রতিবাদ করল। "কোন কিছু স্মারক ছাড়াও আমরা তাকে মনে রাখব। কি বল তোমরা সব?"

"কেমন করে তাকে ভুলব!"

"মিতিয়ার বদলে ভিক্তোরকে পেলাম! সেও মিতিয়ার মতই বড় হবে, তারই মত কাজকর্ম করবে এবং প্রয়োজন হলে মিতিয়ার মতই দেশের জন্যে প্রাণ বলি দেবে।"

ভোদকার গোলাপী নেশায় ডাক্তার মশগুল হয়ে উঠল। মেয়েদের লক্ষ্য করে সে কিছু ভাল কথা, তৃপ্তিকর কথা কইতে চাইল, কিন্তু তার অন্তরটা ছেলেটির জন্যে একটা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল, মায়ের জন্যেও তার কম দুঃখ হল না, ফাঁসীকাঠ থেকে মৃত পুত্রের দেহ মা হয়ে তাকেই নামিয়ে আনতে হয়েছে, তা ছাড়া, যারা এই দুর্যোগে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে—তাদের সকলকার জন্যেই মমতায় ওর মনটা ভরে উঠল।

"তোমার নেশা হয়েছে," ডাক্তার আপন মনেই নিজেকে বলল, কিন্তু তাতে কোনই ফল হল না। তার দু চোখ ভরে অশ্রু দেখা দিল।

"কি হল আপনার?" উদ্বেগের সঙ্গে লিদা জিজ্ঞাস করল।

"আমি দুঃখিত," নিজের মনের ভাব গোপন করবার চেষ্টায় ডাক্তার সংক্ষেপে বলে উঠল।

লেভন্যুচিখা তার কালো চোখ দুটো মেলে অবিচলিত ভাবে তার দিকে তাকাল!

"এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই, সে সময়ও এটা নয়," আস্তে আস্তে বলল। "মিতিয়া চলে গেছে, কিন্তু ভিক্তোর আছে। আমরা দুর্বল জাতি নই, এই মাটিতেই আমাদের জন্ম। ... ন্যাসপাতি গাছ কেটে ফেললে যেমন দেখতে দেখতে তার গোড়া থেকে আবার ছোট ছোট অঙ্কুর গজায় এবং লোকের দৃষ্টি পড়বার আগেই সূর্যের আলোতে তারা আত্মপ্রকাশ করে। ... মিতিয়া চলে গেছে এবং আরও অনেকে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশ রয়েছে এবং লোকজনও রয়েছে। ... আমরা কত সময় ভেবেছি যে, তোমাদের আসার আগেই হয়তো জার্মানরা আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে। কিন্তু যা দেখবার জন্যে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তা দেখবার জন্যে আমরা এখনও বেঁচে আছি। ... মানুষ সব কিছুই সইতে পারে। ... না, আমাদের লোকেরা বেশ শক্ত, তাদের চুরমার করে দেওয়া জার্মানের কর্ম নয়।"

ডাক্তারের চোখের সামনে যে কুয়াশা জড় হয়েছিল তা হালকা হতে হতে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। এই চাষী স্ত্রীলোকটি এমন সব কঠিন, জটিল চিন্তার

মীমাংসা করে দিল যা ডাক্তারকে অনেকখানি ভাবিয়ে দিল। ওর জবাব সরল, গম্ভীর—ধরনটাই শুধু চাষীর মত। ডাক্তার নিজেকে লজ্জিত মনে করল।

"হাঁ, হাঁ। ..."

"তুমি ছেলেমানুষ, তাই এটা তোমার কাছে কঠিন। সে যাই হোক, সব কিছুরই শেষ হয় এবং তুমি পীড়িতকে নিরাময় করে জীবনটা শান্তিতেই কাটিয়ে দিতে পারবে। আর আমরা—আমরাও আমাদের কাজ করে যাই। ..."

হঠাৎ ডাক্তারের মনে পড়ল যে, সে অনেকক্ষণ এসেছে, তাকে রোগীদের কাছে ফিরতে হবে, তাই উঠে দাঁড়াল।

সারা গ্রামে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। কোথায় যেন বাড়ীর পিছনে কুয়াশা উপেক্ষা করেও মেয়েরা গান গাইছে। পুরুষের কণ্ঠও তাদের সঙ্গে মিশেছে।

গ্রামের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয় সংগীতের ঝঙ্কার। বাইরে তুষার পড়ছে, কিন্তু সে দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। কোথাও কুটীরের পিছনে মেয়েরা গান গেয়ে চলেছে, তাদের সে সুরের সঙ্গে মিশেছে পুরুষদের সুর। কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে যেন গান ঝরে পড়ে। তরঙ্গহীন বাতাসে সেই গানের সুর অপ্রতিহত গতিতে ভেসে চলেছে। সেই সংগীতের সুরমূর্চ্ছনা চাতক পাখীর গানের মত সুদূর আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পরাজয়ের গ্লানিতে দীর্ঘ এক মাস ধরে সারা গ্রাম যে মৌন বেদনায় মূক হয়ে ছিল, আজ যেন তারই রুদ্ধ আবেগ অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। বালিকাদের চপল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে লাল পল্টনদের গম্ভীর সুর আজ এক সঙ্গে মিশে গেছে।

গ্রামবাসীরা চেলেবেলা থেকেই গান গাইতে শেখে। গান গেয়ে তারা দিনের প্রথম আলোককে অভিবাদন করে, গান গেয়েই দেয় অস্তগামী সূর্যকে বিদায়, আবার গান গেয়েই তারা ঘুমের বুকে দেহকে ছড়িয়ে দেয়। ওরা যখন মাঠে শস্য কাটে তখনও গান গেয়েই তারা গমের ক্ষেতে কাস্তে চালায়। নতুন ঘাসে যখন ফুল ফুটে চারিদিক আমোদিত করে, ওরা গান গেয়ে কাটে মনের

আনন্দে সেই ঘাস। রাখাল ছেলেরা মাঠে মাঠে গান গেয়ে মেষ চরায়, আর কৃষকেরা শস্য মাড়াই করে। গানের ভিতর দিয়েই মেয়েরা বিবাহিত জীবন বরণ করে নেয়। যখন তারা শেষ আশ্রয় নেয় মাটির বুকে তখন গানেরই সুর লেগে থাকে তাদের ঠোঁটে। কত সুখ-দুঃখের গান! কত কালের পুরোনো গান—রাস্তার পাশের ওই লিণ্ডেন গাছের চেয়েও কত দিনের পুরোনো গান। ওদের ওই জীবনধারার ভিতর থেকেই সে গান জন্ম নিয়েছে। গানের সঙ্গে জীবনকে আর জীবনের সঙ্গে গানকে খাপ খাইয়ে নিতে ওরা অভ্যস্ত।

সারা মাসটায় তারা ছিল একেবারে নীরবঃ সারা মাস ধরে তাদের মুখ থেকে একটি গানও বেরোয় নি, গ্রামে একটি গানও শোনা যায় নি। কুটীরগুলি, রাস্তা, বাগান—সব কিছুই ছিল নীরব, নিস্তব্ধ।

কিন্তু এখন—এখন তারা গান গাইতে পারে। কিশোরীদের গানে সারা গ্রাম ও সমস্ত বরফাচ্ছন্ন সমতল ভূমি মুখরিত হয়ে উঠেছে। একজনের পর একজন—এমনি করে তারা সেই গানগুলিই গাইতে লাগল যা তাদের অতি প্রিয়, যা তাদের অন্তর থেকে সোজা উৎসারিত হয় এবং খানা, রাস্তা, বাগান—সর্বত্র তাদের গান ছড়িয়ে পড়ল। গ্রাম্য সোভিয়েটের সামনে একদল গাইছিল, সেখানে বৃদ্ধ আলেকজান্দ্র "গ্রাম্য সোভিয়েট"-লেখা একটা সাইন বোর্ড টাঙাতে ব্যস্ত। ছেলেরা ভিড় করে এসে দেখতে লাগল। তারা ঘাড় উঁচিয়ে সুপরিচিত সাইন বোর্ডটির দিকে তাকিয়ে রইল। রাত্রির হাঙ্গামার সব কিছু চিহ্নই ইতি-মধ্যে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে জার্মানরা ঘুলঘুলি কেটেছিল, সেগুলি বন্ধ করা এবং বালি পূর্ণ থলেগুলো সরানো হয়ে গেছে। মেয়েরা ঘৃণাভরে ঘরের মেঝে থেকে জার্মানদের দেহের রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলছে।

"এমন ভাবে সব কিছু পরিষ্কার কর যেন সন্ধ্যার মধ্যে তাদের কোন চিহ্নই এখানে না থাকে," তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলল। এবং তারা একযোগে কাজে লেগে গেল।

একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তারাও তাই চাইছিল। আজকের দিনেই, সূর্যাস্তের পূর্বেই, রাত্রি আসবার আগেই, জার্মানদের তিরিশ দিন শাসনের সব কিছু চিহ্নই মুছে ফেলতে হবে। কে একজন ফাঁসীকাঠটা উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বরফ জমাট বেঁধে এমন এঁটে গিয়েছিল, খুঁটির চার পাশে অনেকটা খুঁড়েও সুবিধা করতে পারছে না দেখে আর একজন একখানি করাত নিয়ে এসে খুঁটি দুটোকে মাটীর সমতল করে কেটে ফেলল। জার্মানরা তাদের ঘরে বাস করত বলে মেয়েরা এত দিন তাদের ঘরদরজার দিকে মনোযোগ দেয় নি, আজ তারাও ঘরদরজা চূণকাম করে পরিষ্কার করে ফেলল। তা ছাড়া, জার্মানরা ঘরের দরজা দালান সর্বত্র যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করত, সেগুলি পরিষ্কার করতেও ঝাঁটা ও কেওড়ার আবশ্যক হয়েছে। ফসল কাটার সময় তারা যেমন ব্যস্ত থাকে আজও ঠিক তেমনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"তাদের কোন চিহ্ন রাখব না," ছেলেরাও কথাটার পুনরুক্তি করল। ইতি-মধ্যেই তারাও যেখানে যত ধাতুর টুকরো, খালি টোটার খাপ, জার্মানদের পোশাকের ছেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড় করল।

লাল পল্টনের লোকেরা কোমর পর্যন্ত বরফ সরিয়ে টেলিফোনের তার বসাল। লেফটেনেন্ট শালভ চারিদিকের সঙ্গে গ্রামের যোগ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করল। ইস্কুলবাড়ীতে জার্মান বন্দীদের নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। গ্রামবাসীরা শুনবার জন্যে কৌতূহলী হল, কিন্তু এ সব সামরিক ব্যাপার বলে তাদের মাঝে পড়া উচিত নয়।

"ওদের নিয়ে এত হৈ-চৈ-এর দরকার কি," তের্পিলিখা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল। "জিজ্ঞাসাবাদের কি দরকার? এক একজনকে চালার পিছনে নিয়ে কপালে একটি করে গুলি ছুঁড়ে শেষ করে দেওয়াই ভাল!"

"খুব বুঝেছ! ওদের কাছ থেকে যতটুকু আদায় করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে না! মেরে ফেললে আর কি জানতে পারবে?"

"বেশ, তারপর তো গুলি করে মারা চলতে পারবে!"

"ওরা বন্দী, বন্দীদের কে কবে হত্যা করেছে?"

তের্পিলিখা রেগে আগুন হয়ে গেল।

"বোঝ কথা, বলে কি-না বন্দী! আমাদের বন্দীদের তারা কি রকম আচরণ করেছে দেখেছ তো? বন্দী! আমি হলে ওদের গরম তেলে সিদ্ধ করে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিতাম। আর তোমরা কি করছ? তোমরা তাদের আরামে রেখেছ আটক করে।"

"এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু করবার নেই," পেলচারিখা বলল। "বন্দীরা বেঁচে থাকবে, তাদের কেউ মারতে পারবে না—এই দস্তুর ..."

"দস্তুর বটে! আজকাল দস্তুরটা মেনে কে কোথায় চলছে বলতে পার? গেল যুদ্ধে সে রকম কিছুটা ছিল বটে, কিন্তু এখন কোন দস্তুর, কোন আইন নেই। আর বলতে পার শিশুদের হত্যা ও সাধারণ লোকদের পীড়ন করা কোন্ আইনে আছে?"

অপর স্ত্রীলোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"সে কথা তুমি আমায় বলছ? তারা আমার কি করেছে তা তো তুমিই জান।"

"সেই জন্যই তো এদের পক্ষ সমর্থন করতে দেখলে সেটা আশ্চর্য বলে মনে হয়। সৈন্যদের জন্যে আইন! ওদের তুমি সৈনিক বলতে চাও না কি? ওরা একের নম্বর হুন!"

পেলচারিখা কোন জবাব দিল না। আর সকলে যে কথা ভাবছিল সেও সেই কথাই ভাবছে। তবে তফাৎ এই যে, তারা ভাবছে—জার্মানরা যা করেছে তারাও যদি তাই করে তবে সেটা হবে তাদের চরম কলঙ্ক।

"তারা এখানে বসে আরামে আমাদের রুটি ভক্ষণ করবে এবং তারপর নিরাপদে দেশে চলে যাবে! যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তারা এখানে দিব্য আরামে থাকবে, যেন ব্যাঙ্কে তাদের নামে টাকা জমানো আছে।" তের্পিলিখা রাগের সঙ্গে বলে উঠল।

"সে নিয়ে তোমার আমার ভাবতে হবে না, যা করবার লেফটেনেন্টই স্বয়ং করবেন," আলেকজান্দ্র মেয়েদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলল।

"আমি কি তার বিরুদ্ধে কিছু বলেছি? লেফটেনেণ্টের কি করতে হবে না-হবে আমি কি তা নির্দেশ করেছি বলতে চাও?"

"আশ্চর্য!" বিড় বিড় করতে করতে বৃদ্ধ আলেকজান্দ্র বাড়ী চলে গেল, তাকে আর একখানা সাইনবোর্ড লিখতে হবে, তাতে লেখা থাকবে "স্কুল"। আগে যেমন ছিল তেমনটি হলেই ভাল হত। এটা হয়তো আগেরটার চেয়ে ভাল হবে না, তবু তাতে কিছু এসে যাবে না, জার্মানদের আসার আগে গ্রামটা যেমন ছিল কতকটা তেমন দেখালেই হল।

হঠাৎ গীতি-মুখরিত আবহাওয়াকে মথিত করে একটা বজ্রপাতের মত শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই গান গেল থেমে, যেন তাদের ধূলিসাৎ করে দিল। ছেলেরা বাড়ীর সামনে খেলা করছিল, এতে তারা জমে গেল।

"ব্যাপার কি?"

শব্দটা আবার শোনা গেল, কানে তালা-লাগা-গোছের। ক্রমাগত তোপ দাগার শব্দে মনে হচ্ছিল যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

"কামান দাগছে! ..."

"এ ওখাবিতে, ওই দিকেই। ..."

"জেলেণ্ডসিতে। ..."

"গুলি কি আমাদের লোকেরা ছুঁড়ছে?"

তারা কান পেতে শুনতে লাগল। গোলন্দাজেরাই কেবলই তোপ দাগছে এবং তাদের কামানের সে গর্জন চারদিক প্রকম্পিত করে তুলছে। প্রত্যেকেই চুপ করে রইল।

"ওখানে আবার কি হচ্ছে?"

"লড়াই। ..."

"যে তোপগুলো দাগা হচ্ছে, সেগুলো আমাদের।"

তুমি গোলন্দাজী সম্বন্ধে যখন এত জান, তখন দুয়ের মধ্যে তফাৎটা কি, তাও বলে দিতে পারবে আশা করি।"

"শুনতে পাই, পাই তো? যে দিক থেকে শব্দটা আসছে, সেদিকেই আছে আমাদের কামানশ্রেণী।"

তারা লাল পল্টনদের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল, কিন্তু তারা ছিল সম্পূর্ণ রূপে শান্ত। তাদের মধ্যে একজন বলল, "হাঁ, এ আমাদেরই কামান; আমরা এখন চারদিকেই আক্রমণ করে চলব।"

"আক্রমণ, আক্রমণ কি?"

"আহা, বুঝতে পারছ না, আমরা এ গ্রাম আক্রমণ করে অধিকার করে ফেলেছি, কিন্তু আমাদের পিছনে আর দুপাশে এখনও তো জার্মান আছে?"

"আগে থেকে আমি বলি নি যে, আবার আক্রমণ করা চলেছে?"

"ওরকম তুমি কিছুই বল নি মাসি।"

"কি, আমি বলি নি? তোমরা শুনতে পাও নি! আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি, নতুন আক্রমণ চলেছে। ... যে-কেউ এটা জানে যে, জার্মানরা এখনও ওখাবিতে রয়েছে।"

"শূয়োরের বাচ্চারা এতক্ষণে হয়তো যে যেদিকে পারে ছুটেছে।"

"এদিকে ছুটে আসবে?" ভীতার্ত কণ্ঠে অলগা পালাঞ্চুক বলল।

"কেন, আসবে না কেন?" তের্পিলিখা যুদ্ধবিশারদের ভঙ্গীতে কোমরে দুই হাত রেখে বলল। "যদি আসে, আমরা ভাল করেই তাদের অভিনন্দন জানাব।"

"তারা এখানে আসবে কেন? পশ্চিমে যাওয়ার সোজা পথ ওদিকে আরও তো আছে।"

"অবশ্য, যদি তাদের কেউ বেঁচে থাকে।"

তারা সকলেই শুনতে লাগল। সেখান থেকে অনেক দূরে যুদ্ধ চলছে এবং কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আক্রমণ ক্রমশ জার্মানদের দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে।

স্কুল-ঘরে লেফটেনেণ্ট শালভ জার্মানদের জেরা করছে। জার্মানরা তার সমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। শালভ তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

ইস্কুল ঘরের ভিতর থেকে লাল পল্টনেরা বন্দীদের বের করে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে একটি ভিড় রচিত হল তাদের চারিদিকে। মেয়েদের সমুখে জার্মানরা কাঁপতে লাগল। মাথা নত করে শীতে থর থর করতে লাগল।

"ওদের কি তোমরা নিয়ে চলে যাচ্ছ?" তের্পিলিখা প্রতিবাদ-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল।

"ওদের সদরে পাঠিয়ে দিচ্ছি," শালভ উত্তর দিল।

"এই লোকটাই লেভন্যুককে ফাঁসী দিয়েছিল!" পেলচারিখা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

মেয়েরা সব ছুটে এল সেই দিকে।

"কে, কোন্‌টা?"

"ওই যে খয়রা-চুলো লোকটা। ফাঁসী দিতে তোমরা থাকলেই তো দেখেছ! ওই যে লম্বা লোকটা।" পেলচারিখা তখনও চেঁচাচ্ছে।

"ঠিক ঠিক, সেই লোকটাই বটে!"

বন্দীদের ঘিরে ভিড় ঘন হয়ে এল। মেয়েরা ঠেলে এগিয়ে এল এবং হাত দিয়ে দেখাতে লাগল একটা লম্বা জার্মানকে, টুপির নীচে দেখা যাচ্ছে তার খয়রা রঙের চুলগুলি। সে বুঝতে পারল যে, জনতা তার সম্বন্ধেই আলোচনা করছে। সে তার পাশের সঙ্গীর পেছনে পিছিয়ে গেল।

"দেখ, দেখ, এখন লুকোতে চাইছে! এই লোকটাই সেই বেচারা বাচ্চা ছেলেটাকে ফাঁসী দিয়েছিল, লেফটেনেণ্ট!"

"বাচ্চা ছেলে, মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল তার। একটা দুধের ছেলেকে ফাঁসী দিয়েছে শূয়োরের বাচ্চা।"

"অত তর্কাতর্কি করো না মেয়েরা। ওদের আমরা নিজের হাতেই শায়েস্তা করব।" তের্পিলিখা বলল।

লাল পল্টনেরা বিব্রতভাবে চারিদিকে তাকাল।

"সরে দাঁড়াও, কি করতে চাও তোমরা?" শালভ ক্রুদ্ধকণ্ঠে তের্পিলিখাকে জিজ্ঞাসা করল। "আমি বলছি, সরে দাঁড়াও!"

তারা দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণ, ছিন্নবাস পরিহিত, সর্বাঙ্গে পচা ঘায়ের
মধ্যে বেশ গরম। তারই মধ্যে তারা উকুনের ভীষণ কামড়
শালভের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই তারা সর্বাঙ্গ চুলকোচ্ছে।
ভেনেরের সমগ্র বাহিনী থেকে মাত্র পাঁচ জন বেঁচেছে।

"ওদের পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, এখানে ওদের নিয়ে আমরা
করব?" লেফটেনেণ্ট শালভ সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলল।

"পেছনে পাঠিয়ে দেবেন?" একটি জোয়ান ছোকরা লাল পল্টন ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল। "যা-হয় এইখানেই ওদের ব্যবস্থা করা ভাল।"

"আহাম্মক!"

"ওদের নিয়ে যাওয়া, এই বরফের মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া মানে দয়া করা, অনুগ্রহ দেখান।"

"সার্জেণ্টকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" আর কোন তর্ক-বিতর্ক শুরু না করে শালভ আদেশ দিল।

সে বাইরে বেরিয়ে এল একটু হাওয়া খেতে। পূরো এক ঘণ্টা ধরে বন্দীদের নিয়ে ঘরের মধ্যে ছিল এবং তার মনে হচ্ছিল যে, সর্বাঙ্গে যেন তার উকুন সড় সড় করছে, যেন সর্বাঙ্গ তার মালিন্যে ভরে গেছে, তার সমস্ত পোশাকটা ওই জার্মানদের দীর্ঘ দিনের অপরিচ্ছন্ন ক্ষতাক্ত দেহগুলোর কুৎসিত রসে যেন ভিজে গেছে।

শালভ তুষার হিমেল হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিতে লাগল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে গভীর কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বহু দূরের একটি কুটীর থেকে গানের টুকরো পদগুলি ভেসে আসছে। সে শুনতে লাগল সেই গান, দীর্ঘ প্রান্তরবাহী বাতাসের মৃদু গুঞ্জন, দু পাশে উর্বর মৃত্তিকা—সমুদ্রাভিমুখী জলস্রোতের কলোচ্ছ্বাস সেই গানের সঙ্গে মিশে এক কোমল সকরুণ ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। সেই গানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দনীপার-তীরে কসাকদের রণহুঙ্কার, তুর্কিদের বন্দী করা বীর যোদ্ধাদের প্রতিবাদ, সুদূর পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ। মেয়েরা গাইছে এবং মনে হচ্ছে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের উজ্জ্বল স্বর্ণাভ সূর্যের দিকে তাকিয়ে সারা গ্রামটাই গান গেয়ে উঠেছে।

...ধন্যবাদ, কিন্তু আমাদের সময় নেই। অন্য আর এক দল আসছে, আমাদের ...তে হবে। তারা অপেক্ষা করছে।"

"অপেক্ষা করছে সত্যিই," মেয়েরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলল। তার পর এগিয়ে গেল যেখানে লাল পল্টনেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই দেখতে এল তাদের যাওয়া। মেয়েরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগল। কেউ ...কেঁদে উঠল, সোনিয়া নিম্যান একজন তরুণ লাল পল্টনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ...য়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

একটি মেয়ে কৌতুকের সঙ্গে মন্তব্য করল, "সোঙ্কার দিকে চেয়ে দেখ, ও একজনকে খুঁজে পেয়েছে।"

"ভুরু দুটো তার ভারী সুন্দর; চেহারাটাও মন্দ নয়।"

লেফটেনেণ্ট গালভ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। বিচ্ছিন্ন সৈন্যেরা দলবদ্ধ ...দাঁড়িয়েছে।

"ফরোয়ার্ড, মার্চ!"

জনতা বিদায় জানিয়ে চীৎকার করে উঠল: "জয় হোক! অক্ষত দেহে ফিরে এসো! যারা বাইরে আছে তাদেরও এই শুভেচ্ছা জানিও।"

সৈন্যদল অগ্রসর হয়ে চলল; পায়ের চাপে মড় মড় করে বরফ গুঁড়ো হয়ে ...চ্ছে, পথের দুপাশে সৈন্যদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলবার জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলেছে গ্রামের ছেলেরা। মেয়েরা পেটিকোটের আঁচল তুলে ধরে দ্রুতপদে তাদের পিছনে পিছনে চলেছে। সৈন্যদল একটি টিলার কাছ পর্যন্ত গিয়ে থামল।

পশ্চিমে সুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমিতে শুধু তুষাররাশি ঝক্‌মক্ করছে, দূরে ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ রেখা কুণ্ডলায়িত হয়ে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক ওই খানটিতেই লেভানেভ্‌কা! একখানি হতভাগ্য গ্রাম, জার্মানরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সেই আগুন এখনও জলছে। সে আগুনের শিখা বার বার নিভে গেছে, কিন্তু তবুও শেষ হয় নি, ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে এখনও মাঝে মাঝে জলে উঠছে সেই আগুন। স্বচ্ছ নীল আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

লেফটেনেণ্ট শালভ টিলার উপর দাঁড়িয়ে একবার পশ্চিম দিকে চাই[illegible]। সামনে য়ুক্রেন সমভূমির তুষারাচ্ছন্ন ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখনও জার্মা[illegible] কবলে। সে আগুন আরও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে, সমগ্র য়ুক্রেন আগুনে শিখায় আর রক্তের স্রোতে লাল হয়ে উঠেছে। জার্মানদের [illegible] তল পদদলিত লাঞ্ছিত য়ুক্রেনের সব গান আজ বরফের মত জমাট বেঁধে গেছে তবু তারা নির্ভীক, অনমনীয়, উদ্দাম গতিতে এখনও যুদ্ধ করে চলেছে।

লেফটেনেণ্টের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই রামধনু : নির্মল আ[illegible] কুঞ্চিত উদ্ভাসিত আলোকসীমা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে! বনগোলাপের হালকা র[illegible] সঙ্গে রক্তজবার গাঢ় লাল মিশেছে, নানা ফুলের বিচিত্র পাপড়ির রঙ একত্র হয়ে এক অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় ভরে উঠেছে। সূর্যমুখীর সোনালী পাপড়ি আর সেই সঙ্গে কচি ভূর্জপত্রের সবুজ পাতাগুলো একসঙ্গে মিশে আকাশের গায়ে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। সব কিছু একটা নির্মল স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় ধৌত হয়ে উঠেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তরব্যাপী ওই বিরাট রামধনুর খিলান যেন আকাশ ও মৃত্তিকাকে এক অপূর্ব সুন্দর রেশমী ফিতায় একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে।

শালভ সৈন্যদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"ফরোয়ার্ড, মার্চ!"

ছন্দের তালে তালে লম্বা পা ফেলে তারা এগিয়ে চলল। গ্রামবাসীরা টিলার উপরেই দাঁড়িয়ে রইল। কারো মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না। সৈন্যদল সেই শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন সমভূমির সীমাহীন পথ ধরে এগিয়ে চলল রামধনুর বি[illegible]-ন-তোরণের ভিতর দিয়ে।

দূরে অগ্নিদগ্ধ লেভানেভ্‌কার বুকের ভিতর থেকে যেখানে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে সেই দিকে লাল পল্টনের দল এগিয়ে চলল। জার্মানীর পদদলিত য়ুক্রেনের মাটীর উপর দিয়ে আবার তারা এগিয়ে চলল বজ্র-মুষ্টিতে রাইফেল ধরে। লাঞ্ছিত পদদলিত হলেও তারা অজেয়, অদম্য শক্তিতে এখনও সমানে যুদ্ধ করে চলেছে।

বানীর বেদনায় মূক হয়ে আছে। চোখের জলে তাদের দৃষ্টি ঝাপ্সা
সে, তবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, সৈন্যেরা এগিয়ে চলেছে—দূরে, আরও
সৈন্যদল—যতক্ষণ তুষারাচ্ছন্ন নীল দিগন্ত সীমায় রামধনুর ওই বর্ণময়
[illegible]র ভিতর মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ তারা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল
কেউ

শেষ

১৯৪৩ সালে স্টালিন পুরস্কার প্রাপ্ত ভান্দা ভ

রামধনু

জার্মান-অধিকৃত ইউক্রেনের একটি গ্রামকে কেন্দ্র ক
আক্রমণকারীর হাত থেকে তাদের নবজীবনের ধারাক
জন্যে সোভিয়েট কৃষকদের লাঞ্ছিত জীবনের, দুঃ
সুকঠোর এক প্রতিজ্ঞার এই কাহিনী। ইউক্রেনের গ্রা
সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগময় দরদ নিয়ে রচিত এই

শীতের মাত্র কয়েকটি দিন নিয়ে উপন্যাসখানি
থেকে ছিন্ন করার জন্যে লালফৌজের গ্রামে আসব
অধিকারের শেষ কয়েকটি দিন। আবহাওয়াটা আগ
অবিচ্ছিন্ন কৌতূহলে পরিপূর্ণ। জনগণের প্রবুদ্ধ চেতন
না পেরে জার্মানরা তাদের পাশব আতঙ্ককে আরও নির্মম
এবং সারা গ্রামটা হ'য়ে ওঠে ধ্বংসোন্মুখ। যুবক-বৃদ্ধ,
ছেলেরা নিরস্ত্র ; তবু তারা উঠে দাঁড়ালো শেষ যুদ্ধের জ
জানতো, বাইরে থেকে কোনো সাহায্যেরই আশু সম্ভাবন

প্রধান চরিত্রের অধিকাংশই মেয়েরা। তাদের ম
ওলেনা, সে একজন গেরিলা যোদ্ধা। তার গর্ভস্থ শিশুকে
জন্যে ফিরে এলো বনের ভেতর থেকে। তারপর শাস্তিতে
হ'য়ে উৎসর্গ ক'রলো তার নিজের ও শিশুর জীবন। তার
তার নিজের ও আরও অনেকের এই জীবন উৎসর্গের ভেতর
ও মৃত্যুর কুৎসিত অনুচরদের ওপরে একদিন বিজয় লাভ ক

পোলাণ্ডের ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌স্কা সোভিয়েটের একজন
তরুণী লেখিকা। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক সংবাদদাতা
ক'রেছেন এবং লালফৌজের দলে উন্নীত হ'য়েছেন প্রধান আ